ভূগোল ও পরিবেশ

নবম ও দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ভূগোল ও পরিবেশ

নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

ড. হাফিজা খাতুন
সেলিনা শাহজাহান
ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
জুলেখা শাহীন

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ভূগোল ও পরিবেশ পাঠ্যপুস্তকটি একুশ শতকের নতুন জীবনবোধ ও জীবন-পরিবেশের পটভূমিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি এখন আর দেশ, রাজধানী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আমদানি-রপ্তানি, শিল্প ও খনিজের সম্পদের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ ও তার পরিবেশ, পরিবেশের বিপুল পরিবর্তনের সঙ্গে মানব-জীবনের সম্পর্ক, পরিবেশ উন্নয়নের বিশ্বব্যাপী কর্মযজ্ঞ প্রভৃতি পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃতি লাভ করেছে। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সক্ষমতাকে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	ভূগোল ও পরিবেশ	১–৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী	৮–৩০
তৃতীয় অধ্যায়	মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার	৩১–৪৬
চতুর্থ অধ্যায়	পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন	৪৭–৬৮
পঞ্চম অধ্যায়	বায়ুমণ্ডল	৬৯–৯০
ষষ্ঠ অধ্যায়	বারিমণ্ডল	৯১–১০৪
সপ্তম অধ্যায়	জনসংখ্যা	১০৫–১২৫
অষ্টম অধ্যায়	মানববসতি	১২৬–১৩৭
নবম অধ্যায়	সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি	১৩৮–১৪৬
দশম অধ্যায়	বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ	১৪৭–১৬৩
একাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প	১৬৪–১৮৪
দ্বাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য	১৮৫–১৯৭
ত্রয়োদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য	১৯৮–২০৭
চতুর্দশ অধ্যায়	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	২০৮–২২৪
পঞ্চদশ অধ্যায়	টেকসই উন্নয়ন-অভীষ্ট (এসডিজি)	২২৫–২৩২

প্রথম অধ্যায়

ভূগোল ও পরিবেশ

Geography and Environment

পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। পৃথিবীতে বাস করে নানান রকম মানুষ, বিচিত্র তাদের জীবনধারা। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে নানান রকম পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং মানুষ ও মানুষের বিভিন্ন রকম সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। এসব আধুনিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। সুতরাং, ভূগোল একদিকে প্রকৃতির বিজ্ঞান, অন্যদিকে পরিবেশ ও সমাজের বিজ্ঞান। এ অধ্যায়ে আমরা ভূগোল ও পরিবেশ, ভূগোলের পরিধি, ভূগোলের বিভিন্ন শাখা এবং ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

সৌরজগতের কিছু অংশ

একটি গ্রামের দৃশ্য

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ভূগোল ও পরিবেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূগোলের পরিধি বর্ণনা করতে পারব;
- ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূগোল ও পরিবেশের উপাদানসমূহের আন্তসম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।

ভূগোলের ধারণা (Concept of Geography)

আমরা পৃথিবীতে বাস করি। পৃথিবী আমাদের আবাসভূমি। মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীর বর্ণনা হলো ভূগোল। ইংরেজি 'Geography' শব্দটি থেকে ভূগোল শব্দ এসেছে। প্রাচীন গ্রিসের ভূগোলবিদ ইরাটোসথেনিস প্রথম 'Geography' শব্দ ব্যবহার করেন। 'Geo' ও 'graphy' শব্দ দু'টি মিলে হয়েছে 'Geography'। 'Geo' শব্দের অর্থ 'ভূ' বা পৃথিবী এবং 'graphy' শব্দের অর্থ বর্ণনা। সুতরাং 'Geography' শব্দটির অর্থ পৃথিবীর বর্ণনা। বৃটিশ ভূগোলবিদ অধ্যাপক ম্যাকনি (Professor E. A. Macnee) মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীর আলোচনা বা বর্ণনাকে বলেছেন ভূগোল। তাঁর মতে, ভৌত ও সামাজিক পরিবেশে মানুষের কর্মকাণ্ড ও জীবনধারা নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাই ভূগোল। বৃটিশ ভূগোলবিদ ডাডলি স্ট্যাম্পের (Professor L. Dudley Stamp) মতে, পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের বর্ণনাই হলো ভূগোল। কোনো কোনো ভূগোলবিদ ভূগোলকে বলেছেন পৃথিবীর বিবরণ, কেউ বলেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞান। জার্মান ভূগোলবিদ কার্ল রিটার (Professor Carl Ritter) ভূগোলকে বলেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞান।

বিখ্যাত মার্কিন ভূগোলবিদ অধ্যাপক রিচার্ড হার্টশোর্ন (Professor Richard Hartshorne) বলেন, পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের যুক্তিসংগত ও সুবিন্যস্ত বিবরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো ভূগোল।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির বিজ্ঞান একাডেমি ১৯৬৫ সালে ভূগোলের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে। এর মতে, পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপব্যবস্থাগুলো কীভাবে সংগঠিত এবং এসব প্রাকৃতিক বিষয় বা অবয়বের সঙ্গে মানুষ নিজেকে কীভাবে বিন্যস্ত করে তার ব্যাখ্যা খোঁজে ভূগোল।

আধুনিক ভূগোল শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা জার্মান ভূগোলবিদ আলেকজান্ডার ফন হামবোল্টের (Alexander von Humbolt) মতে, ভূগোল হলো প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞান; প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তার বর্ণনা ও আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত।

মানুষ পৃথিবীতে বাস করে এবং এই পৃথিবীতেই তার জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ তার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, উদ্ভিদ, প্রাণী, নদ-নদী, সাগর ও খনিজ সম্পদ তার জীবনযাত্রাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তার ক্রিয়াকলাপ তার পরিবেশে ঘটায় নানান রকম পরিবর্তন। ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, রাস্তাঘাট, শহর-বন্দর নির্মাণ ইত্যাদি প্রকৃতি ও পরিবেশকে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত করে। বনভূমি কেটে তৈরি হয় গ্রাম বা শহরের মতো লোকালয়। খাল, বিল ও পুকুর ভরাট হয়। মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়ার একটি সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধের মূলে আছে কার্যকারণের খেলা। ভূগোলের প্রধান কাজ হলো এই কার্যকারণ উদঘাটন করা। পৃথিবীর পরিবেশের সীমার মধ্যে থেকে মানুষের বেঁচে থাকার যে সংগ্রাম চলছে, সে সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনাই ভূগোল।

ভূগোলের পরিধি (Scope of geography)

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, নতুন নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন, চিন্তা-ধারণার বিকাশ এবং সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন ভূগোলের পরিধিকে অনেক বিস্তৃত করেছে। এখন নানান রকম বিষয় যেমন ভূমিরূপবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, মৃত্তিকাবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি ভূগোল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ভূগোলের শাখা (Branches of geography)

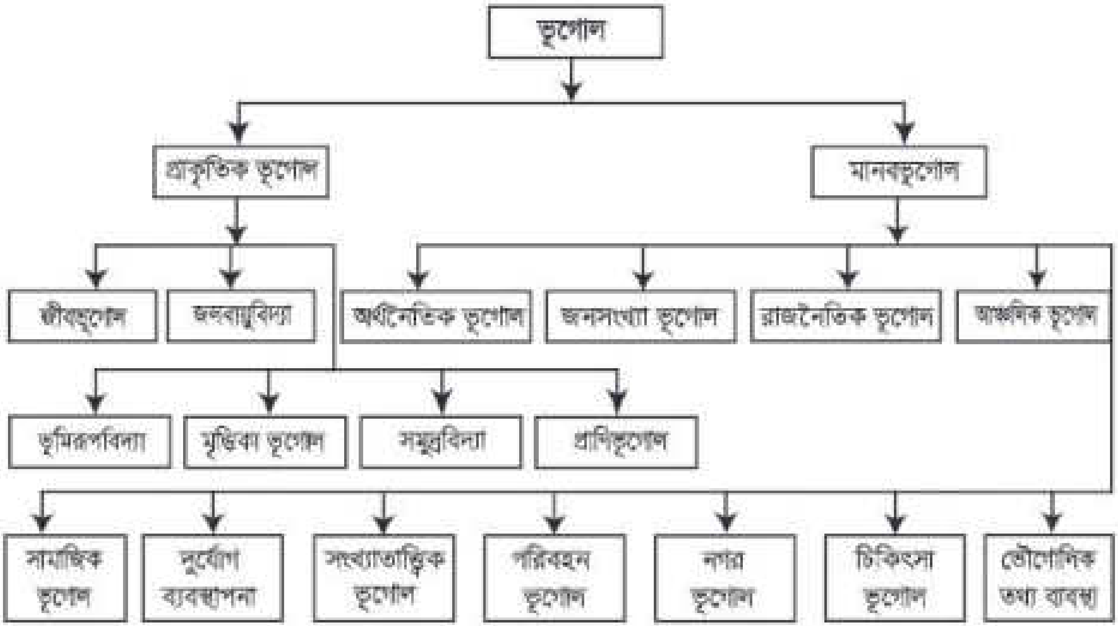

(ক) প্রাকৃতিক ভূগোল (Physical geography) : ভূগোলের যে শাখায় ভৌত পরিবেশ ও এর মধ্যে কার্যরত বিভিন্ন প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাকে প্রাকৃতিক ভূগোল বলে। পৃথিবীর ভূমিরূপ, এর গঠন প্রক্রিয়া, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, জলবায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

১। ভূমিরূপবিদ্যা (Geomorphology) : ভূমিরূপবিদগণ একটি গ্রহের নগ্নীভবন এবং ক্ষয়ীভবনের ভূমিরূপের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করে।

২। জলবায়ুবিদ্যা (Climatology) : জলবায়ুবিদ্যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার ধরন এবং পৃথিবীতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে।

৩। জীবভূগোল (Biogeography) : পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাণিজগৎ এবং উদ্ভিদের বণ্টন নিয়ে জীবভূগোল আলোচনা করে।

৪। মৃত্তিকা ভূগোল (Soil geography) : মৃত্তিকা ভূগোলবিদগণ অশ্মমণ্ডলের উপরিভাগের মৃত্তিকা এবং এর বণ্টন ও বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে।

৫। **সমুদ্রবিদ্যা (Oceanography) :** পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সমুদ্র। বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উত্থান, অবনমন, সমুদ্রের পানির রাসায়নিক গুণাগুণ ও লবণাক্ততা নির্ধারণ, সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সমুদ্রবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

(খ) মানবভূগোল (Human geography) : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ কীভাবে বসবাস করছে, কীভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে, কেন এভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে তার কার্যকারণ অনুসন্ধান মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

১। **অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic geography) :** প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব অর্থনৈতিক কাজ করে, তা অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। এসব কাজ হলো কৃষিকাজ, পশুপালন, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ইত্যাদি।

২। **জনসংখ্যা ভূগোল (Population geography) :** জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি, তার কার্যকারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর এর প্রভাব জনসংখ্যা ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

৩। **আঞ্চলিক ভূগোল (Regional geography) :** অঞ্চলভেদে পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মানুষ ও মানুষের জীবনধারণ প্রণালি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বিষয়বস্তু অনুশীলন করা আঞ্চলিক ভূগোলের প্রধান বিষয়।

৪। **রাজনৈতিক ভূগোল (Political geography) :** রাজনৈতিক বিবর্তন, রাজনৈতিক বিভাগ ও পরিসীমা এবং বিভাগের মধ্যস্থিত ভৌগোলিক বিষয় রাজনৈতিক ভূগোলের প্রধান বিষয়।

৫। **সংখ্যাতাত্ত্বিক ভূগোল (Quantitative geography) :** ভূগোলের এই শাখায় সংখ্যাতাত্ত্বিক কৌশল এবং মডেল ব্যবহার করে প্রমাণার্থ পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ভূগোলের অন্যান্য শাখায় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কিছু ভূগোলবিদ শুধু সংখ্যাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞ হন।

৬। **পরিবহন ভূগোল (Transport geography) :** পরিবহন ভূগোলবিদরা সরকারি, বেসরকারি যাতায়াত ব্যবস্থা এবং মানুষ ও পণ্যের একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর সম্পর্কে আলোচনা করে।

৭। **নগরভূগোল (Urban geography) :** ভূগোলের এ শাখায় নগরের উৎপত্তি ও বিকাশ, নগর ও শহরের শ্রেণিবিভাগ, নগর পরিবেশ, নগরের কেন্দ্রীয় এলাকা, নগরীর বস্তি ইত্যাদি বিষয় চর্চা করা হয়।

৮। **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster management) :** দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস, দুর্যোগ থেকে পরিবেশ ও সমুদ্রকে রক্ষার কৌশল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আলোচ্য বিষয়।

ভূগোলকে যত ভাগেই বিভক্ত করা হোক না কেন, সকল ভূগোলের সঙ্গে পরিবেশ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমানে ভূগোল ও পরিবেশ সম্পৃক্ত করে পড়ানো হয়। প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় পরিবেশই ভূগোলবিজ্ঞানে সমান গুরুত্ব বহন করে।

পরিবেশের ধারণা (Concept of Environment)

মানুষ যেখানেই বাস করুক তাকে ঘিরে একটি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিরাজমান। প্রকৃতির সকল দান মিলেমিশে তৈরি হয় পরিবেশ। নদী, নালা, সাগর, মহাসাগর, পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, ঘর, বাড়ি, রাস্তাঘাট, উদ্ভিদ, প্রাণী, পানি, মাটি ও বায়ু নিয়ে গড়ে ওঠে পরিবেশ। কোনো জীবের চারপাশের সকল জীব ও জড় উপাদানের সর্বসমেত প্রভাব ও সংঘটিত ঘটনা হলো ঐ জীবের পরিবেশ। পরিবেশ বিজ্ঞানী আর্মসের (Arms) মতে, জীবসম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব ও প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।

পার্ক (C. C. Park) বলেছেন, পরিবেশ বলতে স্থান ও কালের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে মানুষকে ঘিরে থাকা সকল অবস্থার যোগফল বোঝায়। স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবেশও পরিবর্তিত হয়। যেমন– শুরুতে মাটি, পানি, বায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে ছিল মানুষের পরিবেশ। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন ধরনের পরিবেশ।

পরিবেশের উপাদান (Elements of Environment) : পরিবেশের উপাদান দুই প্রকার; যেমন জড় উপাদান ও জীব উপাদান। যাদের জীবন আছে, যারা খাবার খায়, যাদের বৃদ্ধি আছে, জন্ম আছে এবং মৃত্যু আছে তাদের বলে জীব। গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী হলো জীব। এরা পরিবেশের জীব উপাদান। জীবদের নিয়ে গড়া পরিবেশ হলো জীব পরিবেশ। মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, আলো, উষ্ণতা ও আর্দ্রতা হলো পরিবেশের জড় উপাদান। এই জড় উপাদান নিয়ে গড়া পরিবেশ হলো জড় পরিবেশ।

কাজ : পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন কর।

পরিবেশের প্রকারভেদ (Types of Environment) : পরিবেশ দুই প্রকার। ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। প্রকৃতির জড় ও জীব উপাদান নিয়ে যে পরিবেশ, তাকে ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ বলে। এই পরিবেশে থাকে মাটি, পানি, বায়ু, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, আলো, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী। মানুষের তৈরি পরিবেশ হলো সামাজিক পরিবেশ। মানুষের আচার-আচরণ, উৎসব-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, শিক্ষা, মূল্যবোধ, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে, তা হলো সামাজিক পরিবেশ।

ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব (Importance of studying geography and environment)

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়–

- পৃথিবীর কোনো স্থানের প্রকৃতি ও পরিবেশ
- পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর, মালভূমি, সমভূমি ও মরুভূমি, এদের গঠনের কারণ ও বৈশিষ্ট্য
- পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে কীভাবে জীবজগতের উদ্ভব হয়েছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা অর্জন
- পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং এদের আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারার বৈচিত্র্য
- কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের সামাজিক পরিবেশের কী পরিবর্তন হয়েছে

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, ক্ষয়ক্ষতি ও নিয়ন্ত্রণ, ভূপ্রকৃতির অবস্থান, জলবায়ুর ধরন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী ভূমি ব্যবস্থাপনা
- পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি, গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ও এর প্রভাব
- প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন
- সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি জীবভূগোলের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা (খ) উদ্ভিদ ও জীবজন্তু

(গ) অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ (ঘ) শহরের ক্রমবিকাশ

২। ভূগোলের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে–

i. প্রকৃতি

ii. শক্তি

iii. সমাজ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মি. নাঈম চার রাস্তার মোড়ে অবস্থিত নিচু জায়গা ভরাট করে একটি দোকান এবং দোকানের পিছনে বাড়ি তৈরি করলেন।

৩। নাঈমের কর্মকাণ্ডটি কোন ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) জীবভূগোল (খ) মানবভূগোল

(গ) জলবায়ুবিদ্যা (ঘ) ভূমিরূপবিদ্যা

৪। উল্লিখিত কর্মকাণ্ডটি হলো–

i. গ্রামের ক্রমবিকাশ

ii. নগরায়ণ

iii. জনপদ তৈরি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

গ্রুপ-A	গ্রুপ-B
পাহাড়-পর্বত মানুষ জলবায়ু গাছপালা	জীবভূগোল প্রাকৃতিক ভূগোল মানব ভূগোল অর্থনৈতিক ভূগোল

ক. ভূগোল শব্দটি কে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছেন?

খ. সমুদ্রবিদ্যার বিষয়বস্তু কী?

গ. গ্রুপ 'A'-এর উপাদানগুলো কোন পরিবেশের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মানব-জীবনে গ্রুপ 'A' এবং গ্রুপ 'B'-এর প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী

The Universe and Our Earth

পৃথিবী মানবজাতির আবাসস্থল। পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে অসীম মহাকাশ। সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য রয়েছে। মহাকাশে এরূপ বহু নক্ষত্র রয়েছে। পাশাপাশি চন্দ্র (উপগ্রহ), পৃথিবী (গ্রহ), ধূমকেতু, উল্কা, নীহারিকা প্রভৃতি রয়েছে। ক্ষুদ্র পোকামাকড় ও ধূলিকণা থেকে শুরু করে আমাদের এই পৃথিবী, দূর-দূরান্তের সকল জ্যোতিষ্ক এবং দেখা না দেখা সবকিছু নিয়েই মহাবিশ্ব। এ অধ্যায়ে আমরা মহাকাশ, মহাবিশ্ব, সৌরজগৎ, পৃথিবী ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।

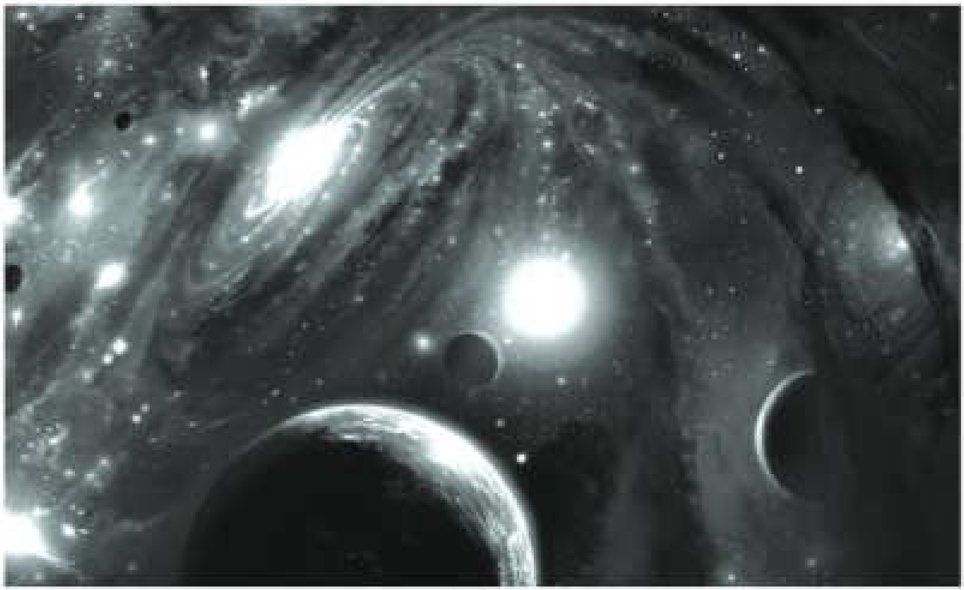

মহাবিশ্ব

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মহাবিশ্বের জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সৌরজগৎ, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- পৃথিবীর আকার-আকৃতি ও উপগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারব;
- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাসহ গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ ব্যাখ্যা এবং এসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা ব্যবহার করে মানচিত্রে বিভিন্ন স্থান শনাক্ত করতে পারব;
- আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দিবারাত্রি সংঘটন ও হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঋতু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে সৌরজগতের মডেল তৈরি করতে পারব;
- আমাদের বসবাসের একমাত্র পৃথিবী সম্পর্কে আরও বেশি জানার আগ্রহ প্রকাশ করব।

মহাকাশ ও মহাবিশ্ব (Space and Universe)

সূর্য একটি নক্ষত্র এবং চাঁদ একটি উপগ্রহ। এই আকাশের শুরু ও শেষ নেই। আদি-অন্তহীন এ আকাশকে মহাকাশ বলে। মহাকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক রয়েছে। এরা সুশৃঙ্খলভাবে নিজস্ব কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কোনো কোনোটার আলো আছে আবার কোনো কোনোটার আলো নেই। মহাকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা, নীহারিকা, পালসার, কৃষ্ণবামন (Black dwarf), কৃষ্ণগহ্বর (Black hole) প্রভৃতি সবকিছুই রয়েছে। এদের সবাইকে নিয়ে গঠিত হয়েছে মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব যে কত বড় তা কেউ জানে না। কেউ জানে না মহাবিশ্বের আকার বা আকৃতি কেমন, অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন মহাবিশ্বের শুরু ও শেষ নেই। আবার কেউ কেউ এখনও বিশ্বাস করেন মহাবিশ্বের আকার ও আকৃতি আছে। মানুষ প্রতিনিয়তই মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করছে, এর অনেক কিছুই এখনও অজানা রয়ে গেছে। এই অজানা হয়তো চিরকালই থাকবে।

নক্ষত্র (Star)

যেসব জ্যোতিষ্কের নিজের আলো আছে তাদের নক্ষত্র বলে। মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে (চিত্র ২.১)। খালি চোখে আমরা মাত্র কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই। এদের কয়েকটি পৃথিবী থেকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। নক্ষত্রগুলো হলো জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড, এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি। এই গ্যাস অতি উষ্ণ (প্রায় ৬০০০° সেলসিয়াস) তাপমাত্রায় জ্বলছে। সূর্যের প্রখর আলোর জন্য দিনের বেলায় অন্যান্য নক্ষত্র দেখা যায় না।

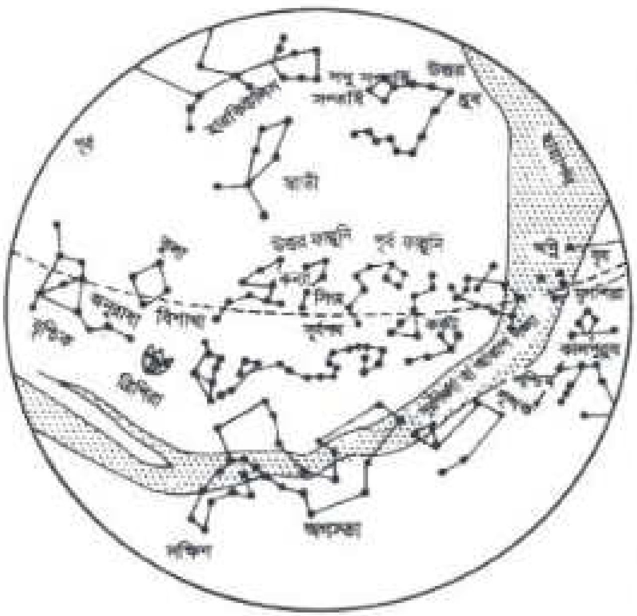

চিত্র ২.১ : বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান

পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় নক্ষত্রগুলো যেন একই সমতলে অবস্থান করছে। কিন্তু পৃথিবী থেকে এরা বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করছে। পৃথিবী ও নক্ষত্রদের মধ্যে এবং নক্ষত্রদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে কিলোমিটার দ্বারা এই দূরত্ব প্রকাশ করা যায় না। এই দূরত্ব আলোক বর্ষ এককে মাপা হয়। আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এই বেগে এক বছরে আলো যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোক বর্ষ বলে। সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড। সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরাই (Proxima Centauri)। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪.২ আলোক বর্ষ।

নক্ষত্রমণ্ডলী (Constellation) : মেঘমুক্ত অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় কয়েকটি নক্ষত্র বিশেষ আকৃতিতে মিলে জোট বেঁধেছে। এভাবে আমাদের পরিচিত আকৃতিতে দেখা নক্ষত্রদলকে নক্ষত্রমণ্ডলী বলে। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক একটি নক্ষত্রদলকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করে বিভিন্ন আকৃতি কল্পনা করে বিভিন্ন নাম দিয়েছেন।

এদের কোনোটা দেখতে ভল্লুকের মতো, কোনোটা শিকারির মতো। এদের মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Great Bear), কালপুরুষ (Orion), ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia), লঘুসপ্তর্ষি (Little Bear), বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডল (Canis Major) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ্যালাক্সি (Galaxy) : মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূলিকণা, ধূমকেতু ও বাষ্পকুণ্ডের এক বিশাল সমাবেশকে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রজগৎ বলে। মহাকাশে একশত বিলিয়ন গ্যালাক্সি রয়েছে (চিত্র ২.২)। এদের বিভিন্ন আকার ও আকৃতি রয়েছে, তবে এদের অধিকাংশই সর্পিলাকার বা উপবৃত্তাকার। সর্পিলাকার গ্যালাক্সিগুলো বৃহৎ আকৃতির এবং উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিগুলো বেশি উজ্জ্বল। এরা পরস্পর ব্যাপক ব্যবধানে অবস্থিত। কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে ছায়াপথ বলে।

চিত্র ২.২ : গ্যালাক্সি

নীহারিকা (Nebula) : নীহারিকা হলো মহাকাশে অসংখ্য স্বল্পালোকিত তারকার আস্তরণ। এদের আকার বিচিত্র। কিন্তু নীহারিকার দেহ গ্যাসীয় পদার্থে পূর্ণ। এদেরকে গ্যাসীয় নীহারিকা বলে। এক একটি নীহারিকার মধ্যবর্তী দূরত্ব ব্যাপক। এক একটি নীহারিকার মাঝে কোটি কোটি নক্ষত্র থাকতে পারে। এরা যেহেতু পৃথিবী থেকে কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে রয়েছে, তাই এদের মাঝে যেসব নক্ষত্র রয়েছে তাদের পৃথকভাবে শনাক্ত করা যায় না।

ছায়াপথ (Milky Way) : কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা বলে। অন্ধকার আকাশে এদের উজ্জ্বল দীপ্তি দীর্ঘপথের মতো দেখায়। একটি ছায়াপথ লক্ষ কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি। শীতকালে রাত্রিবেলা পরিষ্কার আকাশে লক্ষ করলে উত্তর-দক্ষিণে বেশ বড় পরিসরযুক্ত তেজোদীপ্ত স্বচ্ছ দীর্ঘ আলোর রেখা দেখা যায়। তারকা খচিত এই আলোর পথই হলো ছায়াপথ। বিজ্ঞানীরা একে বিরাট চক্রাকার মন্ডল বলে অনুমান করেন। সৌরজগৎ এরকম একটি ছায়াপথের অন্তর্গত।

উল্কা (Meteor) : রাতের মেঘমুক্ত আকাশে অনেক সময় মনে হয় যেন নক্ষত্র ছুটে যাচ্ছে বা কোনো নক্ষত্র যেন এই মাত্র খসে পড়ল। এই ঘটনাকে নক্ষত্রপতন বা তারা খসা বলে। এরা কিন্তু আসলে কোনো নক্ষত্র নয়, এদের নাম উল্কা (চিত্র ২.৩)। মহাশূন্যে অজস্র জড়পিন্ড ভেসে বেড়ায়। এই জড়পিন্ডগুলো অভিকর্ষ বলের আকর্ষণে প্রচন্ড গতিতে (সেকেন্ডে প্রায় ৩ কিলোমিটার) পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। বায়ুর সংস্পর্শে এসে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এরা জ্বলে ওঠে। ফলে এদের ছুটন্ত তারা বলে মনে হয়। বেশিরভাগ উল্কাপিন্ডই আকারে বেশ ক্ষুদ্র।

চিত্র ২.৩ : উল্কা

ধূমকেতু (Comet) : মহাকাশে মাঝে মাঝে একপ্রকার জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। এদের একটি মাথা ও একটি লেজ আছে। এসব জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলে। ধূমকেতু আকাশের এক অতি বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক (চিত্র ২.৪)। সৌরজগতের মধ্যে ধূমকেতুর বসবাস হলেও এরা কিছুদিনের জন্য উদয় হয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। সূর্যের চারদিকে অনেক দূর দিয়ে এরা পরিক্রমণ করে। সূর্যের নিকটবর্তী হলে এদের দেখা যায়। এরা সূর্যের যত কাছাকাছি আসতে থাকে তত এদের লেজ লম্বা হতে থাকে। অনেক দীর্ঘ কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে বলে এরা অনেক বছর পর পর আবির্ভূত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেন তা হ্যালির ধূমকেতু নামে পরিচিত। হ্যালির ধূমকেতু প্রতি ৭৬ বছরে একবার দেখা যায়।

হ্যালির ধূমকেতু ২৪০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ থেকে দেখা যায় এবং সর্বশেষ ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু দেখা গেছে।

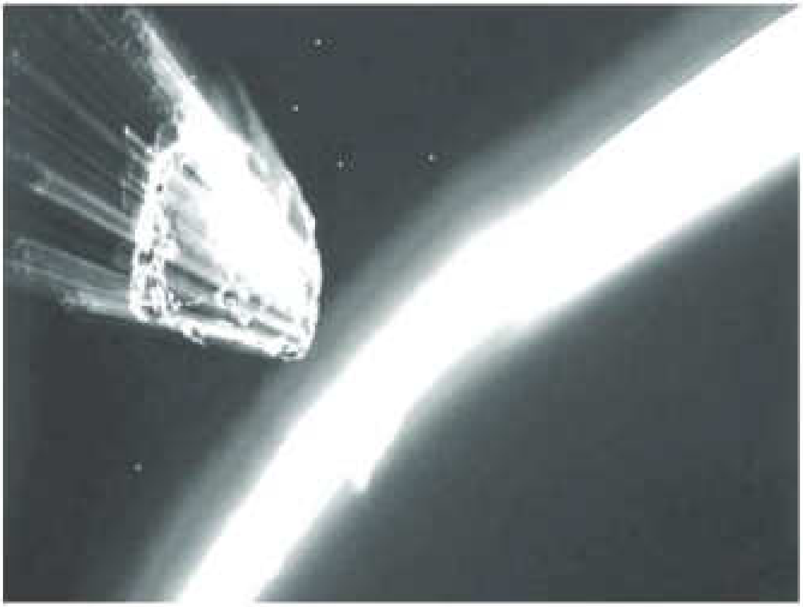

চিত্র ২.৪ : ধূমকেতু

গ্রহ (Planet) : মহাকাশে কতকগুলো জ্যোতিষ্ক সূর্যকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমণ করে। এদের নিজেদের কোনো আলো বা তাপ নেই। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এরা সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। এরা সূর্য থেকে আলো ও তাপ পায়। এই তাপেই উত্তপ্ত হয়। এরা তারার মতো মিটমিট করে জ্বলে না। এসব জ্যোতিষ্ককে গ্রহ বলে। আমাদের সৌরজগতের আটটি গ্রহ হলো বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন।

উপগ্রহ (Satellite) : কিছু কিছু জ্যোতিষ্ক গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয়, এদের উপগ্রহ বা চাঁদ বলে। মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এরা গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এদের নিজস্ব আলো বা তাপ নেই। এরা সূর্য বা নক্ষত্র থেকে আলো বা তাপ পায়। চাঁদ পৃথিবী গ্রহের একমাত্র উপগ্রহ। কোনো কোনো গ্রহের উপগ্রহ আছে, কোনোটির নেই। বুধ ও শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হচ্ছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ : মানুষের তৈরি বিভিন্ন উপগ্রহ আছে যারা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এদের বলে কৃত্রিম উপগ্রহ। আবহাওয়ার পূর্বাভাস, তথ্য আদান-প্রদান, গোয়েন্দা নজরদারি, খনিজ সম্পদের সন্ধান, পরিবেশ দূষণ নির্ণয় ইত্যাদি কাজে এসব কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হয়।

সৌরজগৎ (Solar System)

সূর্য এবং তার গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত (চিত্র ২.৫)। সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। গ্রহগুলো মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সৌরজগতের যাবতীয় গ্রহ-উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হলো সূর্য। সূর্যকে ভিত্তি করে সৌরজগতের যাবতীয় কাজ-কর্ম চলে। এই মহাবিশ্বের বিশালতার মধ্যে সৌরজগৎ নিতান্তই ছোট।

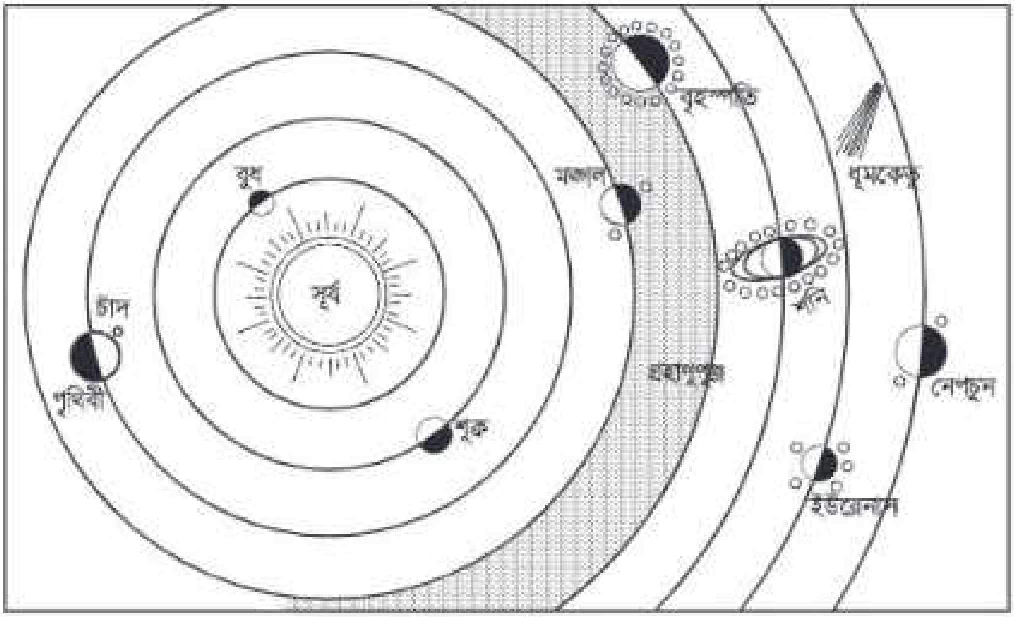

চিত্র ২.৫ : সৌরজগৎ

সূর্য (Sun) : সূর্য একটি নক্ষত্র। এটি একটি মাঝারি আকারের হলুদ বর্ণের নক্ষত্র। এর ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার এবং ভর প্রায় ১.৯৯×১০^{৩০} কিলোগ্রাম। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষ্ক। সূর্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহের তাপ ও আলোর মূল উৎস সূর্য। সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবী চির অন্ধকারে থাকত এবং পৃথিবীতে জীবজগৎ ও উদ্ভিদজগতের কিছুই বাঁচত না। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আটটি গ্রহ। সূর্য থেকে গ্রহগুলো দূরত্ব অনুযায়ী পর পর যেভাবে রয়েছে তা হলো বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus) এবং নেপচুন (Neptune)। গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃহস্পতি এবং ছোট বুধ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি বেশ উজ্জ্বল এবং কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই দেখা যায়। ইউরেনাস ও নেপচুন এতটা কম উজ্জ্বল যে দূরবীক্ষণ ছাড়া এদের দেখা যায় না।

বুধ (Mercury) : বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার; এর ব্যাস ৪,৮৫০ কিলোমিটার। সূর্যের খুব কাছাকাছি থাকায় সূর্যের আলোর তীব্রতার কারণে সবসময় একে দেখা যায় না। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে বুধের সময় লাগে ৮৮ দিন। সুতরাং বুধ গ্রহে ৮৮ দিনে এক বছর হয়। বুধের মাধ্যাকর্ষণ বল এত কম যে এটি কোনো বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে পারে না। এখানে নেই মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস ও পানি। সুতরাং প্রাণির অস্তিত্ব নেই। ১৯৭৪ সালে মার্কিন মহাশূন্যযান মেরিনার-১০ বুধের যে ছবি পাঠায় তা থেকে দেখা যায় যে, বুধের উপরিতল একদম চাঁদের মতো। ভূত্বক অসংখ্য গর্তে ভরা এবং এবড়ো-থেবড়ো। এখানে আছে অসংখ্য পাহাড় ও সমতলভূমি। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই।

২০২৫

শুক্র (Venus) : বুধের মতো শুক্র গ্রহকেও ভোরের আকাশে শুকতারা এবং সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা

হিসেবে দেখা যায়। শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা আসলে কোনো তারা নয়। কিন্তু নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে বলেই আমরা একে ভুল করে তারা বলি। শুক্র গ্রহটি ঘন মেঘে ঢাকা। তাই এর উপরিভাগ থেকে সূর্যকে কখনই দেখা যায় না। শুক্রের মেঘাচ্ছন্ন বায়ুমণ্ডল প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইডের তৈরি। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ। সূর্য থেকে শুক্র গ্রহের দূরত্ব ১০.৮ কোটি কিলোমিটার। এর দিন ও রাতের মধ্যে আলোর বিশেষ কোনো তারতম্য হয় না। এখানে বৃষ্টি হয় তবে এসিড বৃষ্টি। শুক্রের ব্যাস ১২,১০৪ কিলোমিটার। সূর্যকে ঘুরে আসতে শুক্রের সময় লাগে ২২৫ দিন। সুতরাং শুক্রে ২২৫ দিনে এক বছর। শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। সকল গ্রহ এদের নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খেলেও একমাত্র শুক্র গ্রহ পূর্ব থেকে পশ্চিমে পাক খায়।

পৃথিবী (Earth) : পৃথিবী আমাদের বাসভূমি। এটি সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস প্রায় ১২,৬৬৭ কিলোমিটার। পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। তাই এখানে ৩৬৫ দিনে এক বছর। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও তাপমাত্রা রয়েছে যা উদ্ভিদ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী। সৌরজগতের গ্রহগুলোর মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের অস্তিত্ব আছে।

মঙ্গল (Mars) : মঙ্গল পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী। বছরের অধিকাংশ সময় একে দেখা যায়। খালি চোখে মঙ্গল গ্রহকে লালচে দেখায়। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস ৬,৭৮৭ কিলোমিটার এবং পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। এই গ্রহে দিনরাত্রির পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় সমান। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে মঙ্গলের সময় লাগে ৬৮৭ দিন। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে রয়েছে গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি। এ গ্রহে অক্সিজেন ও পানির পরিমাণ খুবই কম এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এত বেশি (শতকরা ৯৯ ভাগ) যে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। মঙ্গলে ফোবস ও ডিমোস নামে দুটি উপগ্রহ রয়েছে।

বৃহস্পতি (Jupiter) : বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ। একে গ্রহরাজ বলে। এর ব্যাস ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার। আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ১,৩০০ গুণ বড়। এটি সূর্য থেকে প্রায় ৭৭.৮ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে। তাই পৃথিবীর সাতাশ ভাগের একভাগ তাপ পায়। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে তাপমাত্রা খুবই কম এবং অভ্যন্তরের তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি (প্রায় ৩০,০০০° সেলসিয়াস)। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির সময় লাগে ৪,৩৩১ দিন। বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা ৭৯টি। এ গ্রহে জীবের অস্তিত্ব নেই।

শনি (Saturn) : শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। এটি গ্যাসের তৈরি বিশাল এক গোলক। এর ব্যাস ১,২০,০০০ কিলোমিটার। শনির ভূত্বক বরফে ঢাকা। এর বায়ুমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে শনির সময় লাগে পৃথিবীর প্রায় ২৯.৫ বছরের সমান। শনি উজ্জ্বল বলয় দ্বারা বেষ্টিত এবং এর ৮২টি উপগ্রহ আছে।

ইউরেনাস (Uranus) : ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এ গ্রহটি সূর্য থেকে ২৮৭ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এ গ্রহের সময় লাগে ৮৪ বছর। এ গ্রহের গড় ব্যাস ৪৯,০০০ কিলোমিটার। এ গ্রহটি হালকা পদার্থ দিয়ে গঠিত, আবহমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অধিক। শনির মতো ইউরেনাসেরও কয়েকটি বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে শনির বলয়ের ন্যায় এ বলয়গুলো উজ্জ্বল নয়। এর উপগ্রহ সংখ্যা ২৭টি।

নেপচুন (Neptune) : সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কোটি কিলোমিটার। এখানে সূর্যের আলো ও তাপ খুব কম। এর ব্যাস ৪৮,৪০০ কিলোমিটার। এ গ্রহ আয়তনে প্রায় ৭২টি পৃথিবীর সমান এবং ভর ১৭টি পৃথিবীর ভরের সমান। এর বায়ুমণ্ডলে বেশিরভাগই মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস। এর উপগ্রহ সংখ্যা ১৪টি। সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে নেপচুনের সময় লাগে ১৬৫ বছর।

কাজ : দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে ১৫ মিনিটে নিচের ছকটি পূরণ কর।

সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে গ্রহের অবস্থান	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব	সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ কাল	উপগ্রহ সংখ্যা	বৈশিষ্ট্য	
				গঠন	অন্যান্য
বুধ				১। ২।	
শুক্র				১। ২।	
পৃথিবী				১। ২।	
মঙ্গল				১। ২।	
বৃহস্পতি				১। ২।	
শনি				১। ২।	
ইউরেনাস				১। ২।	
নেপচুন				১। ২।	

পৃথিবীর আকার-আকৃতি (Size and shape of the Earth)

মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল স্পুটনিকে চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণের সময় বুঝতে পারেন পৃথিবী 'গোলাকার' তবে উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা। এছাড়া তার তোলা পৃথিবীর ছবিও দেখতে গোলাকৃতি। তবে পূর্ব- পশ্চিমে সামান্য স্ফীত। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি হলো অনেকটা অভিগত গোলকের (Oblate spheriod) মতো।

পৃথিবীর আকৃতি যেহেতু সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, সেহেতু পৃথিবীর নিরক্ষীয় 'পূর্ব-পশ্চিম' ব্যাস ও মেরুদেশীয় 'উত্তর-দক্ষিণ' ব্যাস ভিন্ন। মেরুদেশীয় ব্যাস হলো ১২,৭১৪ কিলোমিটার এবং নিরক্ষীয় ব্যাস হলো ১২,৭৫৭ কিলোমিটার। এদের মধ্যে পার্থক্য হলো ৪৩ কিলোমিটার। পৃথিবীর গড় ব্যাস হলো ১২,৭৩৪.৫ কিলোমিটার। গণনার সুবিধার জন্য একে ১২,৮০০ কিলোমিটার ধরা হয়। এই হিসেবে পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ হলো ৬,৪০০ কিলোমিটার। পৃথিবীর পরিধির মধ্যে নিরক্ষীয় পরিধি ৪০,০৭৭ কিলোমিটার। এটাই সর্ববৃহৎ পরিধি এবং মেরুদেশীয় পরিধি ৪০,০০৯ কিলোমিটার। গণনার সুবিধার জন্য গড় পরিধি ৪০,০০০ কিলোমিটার ধরা হয়।

অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ (Latitude, Longitude and other Important Lines)

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কোনো একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করতে হলে বা এর অবস্থান জানতে হলে আমাদের সবার আগে যে বিষয়গুলো জানতে হবে তা হলো অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা। দ্রাঘিমারেখার অবস্থান থেকে কোনো স্থানের সময় জানা যায়। অক্ষরেখার সাহায্যে যেমন নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থান জানা যায় তেমনি মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থান জানা যায়।

অক্ষরেখা (Latitude)

পৃথিবীর গোলাকৃতি কেন্দ্র দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে অক্ষ (Axis) বা মেরুরেখা বলে। এই অক্ষের উত্তর-প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণ-প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলে। দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। একে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বলে। নিরক্ষরেখার উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ দিকের অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে। এই নিরক্ষরেখাকে ০° ধরে উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে দুই মেরু পর্যন্ত ৯০° বা এক সমকোণ ধরা হয়। পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির জন্য নিরক্ষরেখা বৃত্তাকার, তাই এ রেখাকে নিরক্ষবৃত্তও বলে। নিরক্ষরেখার সমান্তরাল যে রেখাগুলো রয়েছে সেগুলো হলো অক্ষরেখা। এই অক্ষরেখাগুলো আসলে কল্পনা করা হয়েছে। এদের সমাক্ষরেখা বলে। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে (Angular Distance) ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে। একই গোলার্ধের একই অক্ষাংশে মানসমূহের সংযোগ রেখাকে অক্ষরেখা বলে (চিত্র ২.৬)।

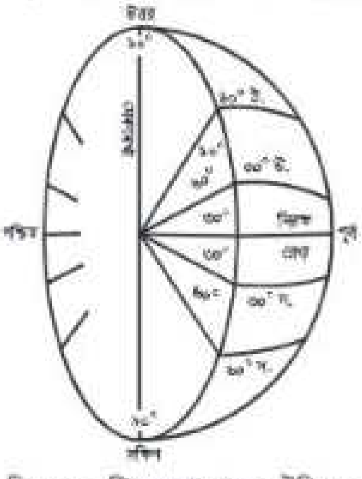

চিত্র ২.৬ : নিরক্ষরেখা থেকে কৌণিক দূরত্ব

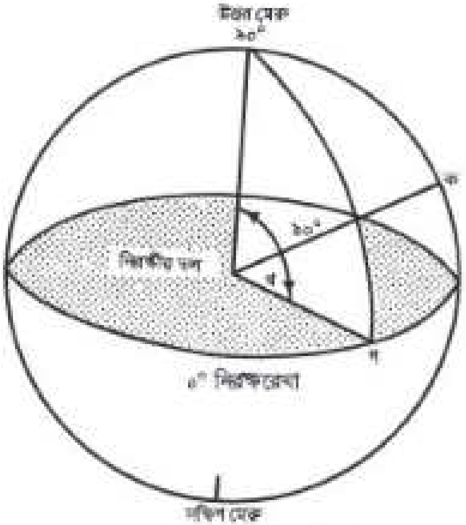

চিত্র ২.৭ : নিরক্ষীয় তল, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থান

অক্ষাংশ নির্ণয় (Determining latitude)

একজন ভূগোলবিদের জন্য অক্ষাংশ নির্ণয় করতে জানা খুবই জরুরি। আমরা জানি পৃথিবী বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ ৩৬০°। অক্ষাংশ নির্ণয় করার জন্য গ্লোবটিকে আমরা যদি মাঝখান দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে কেটে নেই, তাহলে এর মধ্যে আমরা পৃথিবীর ঠিক মধ্যবিন্দু পাব। এখন যদি আমরা কোনো একটি স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করতে চাই, তাহলে সেই মধ্যবিন্দুর সঙ্গে নির্ণেয় স্থানটির নিরক্ষরেখার (০°) পরিপ্রেক্ষিতে যে কোণ উৎপন্ন হয় তা নির্ণয় করতে হবে। এই কোণই হলো সেই স্থানের অক্ষাংশ। যেমন– নিরক্ষীয় তল থেকে উত্তর মেরুর কৌণিক দূরত্ব বা উৎপন্ন কোণ ৯০°। এটাই হলো উত্তর মেরুর অক্ষাংশ। এভাবে দক্ষিণ মেরুর অক্ষাংশও ৯০° (চিত্র ২.৭)। অর্থাৎ ক খ গ হলো ক বিন্দুর অক্ষাংশ।

নিরক্ষরেখার উত্তর দিকে অবস্থিত কোনো একটি স্থানের অক্ষাংশকে উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কোনো স্থানের অক্ষাংশকে দক্ষিণ অক্ষাংশ বলে। প্রতি ডিগ্রি অক্ষাংশকে আবার মিনিট (′) ও সেকেন্ডে (″) ভাগ করা হয়। এখানে একটা কথা লক্ষ রাখতে হবে, সময়ের মিনিট (′) ও সেকেন্ড (″) এবং দূরত্বের মিনিট (′) ও সেকেন্ড (″) একেবারেই আলাদা দুটি বিষয়। কয়েকটি সমাক্ষরেখা খুব বিখ্যাত। এদের একটি ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ, একে কর্কটক্রান্তি বলে। অপরটি ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ, একে বলে মকরক্রান্তি। ৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশকে বলে সুমেরুবৃত্ত এবং ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলে কুমেরুবৃত্ত। বিষুবরেখাকে মহাবৃত্ত বা গুরুবৃত্ত বলে (চিত্র ২.৮)।

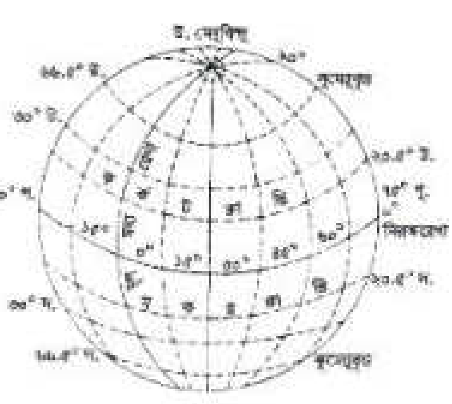

চিত্র ২.৮ : অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

অক্ষাংশ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো –

১। **সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে :** যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা যায় তাকে সেক্সট্যান্ট যন্ত্র বলে। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি কোণ নির্ণয় করে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। কোনো স্থানের অক্ষাংশ = ৯০° – (মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি ± বিষুবলম্ব)।

বিষুবলম্ব : সূর্য যেদিন যে অক্ষাংশের উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় সেটাই সেদিনের সূর্যের বিষুবলম্ব। কোনো একদিন দক্ষিণ গোলার্ধে মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি ৫০° এবং বিষুবলম্ব ১২° দক্ষিণ হলে ঐ স্থানের অক্ষাংশ হবে –

অক্ষাংশ = ৯০° – (মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি + বিষুবলম্ব) = ৯০° – (৫০° + ১২°) = ৯০° – ৬২° = ২৮° দক্ষিণ।

স্থানটি যদি উত্তর গোলার্ধে হয় তবে উত্তরবাচক বিষুবলম্ব যোগ করতে হবে এবং দক্ষিণবাচক বিষুবলম্ব বিয়োগ করতে হবে। দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণবাচক বিষুবলম্ব যোগ এবং উত্তরবাচক বিষুবলম্ব বিয়োগ করতে হবে।

২। **ধ্রুবতারার সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয় :** ধ্রুবতারার উন্নতি জেনে কোনো স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। এর সাহায্যে শুধু উত্তর গোলার্ধের কোনো স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। নিরক্ষরেখায় ধ্রুবতারার উন্নতি ০° এবং উত্তর মেরুতে ঠিক মাথার উপর ধ্রুবতারার উন্নতি ৯০° হয়। সুতরাং উত্তর গোলার্ধে কোনো স্থানের অক্ষাংশ ধ্রুবতারার উন্নতির সমান।

দ্রাঘিমারেখা (Longitude)

নিরক্ষরেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগবিন্দুর উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে সকল রেখা কল্পনা করা হয়েছে, সেগুলোই হলো দ্রাঘিমারেখা। এ রেখাগুলো পৃথিবীর পরিধির অর্ধেকের সমান। অর্থাৎ এক-একটি অর্ধবৃত্ত।

আমরা পূর্বেই জেনেছি অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলো হলো কাল্পনিক। দ্রাঘিমারেখা নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের জানতে হবে মূল মধ্যরেখার অবস্থান। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের কাছে গ্রিনিচ (Greenwich) মান মন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম

করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। গ্রিনিচের দ্রাঘিমা ০°। গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা বলে। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ ৩৬০°। মূল মধ্যরেখা, এই ৩৬০° কে ১° অন্তর অন্তর সমান দুই ভাগে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমে ১৮০° করে ভাগ করেছে। অক্ষাংশের ন্যায় দ্রাঘিমাকেও মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করা হয়েছে।

পৃথিবী গোল বলে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা ও ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে। গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে ৩০° পূর্বে যে দ্রাঘিমারেখা তার উপর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সকল স্থানের দ্রাঘিমা ৩০° পূর্ব দ্রাঘিমা (চিত্র ২.৯)।

দ্রাঘিমা নির্ণয় ও ব্যবহার : দ্রাঘিমা নির্ণয়ের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে।

১। স্থানীয় সময়ের পার্থক্য দ্বারা ও

২। গ্রিনিচের সময় দ্বারা।

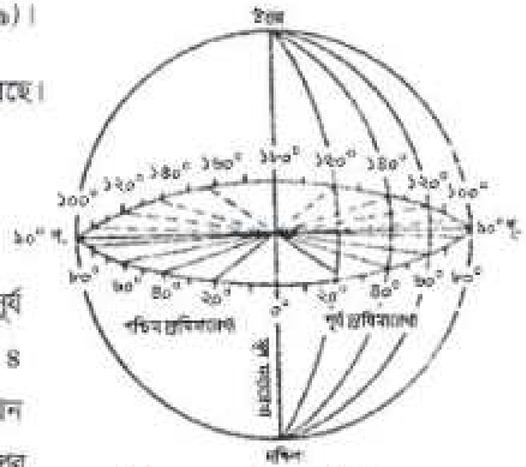

চিত্র ২.৯ : দ্রাঘিমা ও কৌণিক দূরত্ব

১। স্থানীয় সময়ের পার্থক্য : কোনো স্থানে মধ্যাহ্নে যখন সূর্য ঠিক মাথার উপর আসে সেখানে দুপুর ১২টা ধরে প্রতি ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় ১°। এখন আমরা সহজেই হিসাব করতে পারি, যদি কোনো স্থানে দুপুর ১২টা হয় সেখান থেকে ১০° পূর্বের কোনো স্থানের সময় হবে ১২টা + (১০ × ৪) মিনিট বা ১২টা ৪০ মিনিট। আবার যদি সে স্থানটি ১০° পশ্চিম দিকে হয় তাহলে সময় হবে ১২টা – (১০ × ৪) মিনিট বা ১১টা ২০ মিনিট। এভাবে মধ্যাহ্নের সময় অনুসারে দিনের অন্যান্য সময় নির্ধারণ করা যায়।

২। গ্রিনিচের সময়: গ্রিনিচের দ্রাঘিমা শূন্য ডিগ্রি (০°) ধরা হয়। এখন আমরা যদি গ্রিনিচের সময় এবং অন্য কোনো স্থানের সময় জানতে পারি, তাহলে দুই স্থানের সময়ের পার্থক্য অনুসারে প্রতি ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে ১° দ্রাঘিমার পার্থক্য ধরে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে পারি। গ্রিনিচের পূর্ব দিকের দেশগুলো সময়ের হিসেবে গ্রিনিচের চেয়ে এগিয়ে থাকে এবং গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলোর সময় গ্রিনিচের সময় থেকে পিছিয়ে থাকে। বাংলাদেশ গ্রিনিচ থেকে ৯০° পূর্বে অবস্থিত বলে বাংলাদেশের সময় ৬ ঘণ্টা এগিয়ে। এভাবে দ্রাঘিমার সাহায্যে সময় এবং সময়ের মাধ্যমে দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ (Important lines)

নিরক্ষরেখা : পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে যে রেখাটি পূর্ব-পশ্চিমে সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে নিরক্ষরেখা বলে। নিরক্ষরেখার অপর নাম হলো– বিষুবরেখা (Equator), ০° অক্ষরেখা (০° Latitude), মহাবৃত্ত (Great circle)।

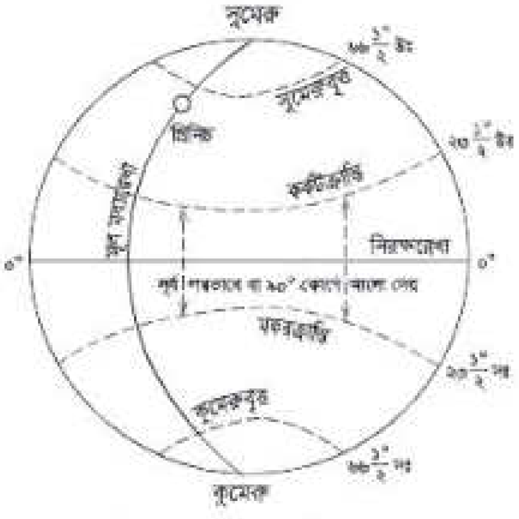

চিত্র ২.১০ : পৃথিবীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখা এবং মূল মধ্যরেখা

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা : উত্তর গোলার্ধে ২৩.৫° উত্তর অক্ষরেখাকে কর্কটক্রান্তি রেখা এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে মকরক্রান্তি রেখা বলে। আমাদের বাংলাদেশের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এই দুটি রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সূর্যের আলো লম্বভাবে পৃথিবীতে পড়ে।

সুমেরুবৃত্ত ও কুমেরুবৃত্ত : উত্তর গোলার্ধে ৬৬.৫° উত্তর অক্ষরেখাকে সুমেরুবৃত্ত এবং ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষরেখাকে কুমেরুবৃত্ত বলে (চিত্র ২.১০)।

কাজ : প্রতিবেশী দেশগুলোর রাজধানী অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে বের কর।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line)

দ্রাঘিমারেখার নিয়মানুসারে মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে অগ্রসর হলে প্রতি ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়। আমরা জানি ০° দ্রাঘিমার ঠিক উল্টো দিকে ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা।

যেহেতু প্রতি ১°-এর জন্য ৪ মিনিট সেহেতু ১৮০°-এর জন্য ১৮০ × ৪ = ৭২০ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার পার্থক্য হয়। এভাবে দুই দিকে, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ১২ ঘণ্টা করে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধান হয়। পূর্ব দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা বাড়ে আর পশ্চিম দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা কমে অর্থাৎ একই দ্রাঘিমায় ১৮০° তে সময়ের ব্যবধান দেখা দেয় ২৪ ঘণ্টা।

এর জন্য তারিখ ও বারের যে সমস্যা হয় তার সমাধানকল্পে ১৮৮৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে 'দ্রাঘিমা ও সময়' সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হিসেবে স্থির করা হয় (চিত্র ২.১১)।

আমরা চিত্রের মধ্যে দেখতে পাই গ্রিনিচে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৬টা হলে আমরা যদি পূর্ব দিকের সময় হিসাব করি, তাহলে যখন ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমায় আসব তখন সেখানে সময় হবে ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা। ঠিক উল্টো দিকে পশ্চিমে ১৮০° তে আসলে সেখানে ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা হবে। কারণ পূর্ব দিকে সময়

বাড়ে আর পশ্চিম দিকে সময় কমে। আমরা জানি ১৮০° পূর্ব ও ১৮০° পশ্চিম একই স্থান। তবে এখানে সময়ের পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টা এবং তারিখও হয়ে যাচ্ছে দুই রকম। এই অসুবিধা দূর করার জন্য পৃথিবীর মানচিত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে ১৮০° দ্রাঘিমা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রবর্তন করা হয়েছে।

পশ্চিমগামী জাহাজ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রমকালে ঘড়ির সময় একদিন বাড়িয়ে অর্থাৎ সেদিন সোমবার থাকলে তাকে মঙ্গলবার করা হয়। আর জাহাজ যদি পূর্ব দিকে যায় তাহলে একদিন বিয়োগ করতে হয়। সেদিন মঙ্গলবার হলে একদিন কমিয়ে সোমবার করা হয়। তাই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করার সূত্র হলো : 'পশ্চিমগামী যানের জন্য একদিন যোগ করতে হবে এবং পূর্বগামী যানের ক্ষেত্রে একদিন বিয়োগ করতে হবে।'

চিত্র ২.১১ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও স্থানীয় সময়ের পার্থক্য

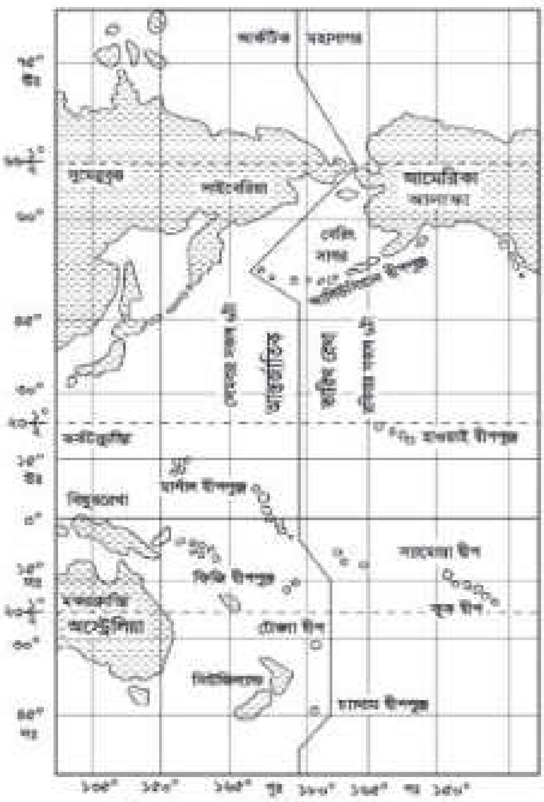

চিত্র ২.১২ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

১৮০° দ্রাঘিমারেখা পৃথিবীর পশ্চিম বা পূর্ব গোলার্ধের তারিখ বিভাজিকার (Date line divider) কাজ করে। এজন্যই ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে (চিত্র ২.১২)।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে কোথাও কোথাও বাঁকিয়ে নেওয়া হয়েছে। কারণ ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অনুসরণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে টানা হলেও সাইবেরিয়ায় উত্তর-পূর্বাংশ এবং অ্যালিউসিয়ান, ফিজি এবং চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের স্থলভাগকে এড়িয়ে চলার জন্য এই রেখাটিকে অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জে ১১° পূর্ব দিয়ে বাঁকিয়ে এবং বেরিং প্রণালিতে ১২° পূর্বে বাঁকিয়ে শুধু পানির উপর দিয়ে টানা হয়েছে। তা না হলে স্থানীয় অধিবাসীদের বার নির্ণয় করতে অসুবিধা হতো। কারণ একই স্থানের মধ্যেই সময় এবং বার দুই রকম হতো।

কাজ : মানব-জীবনে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার গুরুত্ব লেখ (জোড়ায় জোড়ায়)।

প্রতিপাদ স্থান (The antipodes) : আমরা জানি পৃথিবী গোল তাই এর কোনো একটি স্থানের বিপরীত দিকে অন্য কোনো একটি স্থান রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কোনো কল্পিত ব্যাস ভূকেন্দ্র ভেদ করে অপরদিকে ভূপৃষ্ঠকে যে বিন্দুতে স্পর্শ করে, সেই বিন্দুকে প্রথম বিন্দুটির প্রতিপাদ স্থান বলে (চিত্র ২.১৩)।

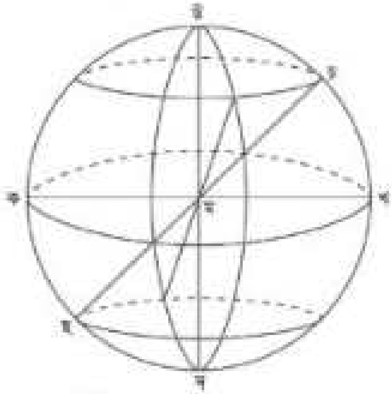

চিত্র ২.১৩ : প্রতিপাদ স্থান

কোনো বিশেষ দ্রাঘিমায় অবস্থিত স্থান সেই স্থানের বিপরীত দ্রাঘিমারেখায় অবস্থিত হয়। অর্থাৎ দুই দ্রাঘিমার যোগফল হবে ১৮০°। যেহেতু দুই দ্রাঘিমার দূরত্ব হবে ১৮০° সেহেতু দুটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য হবে (১৮০ × ৪ মিনিট =৭২০ মিনিট বা ১২ ঘণ্টা) = ১২ ঘণ্টা। চিত্রে চ বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান ছ বিন্দু।

কাজ : দলগতভাবে তোমরা ভূগোলকের সাহায্যে ঢাকার প্রতিপাদ স্থান বের কর।

পৃথিবীর গতি (Rotation of the Earth)

পূর্বে মনে করা হতো পৃথিবী স্থির এবং সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। পৃথিবী শুধু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে না, নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার উপরও আবর্তন করে। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার। নিজ অক্ষের উপর একদিনে আবর্তন করাকে আহ্নিক গতি (Rotation) এবং কক্ষপথে এক বছরে সূর্যকে পরিক্রমণ করাকে বার্ষিক গতি (Revolution) বলে।

আহ্নিক গতি (Rotation)

পৃথিবী গতিশীল। পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের বা অক্ষের চারদিকে দিনে একবার নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করতে সময় নেয় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ একদিন। একে সৌরদিন বলে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। পৃথিবীপৃষ্ঠ পুরোপুরি গোল না হওয়ায় এর পৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়। সে কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল স্থানের আবর্তন বেগও সমান নয়। নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর পরিধি সবচেয়ে বেশি। এজন্য নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সবচেয়ে বেশি। ঘণ্টায় প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার। ঢাকায় পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ ১৬০০ কিলোমিটার। যত মেরুর দিকে যাবে এ আবর্তনের বেগ তত কমতে থাকে এবং মেরুদ্বয়ে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।

পৃথিবীর আবর্তন গতি থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ি না বা তা অনুভব করি না। এর কারণ হলো :

১। ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করার কারণে মানুষ, জীবজন্তু, বায়ুমণ্ডল প্রভৃতি পৃথিবীর সঙ্গে একই গতিতে আবর্তন করছে, তাই আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি অনুভব করতে পারি না।

২০১৮

২। ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত সকল বস্তুকে পৃথিবী অভিকর্ষ বল দ্বারা নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে, তাই আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ি না।

৩। পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় আমরা এত বেশি ক্ষুদ্র যে এই গতি অনুভব করি না বা ছিটকে পড়ি না।

৪। পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের আবর্তন গতি সুনির্দিষ্ট তাই আমরা গতি অনুভব করি না।

৫। দুটি বস্তুর মধ্যে একটি যদি দাঁড়িয়ে থাকে এবং অন্যটি যদি চলতে থাকে তাহলে বোঝা যায় তার গতি আছে। এভাবে পৃথিবীর সামনে স্থির বা সমান কোনো বস্তু নেই যার সাপেক্ষে আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি বুঝতে পারি।

আহ্নিক গতির প্রমাণ (Proofs of Rotation)

পৃথিবী যে নিজের মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে তার প্রমাণ হলো :

১। **মহাকাশযানের পাঠানো ছবি :** পৃথিবী থেকে যেসব উপগ্রহ ও মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে সেগুলোর প্রেরিত ছবি থেকে দেখা যায় যে, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এ ছবিগুলোই পৃথিবীর আবর্তন বা আহ্নিক গতির সর্বাধুনিক ও নির্ভুল প্রমাণ।

২। **পৃথিবীর আকৃতি :** কোনো নমনীয় বস্তু যদি নিজের অক্ষের উপর লাটিমের মতো ঘুরতে থাকে তবে তার মধ্যে একই সঙ্গে কেন্দ্রমুখী (Centripetal) এবং কেন্দ্রবিমুখী (Centrifugal) বলের উদ্ভব হয়, যার প্রভাবে গোলাকৃতি বস্তুর প্রান্তদেশ কিছুটা চাপা ও মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীত হয়। আবর্তন গতির প্রভাবেই জন্মকালে নমনীয় পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু একটু চাপা এবং মধ্যভাগ সামান্য স্ফীত হয়ে যায়। বিজ্ঞানী নিউটন বলেন যে, পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই এর আকৃতি এমন হয়েছে (চিত্র ২.১৪)।

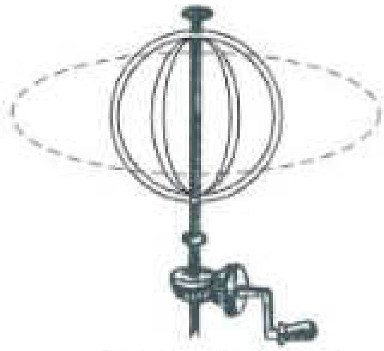

চিত্র ২.১৪ : পৃথিবীর আকৃতি

৩। **রাত-দিন হওয়া :** পৃথিবীর বেশিরভাগ স্থানেই পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত্রি হয়। অর্থাৎ ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত পৃথিবীর আহ্নিক গতির অন্যতম প্রমাণ। এ আহ্নিক গতি না থাকলে পৃথিবীর একদিক চিরকাল অন্ধকারে থাকত এবং অপরদিক আলোকিত হয়ে থাকত।

৪। **ফেরেলের সূত্রের সাহায্যে :** আমরা জানি সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। এই বেঁকে যাওয়াটা ফেরেলের সূত্র নামে পরিচিত। বায়ুপ্রবাহ এবং সমুদ্রস্রোতের এই গতিবেগ প্রমাণ করে যে, আহ্নিক গতিতে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে (চিত্র ২.১৫)।

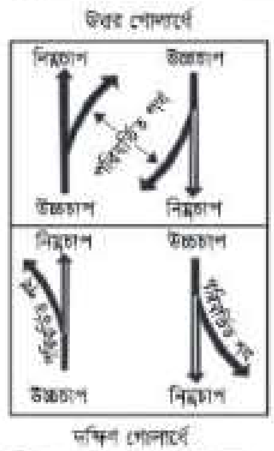

চিত্র ২.১৫ : ফেরেলের সূত্র

আহ্নিক গতির ফল (Results of Rotation) : পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে যেসব পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই তা হলো–

১। **পৃথিবীতে দিবারাত্রি সংঘটন :** পর্যায়ক্রমে দিনরাত্রি সংঘটিত হওয়া পৃথিবীর আহ্নিক গতির একটি ফল। আমরা জানি পৃথিবী গোল এবং এর নিজের কোনো আলো নেই।

২০২৫

সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। আবর্তন গতির জন্য পৃথিবীর যেদিক সূর্যের সামনে আসে, সেদিক সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়। তখন ঐ আলোকিত স্থানসমূহে দিন। আলোকিত স্থানের উল্টা দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর যেদিকটা সূর্যের বিপরীত দিকে, সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সেদিকটা অন্ধকার থাকে। এসব অন্ধকার স্থানে তখন রাত্রি (চিত্র ২.১৬)।

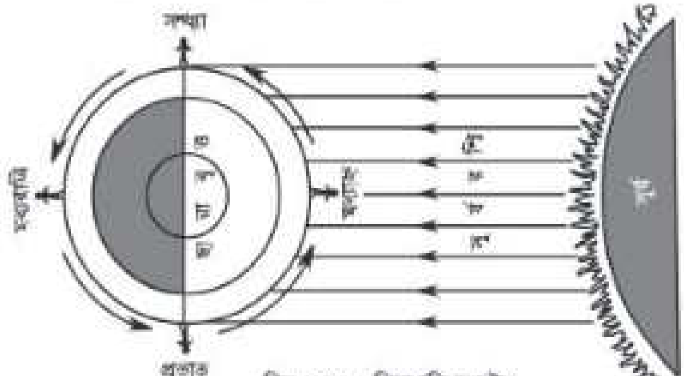

চিত্র ২.১৬ : দিবারাত্রি সংঘটন

পৃথিবীর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনের ফলে আলোকিত দিকটি অন্ধকারে আর অন্ধকারের দিকটি সূর্যের দিকে বা আলোকে চলে আসে। ফলে দিনরাত্রি পাল্টে যায়। অন্ধকার স্থানগুলো আলোকিত হওয়ার ফলে এসব স্থানে দিন হয়। আর আলোকিত স্থান অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ফলে ঐসব স্থানে রাত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে দিনরাত্রি সংঘটিত হতে থাকে কোনো স্থানে ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত্রি হয়।

২। **জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি :** আহ্নিক গতির ফলেই জোয়ার-ভাটা সংঘটিত হচ্ছে। আমরা দেখি প্রতিদিন জোয়ার-ভাটা একই সময়ে হচ্ছে না। আজকে জোয়ার যে স্থানে যে সময়ে হচ্ছে, পরের দিন সেই সময়ে না হয়ে তার ৫২ মিনিট পরে হচ্ছে। এই যে সময়ের ব্যবধান সেটা আহ্নিক গতির কারণেই হচ্ছে।

৩। **বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি :** পৃথিবীর অভিগত গোলকের কারণে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর মেরুর দিকে অক্ষরেখাগুলোর পরিধি ও পৃথিবীর আবর্তনের গতিবেগ ক্রমশ কমতে থাকে। এসব কারণে পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ বা সমুদ্রস্রোতের গতির দিক সরাসরি উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

৪। **তাপমাত্রার তারতম্য সৃষ্টি :** দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ থাকার কারণে তাপমাত্রা বেশি থাকে। রাত হলে তাপ বিকিরণ করে তাপমাত্রা কমে যায়। যদি আহ্নিক গতি না থাকত তাহলে এভাবে দিনের পর রাত আসত না এবং তাপমাত্রার তারতম্য সৃষ্টি হতো না। এই তাপমাত্রার তারতম্য হলো আহ্নিক গতির একটি ফল।

৫। **সময় গণনা বা সময় নির্ধারণ :** আহ্নিক গতির ফলে সময়ের হিসাব করতে সুবিধা হয়। একবার সম্পূর্ণ আবর্তনের সময়ের ২৪ ভাগের এক ভাগকে ঘণ্টা ধরে তার ৬০ ভাগের ১ ভাগকে মিনিট, মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগকে সেকেন্ড-এভাবে সময় গণনা করা হয়।

৬। **উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ সৃষ্টি :** পৃথিবীর আবর্তনের কারণেই পৃথিবীর সব জায়গায় পর্যায়ক্রমে সূর্যালোক পড়ে এবং দিনরাত্রি হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য সূর্যালোকই বেশি প্রয়োজন। দিনের বেলায় সূর্যালোক থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং রাতে ঐ শক্তি নিজেদের শারীরবৃত্তীয় কাজে লাগায়। কোনো প্রাণী দিনে আবার কোনো প্রাণী রাতে খাদ্য সংগ্রহ করে। পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে দিনরাত্রি সংঘটিত হয় এবং তার উপরই উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের নিয়মশৃঙ্খলা অনেকখানি নির্ভর করে।

বার্ষিক গতি (Revolution)

সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট দিকে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে) এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি বা পরিক্রমণ গতি বলে।

একবার সূর্যকে পূর্ণ পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। একে সৌরবছর বলে। কিন্তু আমরা ৩৬৫ দিনকে এক বছর ধরি। এতে প্রতি বছর প্রায় ৬ ঘণ্টা অতিরিক্ত থেকে যায়। এ অতিরিক্ত সময়ের সামঞ্জস্য আনার জন্য প্রতি ৪ বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসে ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিন বাড়িয়ে সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়। এভাবে যে বছর ফেব্রুয়ারি মাসকে ১ দিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করা হয় এবং ঐ বছরটিকে ৩৬৬ দিন ধরা হয়। সেই বছরকে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ বলে। সাধারণত কোনো বছরকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগশেষ না থাকে, তবে ঐসব বছরকে অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার (Leap Year) ধরা হয়।

কাজ : ২০১৩ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে কোন কোন বছরটি লিপ ইয়ার নির্ণয় কর।

বার্ষিক গতির ফল (The results of Revolution) : বার্ষিক গতির ফল হলো– (১) দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি, (২) ঋতু পরিবর্তন।

দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি : পৃথিবীর দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ–

(ক) পৃথিবীর অভিগত গোলাকৃতি; (খ) পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ; (গ) পৃথিবীর অবিরাম আবর্তন ও পরিক্রমণ গতি; (ঘ) পৃথিবীর মেরুরেখার সর্বদা একই মুখে অবস্থান; (ঙ) পৃথিবীর কক্ষপথে কৌণিক অবস্থান।

সূর্যকে প্রদক্ষিণের সময় পৃথিবী আপন মেরুরেখায় কক্ষপথের সঙ্গে ৬৬.৫° কোণে হেলে থাকে। পৃথিবী ৬৬.৫° কোণ করে চলার কারণে ২১এ মার্চ সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এরপর ধীরে ধীরে সূর্যের কিরণ উত্তর গোলার্ধের দিকে যেতে থাকে। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে করতে ২১এ জুন পৃথিবী এমন এক জায়গায় আসে যে, তখন সূর্যের রশ্মি ভূপৃষ্ঠের ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশে অর্থাৎ কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে পড়ে (চিত্র ২.১৭)। এ সময় উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে। সে কারণে এই সময় উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রাও বেশি হয়ে থাকে। উত্তর গোলার্ধে ২১এ জুন দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত হয়। ২১এ জুন সূর্য উত্তরায়ণের শেষ সীমায় পৌঁছায়, একে কর্কটসংক্রান্তি বলে।

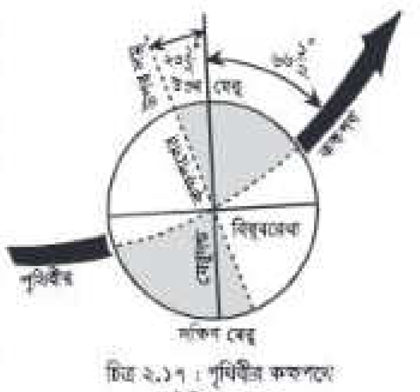

চিত্র ২.১৭ : পৃথিবীর কক্ষপথে কৌণিক অবস্থান

২৩এ সেপ্টেম্বর পুনরায় ২১এ মার্চের মতো সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। সেদিন সর্বত্র দিবারাত্রি সমান থাকে। ২৩এ সেপ্টেম্বর থেকে আবার সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে কিরণ বেশি দিতে থাকে। ২২এ ডিসেম্বর সূর্য এমনভাবে কোণ করে থাকে তাতে দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন হয়।

২২এ ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌঁছায়, একে মকরসংক্রান্তি বলে। এ সময় সূর্যের রশ্মি ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে অর্থাৎ মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে পতিত হয়।

২১এ মার্চ এবং ২৩এ সেপ্টেম্বর এই দুদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। সেদিনকে বিষুব (Equinox) বলে। ২১এ মার্চ উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল তাই একে বাসন্ত বিষুব (Vernal equinox) বলে। ২৩এ সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল। তাই ঐ দিনকে শারদ বিষুব (Autumnal equinox) বলে।

বার্ষিক গতির প্রমাণ (Proofs of Revolution)

১। **রাতের আকাশে নক্ষত্রদের স্থান পরিবর্তন, অন্তর্ধান ও পুনরাগমন :** বিভিন্ন সময়ে রাতের আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নক্ষত্রগুলোর অবস্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায়। মেঘমুক্ত আকাশে কয়েকদিন পর পর লক্ষ করলে নক্ষত্রের পূর্ব থেকে পশ্চিম আকাশে সরে যাওয়া বোঝা যায়। এরপর একদিন এরা অদৃশ্য হয়ে যায়। ঠিক এক বছর পর এরা আদি স্থানে ফিরে আসে। এ থেকে পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি আছে তা বোঝা যায়।

২। **আকাশে সূর্যের পরিবর্তিত অবস্থান :** বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যকে বিভিন্ন অবস্থানে দেখা যায়। সূর্য প্রতিদিন পূর্ব আকাশে একই জায়গা থেকে ওঠে না এবং পশ্চিম আকাশে একই জায়গায় অস্ত যায় না। বছরের ছয় মাস সূর্য একটু একটু করে দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে পূর্ব আকাশে উদিত হয়। বাকি ছয় মাস সূর্য একটু একটু করে উত্তর দিকে সরে গিয়ে পূর্ব আকাশে উদিত হয়। পৃথিবী একই জায়গায় স্থির থেকে ঘুরলে প্রতিদিনই সূর্য একই জায়গায় উদিত হতো। পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে এ ঘটনা ঘটে।

৩। **বিভিন্ন গ্রহের পরিক্রমণ গতি :** দূরবিনের সাহায্যে পৃথিবী থেকে দেখা গেছে সকল গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। পৃথিবীও একটি গ্রহ সুতরাং এরও পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি রয়েছে।

৪। **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা :** আধুনিক যুগের মহাশূন্যচারীগণ মহাশূন্যযান থেকে পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি দেখেছেন।

৫। **মহাকর্ষ সূত্র :** সূর্যের তুলনায় পৃথিবী খুবই ক্ষুদ্র, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। তাই স্বাভাবিক কারণে সূর্যের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

ঋতু পরিবর্তন (Change of season)

তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারাবছরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এ প্রতিটি ভাগকে এক একটি ঋতু বলে। তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারাবছরকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো– গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল। আমরা জানি, সমগ্র পৃথিবীকে দুটো গোলার্ধে ভাগ করা হয়েছে। নিরক্ষরেখার উপরের দিকের অংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং নিচের দিকের অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ ধরা হয়। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। তেমনি উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্তকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শরৎকাল। আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর গোলার্ধে। এখানে জুন মাসের দিকে গরম বেশি অনুভূত হয়। এই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল।

ঋতু পরিবর্তনের কারণ (Causes of Seasonality) : পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ হলো–

(১) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দিবারাত্রির তারতম্যের জন্য উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি : পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সূর্য পৃথিবীর যে গোলার্ধের নিকট অবস্থান করে, সেই গোলার্ধে দিন বড় এবং রাত ছোট। তার বিপরীত গোলার্ধে রাত বড় এবং দিন ছোট। পৃথিবী দিনের বেলায় তাপ গ্রহণ করে বলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এবং রাতের বেলায় বিকিরণ করে শীতল হয়। তখন একটি স্থানে বড় দিনে ভূপৃষ্ঠ যে তাপ গ্রহণ করে, ছোট রাতে সে তাপ পুরোটা বিকিরণ করতে পারে না। ঐ স্থানে সঞ্চিত তাপের কারণে আবহাওয়া উষ্ণ হয় এবং তাতে গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। বিপরীত গোলার্ধে রাত বড় এবং দিন ছোট হওয়াতে দিনের বেলায় যে তাপ গ্রহণ করে, রাতের বেলায় তা বিকিরণ করে ঠান্ডা অনুভূত হয়। তখন শীতকাল পরিলক্ষিত হয়।

(২) পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি : পৃথিবী গোল, তাই পৃথিবীর কোথাও সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে আবার কোথাও তির্যকভাবে পড়ে। ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তিত হয়।

(৩) পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ : পৃথিবীর আবর্তন পথ উপবৃত্তাকার তাই বছরের বিভিন্ন সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কমবেশি হয়। এতে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়, তাই ঋতু পরিবর্তিত হয়।

(৪) পৃথিবীর কক্ষপথে কৌণিক অবস্থান : সূর্যকে পরিক্রমণের সময় নিজ কক্ষতলের সঙ্গে পৃথিবীর মেরুরেখা সমকোণে না থেকে ৬৬.৫° কোণে হেলে একই দিকে অবস্থান করে। এতে বছরে একবার পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু সূর্যের নিকটবর্তী হয়। যে গোলার্ধ যখন সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে সে গোলার্ধে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। তার তাপমাত্রা তখন বেশি হয় এবং দূরে গেলে তাপমাত্রা কম হয়, ফলে ঋতু পরিবর্তন ঘটে (চিত্র ২.১৮)।

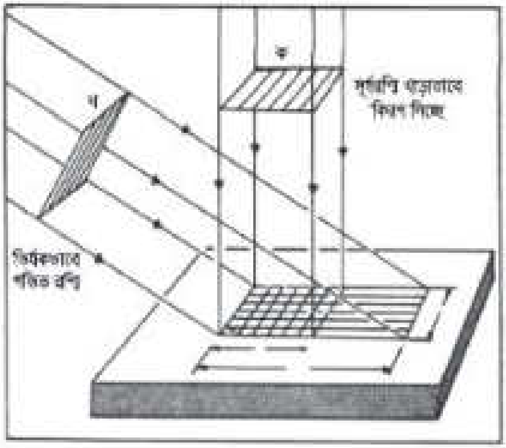

চিত্র ২.১৮ : 'ক' স্থানে লম্বভাবে পড়া সূর্যরশ্মি 'খ' স্থানে তির্যকভাবে পড়া সূর্যরশ্মির তুলনায় বেশি উষ্ণ হয়

(৫) বার্ষিক গতির কারণে : পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য সূর্যকিরণ বিভিন্ন স্থানে কমবেশি পড়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটছে। ফলে বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বিভিন্নতা হয়। একে ঋতু পরিবর্তন বলে।

ঋতু পরিবর্তন প্রক্রিয়া (The process of Seasonality) : আমরা জানি, পৃথিবীতে চারটি ঋতু– গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল। আমরা এখন দেখব ঋতু কীভাবে পরিবর্তিত হয়। সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থা থেকে ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল : ২১এ মার্চের পর থেকে পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মেরু ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে যত দিন যায় তত উত্তর মেরুতে আলোকিত অংশ বাড়তে থাকে। এভাবে ২১এ জুনে গিয়ে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপর লম্বভাবে

কিরণ দিতে থাকে। ফলে ২১এ জুন উত্তর গোলার্ধে বড় দিন এবং ছোট রাত হয়। ঐ দিনই সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ এবং তার পরের দিন থেকে পুনরায় সূর্য দক্ষিণ দিকে আসতে থাকে। দিন বড় হওয়ার কারণে উত্তর গোলার্ধে ২১এ জুনের দেড় মাস পূর্ব থেকেই গ্রীষ্মকাল শুরু হয় এবং পরের দেড় মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল স্থায়ী হয়। এই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক বিপরীত অবস্থা দেখা যায় অর্থাৎ শীতকাল অনুভূত হয়। এ সময় সূর্য হেলে থাকার কারণে এ গোলার্ধে সূর্য কম সময় ধরে কিরণ দেয়। ফলে দিন ছোট এবং রাত বড় হয়। দিনে ভূপৃষ্ঠ যতটুকু উত্তপ্ত হয়, রাতে তাপ বিকিরণের ফলে তা ঠান্ডা হয়ে যায়। এখানে তখন শীতের আবহাওয়া বিরাজ করে। দক্ষিণ গোলার্ধে এ সময়কে শীতকাল বলে (চিত্র ২.১৯)।

উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল : ২১এ জুন থেকে দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। উত্তর গোলার্ধের অংশগুলো কম কিরণ পেতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের অংশগুলো বেশি সূর্যকিরণ পেতে থাকে। এভাবে ২৩এ সেপ্টেম্বর সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। তাই এ সময় পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত্রি সমান হয়। দিনের বেলায় যে তাপ আসে রাত সমান হওয়ায় একই পরিমাণ তাপ বিকিরিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে আবহাওয়াতে ঠান্ডা গরমের পরিমান সমান থাকে। এই সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল বিরাজ করে। ২৩এ সেপ্টেম্বরের দেড় মাস আগে থেকেই উত্তর গোলার্ধে শরৎকালের সূচনা হয় এবং দেড় মাস পর পর্যন্ত এই শরৎকাল স্থায়ী থাকে।

চিত্র ২.১৯ : পৃথিবীর পরিক্রমণ– দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন

উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল : ২৩এ সেপ্টেম্বরের পর দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। এই সময় দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসতে থাকে এবং উত্তর গোলার্ধ দূরে সরতে থাকে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্য লম্বভাবে এবং উত্তর গোলার্ধে কোণ করে কিরণ দিতে থাকে। এতে উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় এবং রাত ছোট হতে থাকে। এর মধ্যে ২২এ ডিসেম্বর সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। সেই দিন উত্তর গোলার্ধে ছোট দিন ও বড় রাত হওয়াতে শীতকাল। ঐ দিনই সূর্যের দক্ষিণায়নের শেষ এবং তার পরের দিন থেকে পুনরায় সূর্য উত্তর দিকে আসতে থাকে। ২২এ ডিসেম্বরের দেড় মাস পূর্বেই উত্তর গোলার্ধে শীতকাল শুরু হয় এবং পরের দেড় মাস পর্যন্ত বিরাজ করে। এই সময়টাতে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল।

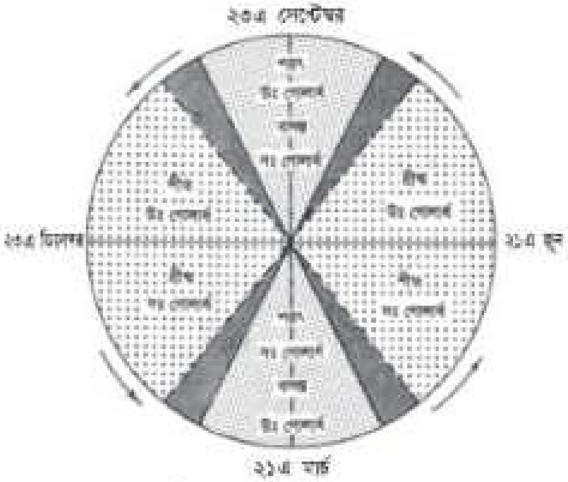

চিত্র ২.২০ : পৃথিবীর ঋতুচক্র

উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল : পৃথিবী তার কক্ষপথে চলতে চলতে ২২এ ডিসেম্বরের পর থেকে ২১এ মার্চ পর্যন্ত এমন স্থানে ফিরে আসে যখন সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে। ফলে ২১এ মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। দিনের বেলায় সূর্যকিরণের কারণে ভূপৃষ্ঠের বায়ুস্তর গরম হয় এবং রাত্রিবেলায় বিকিরিত হয়ে ঠান্ডা হয়। এই সময় উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল। ২১এ মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয় এবং ঐ দিনটিকে বাসন্ত বিষুব বা মহাবিষুব বলে (চিত্র ২.২০)।

ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব (Impact of Seasonality)

- ঋতু পরিবর্তন মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে
- মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও পেশাকে প্রভাবিত করে
- পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান ঋতু পরিবর্তনের ফলে বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়
- ঋতু পরিবর্তন জীবজগতের বৃদ্ধি ও বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করে
- ঋতু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়

কাজ : দলগতভাবে নিচের ছকটি পূরণ কর।

উত্তর গোলার্ধের ক্ষেত্রে কী সংঘটিত হয়?

সময়	সূর্যের পরিক্রমণকালে পৃথিবীর ভৌগোলিক রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ	দিবারাত্রির তথ্য	ঋতুর নাম
২১ জুন	কর্কটক্রান্তি রেখা		
২৩ সেপ্টেম্বর	নিরক্ষরেখা		
২২ ডিসেম্বর	মকরক্রান্তি রেখা		
২১ মার্চ	নিরক্ষরেখা		

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন গ্রহের ২৭টি উপগ্রহ আছে?

(ক) মঙ্গল (খ) বৃহস্পতি

(গ) শনি (ঘ) ইউরেনাস

২। আহ্নিক গতির ফলে–

i. পৃথিবীতে দিবারাত্রি সংঘটিত হয়

ii. ঋতু পরিবর্তন হয়

iii. তাপমাত্রার তারতম্য সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

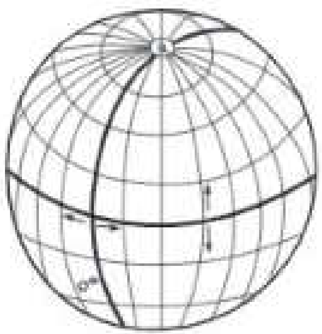

৩। উপরের চিত্রে উল্লম্বভাবে আঁকা রেখাগুলোর মধ্যে 0° দ্বারা চিহ্নিত রেখা কোনটি?

(ক) নিরক্ষরেখা (খ) মেরু রেখা

(গ) মূল মধ্যরেখা (ঘ) কর্কটক্রান্তি রেখা

৪। উক্ত রেখাগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এদের সাহায্যে–

i. স্থানের স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় নির্ণয় করা যায়

ii. কোনো স্থানের সঠিক অবস্থান জানা যায়

iii. সমুদ্রগামী জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

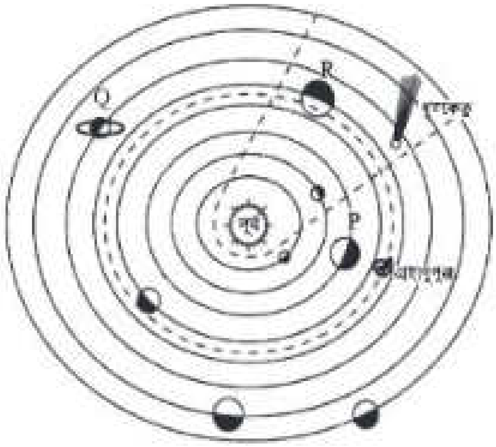

ক. চন্দ্র কী?

খ. নিরক্ষরেখা বলতে কী বোঝায়?

গ. 'P' চিহ্নিত গ্রহটি জীবের জন্য বসবাস উপযোগী কেন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'Q' ও 'R' চিহ্নিত গ্রহ দুটির বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২।

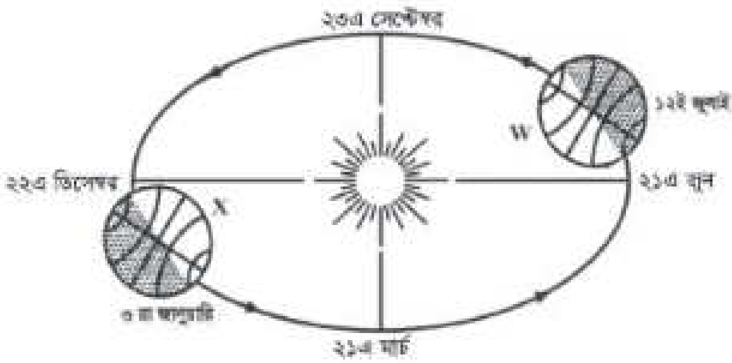

ক. উত্তর গোলার্ধে বড় দিন কোনটি?

খ. অধিবর্ষ বলতে কী বোঝায়?

গ. 'W' অবস্থানে দিনরাত্রির কী ধরনের পরিবর্তন হবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পৃথিবীর পরিক্রমণকালে 'W' এবং 'X' অবস্থানে কি একই ধরনের ঋতু পরিলক্ষিত হয়? বিশ্লেষণ কর।

২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়

মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার

Map Reading and Its Uses

মানচিত্র একজন ভূগোলবিদের জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ (Tools)। এর সাহায্যে সমগ্র পৃথিবী বা কোনো অঞ্চল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। একটি মানচিত্রের মধ্যে আমরা সমগ্র পৃথিবীকে অথবা এর কোনো একটি অঞ্চলকে দেখাতে পারি। আমরা কোনো একটি কাগজের মধ্যে মানচিত্র এঁকে সেখানে চিহ্ন দিয়ে সেই অঞ্চলের অবস্থা সম্বন্ধে বুঝাতে পারি। একটি মানচিত্র যে কেবল ভূগোলবিদদের প্রয়োজন হয় তাই নয়। এটি প্রায় সকল মানুষের বিশেষ করে পর্যটক, প্রশাসক, পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, আবহাওয়াবিদ এমনকি সাধারণ মানুষেরও কাজে লাগে। এ অধ্যায়ে মানচিত্র, এর প্রকারভেদ, গুরুত্ব, ব্যবহার, স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব।

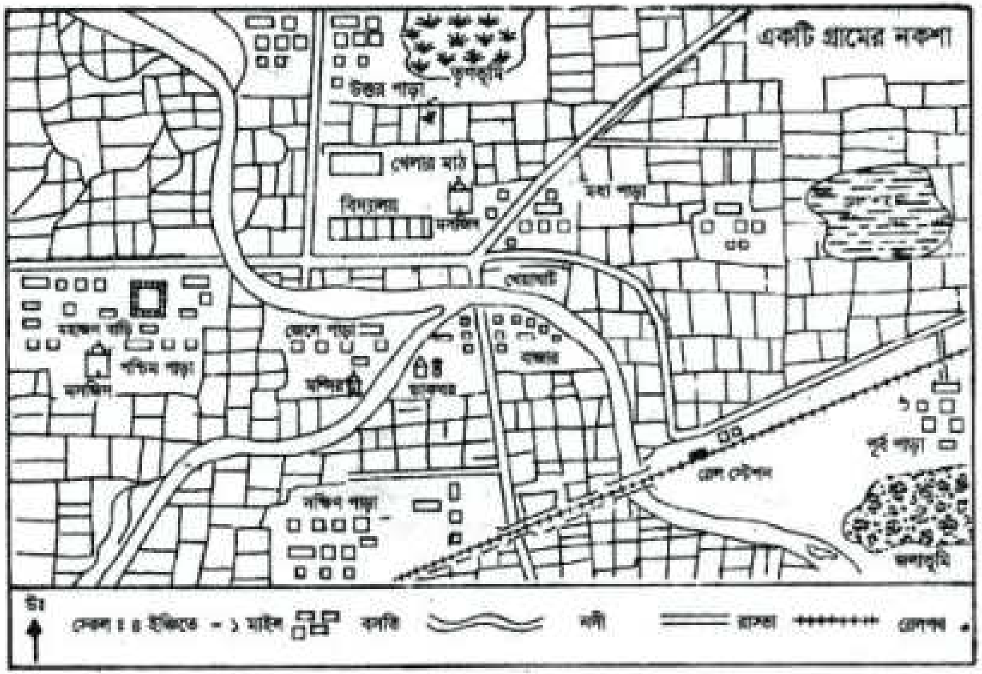

একটি নকশা

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মানচিত্রের ধারণা, গুরুত্ব ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব;
- মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারব;
- স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় বর্ণনা করতে পারব;
- স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস-এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

মানচিত্রের ধারণা, গুরুত্ব ও ব্যবহার (Concept of map, importance and use)

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর। এটি বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র। কাগজের এক পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমা, বাংলাদেশের কোন দিকে কোন দেশ, কোন সাগর ইত্যাদি এঁকে দেখানো হয়েছে। এছাড়া দেখানো হয়েছে বাংলাদেশের আটটি বিভাগ, কোন বিভাগে কতটি জেলা এবং এদের নাম ও সীমানা। একটি মাত্র পৃষ্ঠার মধ্যে সারা বাংলাদেশের প্রশাসনিক সীমানা তুলে ধরা হয়েছে (চিত্র ৩.১)। এভাবে কাগজের এক পৃষ্ঠার মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী, বিভিন্ন মহাদেশ, বিভিন্ন দেশ বা কোনো দেশের বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা এঁকে দেখানো যায়।

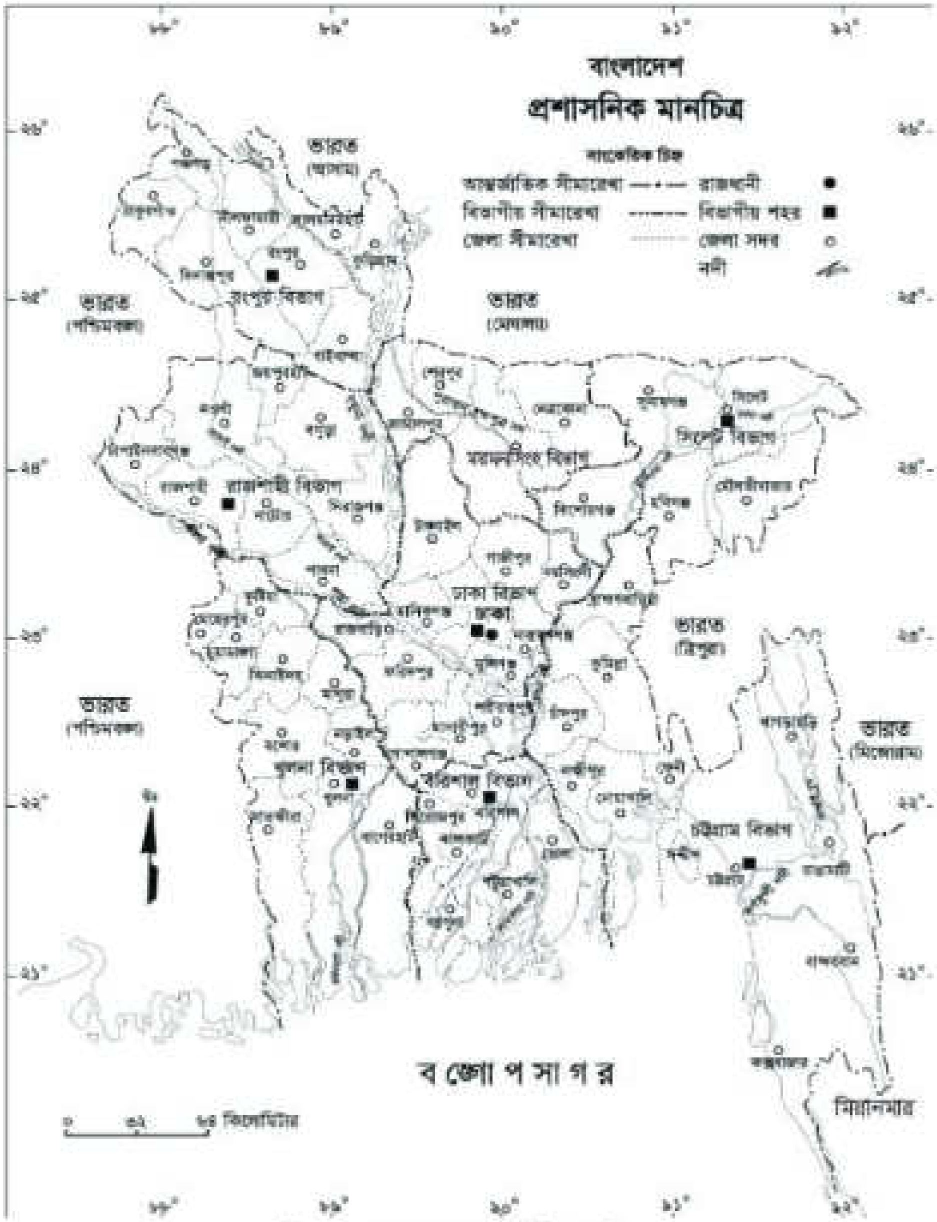

চিত্র ৩.১ : বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র

এই মানচিত্র ছাড়াও তোমরা হয়তো তোমাদের স্কুলে দেয়াল মানচিত্র দেখেছ। তোমাদের ভূগোল ও পরিবেশ বইতে বা কোনো মানচিত্রের বইয়ে (এটলাসে) মানচিত্র দেখে থাকবে। মানচিত্র হলো একটি ড্রয়িং বা রেখাঙ্কন যা ভূপৃষ্ঠের কোনো ছোট বা বৃহৎ অঞ্চলকে উপস্থাপন করে থাকে। মানচিত্র কোনো অঞ্চল বা দেশের ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, উদ্ভিদ, মাটি, পানি ও অনেক কিছু সম্পর্কে ধারণা দেয়। এর সাহায্যে আমরা বিভিন্ন মহাদেশ ও মহাসাগরের অনেক কিছু সম্পর্কে জানতে পারি। মানচিত্রের সাহায্যে একটি ছোট কাগজের মধ্যে অতি নিখুঁতভাবে বিভিন্ন বিষয়ের অবস্থা দেখানো যায়। এখন দেখা যাক মানচিত্র কী?

ইংরেজি 'map' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ মানচিত্র। ল্যাটিন শব্দ 'mappa' থেকে 'map' শব্দটি এসেছে। ল্যাটিন ভাষায় কাপড়ের টুকরাকে 'mappa' বলে। আগেকার দিনে কাপড়ের উপরই map বা মানচিত্র আঁকা হতো। পৃথিবী বা কোনো অঞ্চল বা এর অংশবিশেষকে কোনো সমতল ক্ষেত্রের উপর অঙ্কন করাকে মানচিত্র বলে। মানচিত্র হলো নির্দিষ্ট স্কেলে অক্ষরেখা বা দ্রাঘিমারেখাসহ কোনো সমতল ক্ষেত্রের উপর পৃথিবী বা এর অংশবিশেষের অঙ্কিত প্রতিরূপ। এই সমতল ক্ষেত্র হতে পারে এক টুকরা কাপড় বা কাগজ।

মানচিত্রে স্কেল নির্দেশের পদ্ধতি (Methods of showing scale) : মানচিত্রে তিনটি পদ্ধতিতে স্কেল নির্দেশ করা হয়।

(ক) বর্ণনার সাহায্যে (By statement) : আমরা বর্ণনা বা কথার মাধ্যমে মানচিত্রের স্কেল প্রকাশ করে থাকি। যেমন– ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল, ১৬ ইঞ্চিতে ১ মাইল, ১ সেন্টিমিটারে ১ হেক্টোমিটার। এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম ১ সংখ্যাটি (তা ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার যাই হোক না কেন) মানচিত্রের দূরত্ব এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি (মাইল, গজ, কিলোমিটার বা হেক্টোমিটার যাই হোক না কেন) ভূমির প্রকৃত দূরত্ব প্রকাশ করছে।

(খ) রেখাচিত্রের সাহায্যে (By graphical scale) : কোনো একটি রেখাকে প্রয়োজনীয় ইঞ্চি ও ইঞ্চির ক্ষুদ্র অংশে বা সেন্টিমিটারের ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে প্রতি ভাগের মান লিখে মানচিত্রের স্কেল প্রকাশ করা যায়। যেমন– ১ সেন্টিমিটারে ১০ কিলোমিটার বর্ণনাটিকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হলে প্রথমে ৫ সেন্টিমিটার একটি রেখা নিয়ে একে ৫ ভাগ করতে হবে; এর প্রতিটি ভাগ ১০ কিলোমিটার। বাম পাশে ১টি ঘর ছেড়ে দিয়ে যথাক্রমে ০, ১০, ২০, ৩০, ৪০ লিখে এর পাশে কিলোমিটার লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে আবার ১০ ভাগে ভাগ (কারণ ১০ কিলোমিটারের ক্ষুদ্র ভাগ দেখাতে হবে) করে প্রতিটি ক্ষুদ্র ভাগের মান লিখতে হবে (চিত্র ৩.২ ক)। যেমন–

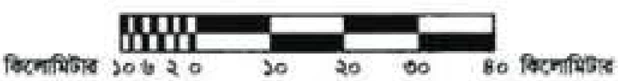

চিত্র ৩.২ (ক) : রৈখিক স্কেল

ইঞ্চি স্কেলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে (চিত্র ৩.২ খ)। এক্ষেত্রে ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রেখা নিয়ে একে প্রথমে তিন ভাগ করতে হবে এবং বাম দিকের একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে প্রতি ঘরের মান লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে হবে। ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল বর্ণনাটিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার সময় প্রথমে ৩ ইঞ্চি একটি রেখা নিয়ে একে তিন ভাগ করতে হবে। বাম দিকের একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে যথাক্রমে ০, ৪, ৮ মাইল লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে আবার ৪ ভাগে (কারণ ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল) ভাগ করতে হবে। শূন্য থেকে বাম দিকে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ মাইল লিখতে হবে। যেমন–

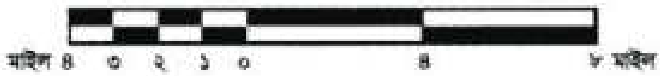

চিত্র ৩.২ (খ) : রৈখিক স্কেল

(গ) প্রতিভূ অনুপাতের সাহায্যে (By representative fraction) : বিভিন্ন দেশের দূরত্ব পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্র একক ব্যবহার করা হয়। এরূপ এক দেশের এককের মাধ্যমে মানচিত্রে স্কেল প্রকাশ হলে ভাষাগত কারণে তা অন্য দেশের লোকের কাছে ব্যবহারযোগ্য হবে না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য প্রতিভূ অনুপাত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ইংরেজিতে একে Representative Fraction বা সংক্ষেপে R.F. এবং বাংলায় সংক্ষেপে প্র.অ. বলে। ভগ্নাংশের আকারে দেওয়া স্কেলটির লব রাশি মানচিত্রের দূরত্ব এবং হর রাশি একই এককে ভূমির দূরত্ব প্রকাশ করে।

উদাহরণস্বরূপ ১ সেন্টিমিটারে ১ মিটার বর্ণনায় প্রকাশিত স্কেলটিকে প্রতিভূ অনুপাতে প্রকাশ করতে হলে মিটারটিকে সেন্টিমিটারে আনতে হবে এবং উভয় সংখ্যার মধ্যে অনুপাত চিহ্ন (:) দিতে হবে। ১ মিটার সমান ১০০ সেন্টিমিটার। সুতরাং লব রাশি ১ এবং হর রাশি ১০০। এক্ষেত্রে স্কেলটি ১:১০০ বা ১/১০০। অর্থাৎ এর অর্থ মানচিত্রের দূরত্ব যখন ১ সেন্টিমিটার তখন ভূমির দূরত্ব ১০০ সেন্টিমিটার।

আবার ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ১:৩৬ প্র.অ. দেওয়া থাকলে বুঝতে হবে মানচিত্রের দূরত্ব যখন ১ ইঞ্চি তখন ভূমির দূরত্ব ৩৬ ইঞ্চি বা ১ গজ। অতএব বর্ণনায় ১ ইঞ্চিতে ১ গজ। বর্ণনায় যখন ১ ইঞ্চিতে ১ মাইল, তখন প্র.অ. ১:৬৩৩৬০ যেহেতু ১ মাইল = ৬৩৩৬০ ইঞ্চি।

একটি বৃহদাকার দেশ ও মহাদেশকে আমরা একটি ছোট বই বা খাতার পৃষ্ঠায় অঙ্কন করে দেখাতে পারি। এছাড়া মানচিত্রটির সঙ্গে ভূমির প্রকৃত দূরত্ব বোঝানোর জন্য স্কেল ব্যবহার করতে পারি। মানচিত্র বললেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে একটি দেশ, একটি অঞ্চল তথা একটি ভূখণ্ডের চিত্র বা একটি মহাদেশ বা সমগ্র পৃথিবী। একটি মানচিত্রের মধ্যে কতকগুলো সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে মহাদেশটিতে কতটি দেশ এবং একেকটি দেশের মধ্যে কতটি প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, রাস্তা, নদ-নদী, হ্রদ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেখাতে পারি। এভাবে একটি দেশ ও মহাদেশের মধ্যে আমরা চাইলে ছোট একটি স্থানকেও সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারি। সর্বোপরি বলা যায়, কোনো স্থানের অবস্থান থেকে শুরু করে ঐ স্থানের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য মানচিত্রের কোনো বিকল্প নেই। সুতরাং, বলা যায় খুব কম সময়ে সহজ উপায়ে ঘরে বসে সারা বিশ্বকে জানার জন্যই মানচিত্রের উৎপত্তি। একটি মানচিত্রের মধ্যে কী ধরনের তথ্য থাকবে তা নির্ভর করবে– (ক) স্কেল, (খ) অভিক্ষেপ, (গ) কনভেনশনাল সাইন, (ঘ) মানচিত্র অঙ্কনকারীর দক্ষতা এবং (ঙ) মানচিত্র অঙ্কনের ধরনের উপর। একটি বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রের মধ্যে একটি স্থানকে বেশি তথ্য দিয়ে দেখানো যায়।

মানচিত্র অঙ্কন করার জন্য কিছু বিষয় জানতে হয়। মানচিত্র বিভিন্ন রকমের হয়। প্রতি মানচিত্রেই বিভিন্ন বিষয় থাকে। এগুলো বিভিন্ন রং, রেখা ও সংকেত দিয়ে বোঝানো হয়। এই রং, রেখা ও সংকেত হলো মানচিত্রের ভাষা। মানচিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এসব ভাষা সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি।

আধুনিক সভ্যতায় মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ইতিহাসবিদ, প্রকৌশলী, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, সৈনিক ও নাবিকদের নিকট মানচিত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভূগোলবিদ ও ভূগোলের শিক্ষার্থীদের নিকট মানচিত্র একটি অপরিহার্য উপাদান।

মানচিত্রের প্রকারভেদ (Classification of maps)

মানচিত্র অনেক প্রকার হতে পারে। সাধারণত মানচিত্রে ব্যবহৃত স্কেল এবং বিষয়বস্তু অনুসারে মানচিত্রগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্কেল অনুসারে মানচিত্র আবার দুই প্রকারের– (ক) বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র এবং (খ) ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র। নৌচলাচল সংক্রান্ত নাবিকদের চার্ট, বিমানচলাচল সংক্রান্ত বৈমানিকদের চার্ট, মৌজা মানচিত্র বা ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র প্রভৃতি বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র। একটি ছোট এলাকা অনেক বড় করে দেখানো হয় বলে মানচিত্রের মধ্যে অনেক জায়গা থাকে এবং অনেক তথ্য এরূপ মানচিত্রে ভালোভাবে দেখানো যায়। ভূচিত্রাবলি মানচিত্র, দেয়াল মানচিত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র। সমগ্র পৃথিবী বা মহাদেশ বা দেশের মতো বড় অঞ্চলকে একটি ছোট কাগজে দেখানো হয় বলে এ প্রকার মানচিত্রে বেশি জায়গা থাকে না। ফলে এ মানচিত্রে বেশি কিছু দেখানো যায় না।

উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হিসেবেও মানচিত্রগুলো দুই প্রকারের– (ক) গুণগত মানচিত্র এবং (খ) পরিমাণগত মানচিত্র।

(ক) গুণগত মানচিত্র : ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র, ভূসংস্থানিক মানচিত্র, ভূমিরূপের মানচিত্র, মৃত্তিকা মানচিত্র, দেয়াল মানচিত্র, ভূচিত্রাবলি মানচিত্র, স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র এবং মৌজা মানচিত্র গুণগত মানচিত্রের অন্তর্গত।

(খ) পরিমাণগত মানচিত্র : বায়ুর উত্তাপ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জনসংখ্যার বণ্টন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, খনিজ উৎপাদন, বনজ উৎপাদন, শিল্পজ উৎপাদন প্রভৃতি পরিসংখ্যান তথ্য যেসব মানচিত্রে দেখানো হয়, সেসব মানচিত্র পরিমাণগত মানচিত্রের অন্তর্গত।

কার্যের উপর ভিত্তি করে কয়েক প্রকার মানচিত্র নিম্নরূপ :

১। ক্যাডাস্ট্রাল বা মৌজা মানচিত্র (Cadastral or Mouza map) : ক্যাডাস্ট্রাল শব্দটি এসেছে ফ্রেঞ্চ শব্দ ক্যাডাস্ট্রে (Cadastre) থেকে, যার অর্থ হচ্ছে রেজিস্ট্রিকৃত নিজের সম্পত্তি। এই মানচিত্র তৈরি করা হয় সাধারণত কোনো রেজিস্ট্রিকৃত ভূমি অথবা বিল্ডিং-এর মালিকানার সীমানা চিহ্নিত করার জন্য। আমাদের দেশে আমরা যে মৌজা মানচিত্রগুলো দেখতে পাই সেগুলো আসলে ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র। এই মানচিত্রের মাধ্যমেই হিসাব করে সরকার ভূমির মালিক থেকে কর নিয়ে থাকে। এই মানচিত্রের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে আমাদের গ্রামের মানচিত্রগুলো (চিত্র ৩.৩)।

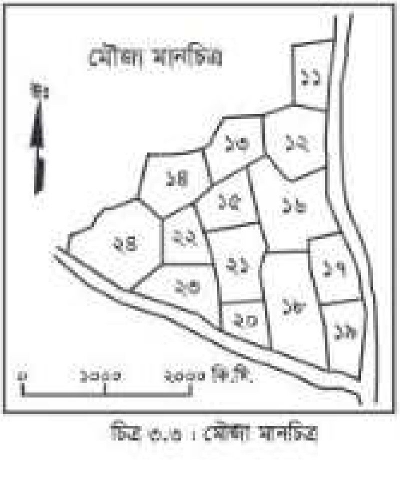

চিত্র ৩.৩ : মৌজা মানচিত্র

এই মানচিত্রে নিখুঁতভাবে সীমানা দেওয়া থাকে। এই মানচিত্রগুলো বৃহৎ স্কেলে অঙ্কন করা হয়, যা ১৬ ইঞ্চিতে ১ মাইল বা ৩২ ইঞ্চিতে

২০২৫

১ মাইল। এই ধরনের মানচিত্রের মধ্যে বিবিধ তথ্য প্রকাশ করা হয়। শহরের পরিকল্পনার মানচিত্রও এই মৌজা মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

২। **ভূসংস্থানিক মানচিত্র (Topographic map) :** ভূসংস্থানিক- এর আরেক নাম হচ্ছে স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র। এই মানচিত্রগুলো প্রকৃত জরিপকার্যের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত এর মধ্যে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক দুই ধরনের উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের মানচিত্রের স্কেল একেবারে ছোট না হলেও মৌজা মানচিত্রের মতো বৃহৎ নয়। এই মানচিত্রগুলোতে জমির সীমানা দেখানো হয় না। ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে পাহাড়, মালভূমি, সমভূমি, নদী, উপত্যকা, হ্রদ প্রভৃতি দেখানো হয়। অন্যদিকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হিসেবে রেলপথ, হাটবাজার, পোস্ট অফিস, সরকারি অফিস, খেলার মাঠ, মসজিদ, মন্দির প্রভৃতি নিখুঁতভাবে দেখানো হয় (চিত্র ৩.৪)। বর্তমান যুগে বিমান থেকে ছবি তোলার মাধ্যমে এই মানচিত্রের নবযুগের সূচনা হয়। এই মানচিত্রের স্কেল ১:২০,০০০ হলে ভালোভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পায়।

বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন স্কেলে এই মানচিত্র তৈরি করে। সবচেয়ে আদর্শ ও জনপ্রিয় হচ্ছে ব্রিটিশদের তৈরি করা মানচিত্র যার স্কেল ছিল ১:২৫,০০০ থেকে ১:১০০,০০০ এবং আমেরিকাতে এই মানচিত্রের স্কেল থাকে সাধারণত ১:৬২,৫০০ এবং ১:১২৫,০০০। বাংলাদেশ সাধারণত ব্রিটিশ স্কেলটি অনুসরণ করে।

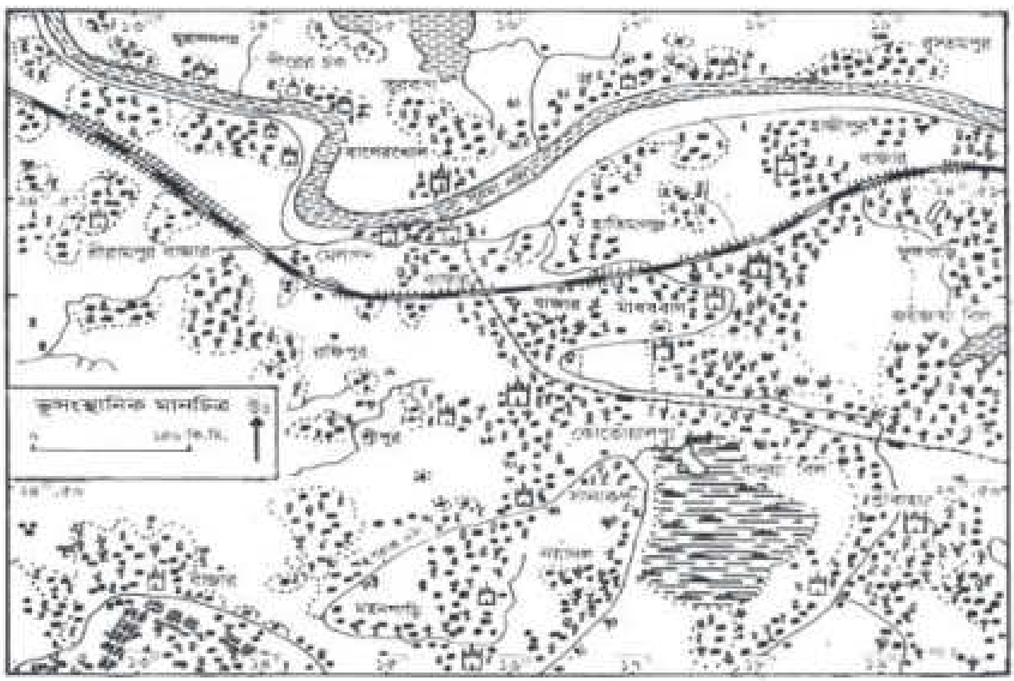

চিত্র ৩.৪ : ভূসংস্থানিক মানচিত্র

৩। দেয়াল মানচিত্র (Wall map) : দেয়াল মানচিত্র তৈরি করা হয় সাধারণত শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করার জন্য। সারা বিশ্বকে অথবা কোনো গোলার্ধকে এই মানচিত্রের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। দেয়াল মানচিত্রে আমাদের চাহিদা মতো একটি দেশ অথবা একেকটি মহাদেশকে আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয় বড় অথবা ছোট স্কেলে (চিত্র ৩.৫)। এই দেয়াল মানচিত্রের স্কেল ভূসংস্থানিক মানচিত্রের চেয়ে ছোট কিন্তু ভূচিত্রাবলি মানচিত্রের চেয়ে বড়।

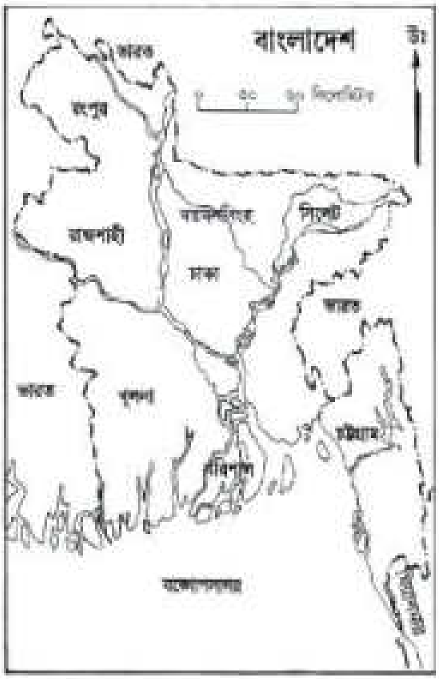

চিত্র ৩.৫ : দেয়াল মানচিত্র

৪। ভূচিত্রাবলি বা এটলাস মানচিত্র (Chorographical or Atlas map) : মানচিত্রের সমষ্টিকে ভূচিত্রাবলি (এটলাস) বলে। এই মানচিত্রকে সাধারণত খুব ছোট স্কেলে করা হয়। এটি প্রাকৃতিক, জলবায়ুগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে তৈরি করা হয়। বেশিরভাগ ভূচিত্রাবলি মানচিত্রে স্থানের অভাবে রং দিয়ে বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয়। শুধু পাহাড়ের চূড়া, গুরুত্বপূর্ণ নদী এবং রেলওয়ের প্রধান রাস্তা বোঝানোর জন্য প্রতীক দেওয়া থাকে। কিছু কিছু ভূচিত্রাবলি করা হয় ১:১০০০,০০০ স্কেলে। আমাদের দেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই মানচিত্র তৈরি করে থাকে। এই মানচিত্রে সমগ্র পৃথিবীকে একটি পৃষ্ঠার মধ্যে দেখিয়ে থাকে। ঐ একটি পৃষ্ঠার মধ্যে বাংলাদেশের জেলাগুলোও দেখিয়ে থাকে। এতে প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও কৃষিভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানচিত্র তৈরি করা হয়।

৫। প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical map) : যে মানচিত্রে কোনো দেশ বা অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভূমিরূপ যেমন–পর্বত, মালভূমি, মরুভূমি, নদী, হ্রদ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য থাকে তাকে প্রাকৃতিক মানচিত্র বলে।

৬। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র (Geological map) : ভূত্বক গঠনকারী শিলাসমূহের অবস্থান ও গঠনের উপর ভিত্তি করে এই ধরনের মানচিত্র তৈরি করা হয়।

৭। জলবায়ুগত মানচিত্র (Climatic map) : বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে জলবায়ুগত মানচিত্র বলে।

৮। উদ্ভিজ্জ মানচিত্র (Vegetation map) : বিশ্বের কোথায় কোন ধরনের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ আছে তার উপর ভিত্তি করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয়, তাকে উদ্ভিজ্জ মানচিত্র বলে।

৯। মৃত্তিকা বিষয়ক মানচিত্র (Soil map) : বিশ্বের কোথায় কোন ধরনের মাটি তার উপর ভিত্তি করে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়। সাধারণত মাটির গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে বিশ্বের কোথায় কোন ধরনের ফসলের চাষ করা যাবে, তা বোঝাতে কৃষিবিদরা এই ধরনের মানচিত্র বেশি ব্যবহার করে থাকেন।

১০। **সাংস্কৃতিক মানচিত্র (Cultural map)** : বিভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের সীমা, ঐতিহাসিক কোনো স্থান বা স্থাপত্য, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে যে মানচিত্র তৈরি হয় তাকে সাংস্কৃতিক মানচিত্র বলে।

আবার সাংস্কৃতিক মানচিত্রকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন–

(ক) রাজনৈতিক মানচিত্র (Political map) : বিভিন্ন দেশ ও রাষ্ট্রের সীমা দেখিয়ে এই মানচিত্র তৈরি করা হয়। এর মধ্যে কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের রাজধানী ও গুরুত্বপূর্ণ শহরও দেখানো হয়।

(খ) বণ্টন মানচিত্র (Distribution map) : যেসব মানচিত্রে জনসংখ্যা, শস্য, জীবজন্তু, শিল্প ইত্যাদির বণ্টন কোনো একটি অঞ্চল বা দেশে দেখানো হয় তাকে বণ্টন মানচিত্র বলে।

(গ) ঐতিহাসিক মানচিত্র (Historical map) : ঐতিহাসিক কোনো স্থান বা স্থাপত্যকে নিয়ে যেসব মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে ঐতিহাসিক মানচিত্র বলে।

(ঘ) সামাজিক মানচিত্র (Social map) : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে মানচিত্রগুলো তৈরি করা হয়। বিশেষ করে যারা সামাজিক প্রথা ও বৈষম্য, জনসংখ্যা এসব নিয়ে গবেষণা করেন তারা এ মানচিত্র ব্যবহার করেন।

(ঙ) ভূমি ব্যবহার মানচিত্র (Land use map) : কোন ভূমি কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বা কোন ভূমি কোন কাজে ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশি উপযোগী তার উপর ভিত্তি করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয় তাকে ভূমি ব্যবহার মানচিত্র বলে।

মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের নিয়মাবলি (Techniques of presenting information in a map)

স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র গঠন ভূগোল শাস্ত্রের একটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এই বিশাল পৃথিবীকে অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সামাজিক রূপ এই ধরনের মানচিত্রের মধ্যে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, অন্য কোনো উপায়েই তা সম্ভব নয়। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ভূপ্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রতীকগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, মালভূমি, হ্রদ, সমভূমি, পুকুর, ঝিল, বনভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অন্যদিকে রাস্তাঘাট, হাটবাজার, মসজিদ, মন্দির, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, জনবসতি, মানুষের ঘনত্ব, জীবিকা অর্জনের উপায় প্রভৃতি নানা সাংস্কৃতিক তথ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই কারণে কোনো একটি অঞ্চলের সুবিধা-অসুবিধা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং নানা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে চাইলে এই মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের নিয়মাবলি জানা একান্ত প্রয়োজন। যে কোনো ভাষায় একটি মানচিত্র পাঠ করতে হলে নানা ধরনের প্রতীক চিহ্নের সাহায্য নিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের মধ্যে এ সকল প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে আসছে। এই কারণে এসব চিহ্নকে আন্তর্জাতিক প্রচলিত প্রতীক চিহ্ন বলে (চিত্র ৩.৬)। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র

পাঠ করার জন্য এই প্রতীক চিহ্নগুলো অত্যন্ত জরুরি বলে মানচিত্রের নিচের দিকে এই প্রতীক চিহ্নগুলোর সূচক (Legend) দেওয়া থাকে। যে ব্যক্তির এই চিহ্নগুলো সম্বন্ধে যত ভালো ধারণা থাকবে, তিনি তত ভালোভাবে এই মানচিত্র পাঠ করতে পারবেন।

মানচিত্রে প্রচলিত প্রতীক চিহ্নসমূহ (International conventional sign used in map)

চিত্র ৩.৬ : আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন

একটি মানচিত্রে তথ্য উপস্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো :

- **শিরোনাম (Title/Heading) :** প্রত্যেক মানচিত্রেরই একটি শিরোনাম থাকে। এটি কোনো দেশের বা কোনো অঞ্চলের কিসের মানচিত্র এতে তা উল্লেখ থাকে। যেমন– বাংলাদেশের রাজনৈতিক মানচিত্র। প্রতিটি মানচিত্র তৈরির সময় এতে একটি শিরোনাম দিতে হবে।

- **স্কেল (Scale)** : কোনো অঞ্চলের মানচিত্র তৈরির সময় এর আয়তনকে কমিয়ে ক্ষুদ্র করে আঁকতে হয়। একে স্কেল অনুসারে আঁকা বলে। স্কেল থেকে বোঝা যায় কোন আয়তনকে কতটুকু কমানো হয়েছে। স্কেল যত ছোট হবে মানচিত্রে তত বেশি আয়তন দেখানো যাবে। মানচিত্রে যদি ১:১০০,০০০ লেখা থাকে তাহলে বুঝতে হবে মানচিত্রে ১ একক ভূমির ১০০,০০০ এককের সমান। আবার স্কেল এঁকে দেখানো হয় যেমন– মানচিত্রে এক ইঞ্চি সমান ভূমিতে কত মাইল বা এক সেন্টিমিটার সমান কত কিলোমিটার।
- **উত্তর দিক (North Line)** : মানচিত্রের দিক জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানচিত্রের উপরের দিকে বাম দিকের মার্জিনে একটি তীর দেওয়া থাকে। এই তীরের মাথায় উ. লেখা থাকে। উ. দিয়ে উত্তর দিক বোঝানো হয়। একটি দিক জানা থাকলে আমরা সহজেই অন্য দিকগুলো যেমন– দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বের করতে পারি। মানচিত্র তৈরির সময় দিকনির্দেশনা দিতে হবে। মানচিত্রে দিক না দেখানো থাকলে উপরের দিককে উত্তর দিক বুঝতে হবে। মানচিত্রে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ স্পষ্ট করে দেখানো থাকলে উত্তর দিক না থাকলেও সকল দিক বোঝা যায়। তাই অনেক সময় এক্ষেত্রে উত্তর দিক দেখানো হয় না।
- **সূচক (Legend)** : মানচিত্রে কোন প্রতীক দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে সূচক তা নির্দেশ করে। প্রতিটি মানচিত্রেই প্রতীক ও এদের সূচক উল্লেখ করতে হবে।
- **তথ্য-উপাত্ত (Source of Data)** : সব মানচিত্র তথ্য বা উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি হয়। এজন্য তথ্যের উৎস মার্জিন বা মার্জিনের বাইরে দেওয়া প্রয়োজন।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় (Local Time and Standard Time)

আমাদের পৃথিবীকে ৩৬০° দ্রাঘিমারেখা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। এই ৩৬০° কে আবার মূল মধ্যরেখা থেকে দুই দিকে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ১৮০° করে ভাগ করা হয়েছে। এই ৩৬০° দ্রাঘিমা পুরোটাই আসলে কাল্পনিক। আমরা জানি পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার পুরোটি ঘুরে আসছে। হিসাব করলে দেখা যাবে ৩৬০° ঘুরে আসতে সময় লাগছে ২৪ ঘন্টা অর্থাৎ ২৪ × ৬০ = ১৪৪০ মিনিট। এই ১৪৪০ মিনিটকে ৩৬০° দিয়ে ভাগ করলে (১৪৪০ ÷ ৩৬০) = ৪ মিনিট। অর্থাৎ প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময় লাগছে ৪ মিনিট।

স্থানীয় সময় (Local Time)

পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। পৃথিবীর যে অংশটি পূর্ব দিকে সেই অংশটিতে আগে সূর্যোদয় বা সকাল হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো একটি স্থানে সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে তখন ঐ স্থানে মধ্যাহ্ন। ঐ স্থানের ঘড়িতে তখন দুপুর ১২টা ধরা হয়। এই মধ্যাহ্ন থেকেই দিনের অন্যান্য

সময়গুলো ঠিক করা হয়। আকাশে সূর্যের অবস্থান থেকে যে সময় স্থির করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে। ঐ স্থান থেকে যত দূরের স্থান হবে সে হিসেবে প্রতি ১° দ্রাঘিমার জন্য সময় বাড়বে বা কমবে। স্থানটি যদি সেই স্থানের পশ্চিমের দিকের স্থান হয় তবে এর ১° ব্যবধানের জন্য ৪ মিনিট কম হবে। স্থানটি পূর্ব দিকের হলে ১° ব্যবধানের জন্য ৪ মিনিট বেশি হবে। অর্থাৎ পূর্ব দিকের স্থানের সময় নির্ণয়ের জন্য ঐ স্থানের সময়ের সঙ্গে প্রতি ডিগ্রি ব্যবধানের জন্য ৪ মিনিট যোগ করতে হবে। কারণ সেই স্থানটি যেহেতু পূর্বে অবস্থিত তাই সেখানে আগেই মধ্যাহ্ন হয়েছে অর্থাৎ ১২টা বেজেছে।

প্রমাণ সময় (Standard Time)

দ্রাঘিমারেখার উপর সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে আমরা সময় ঠিক করি। এভাবে মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থানকে সেই স্থানের দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করলে সাধারণত একটি বড় দেশের মধ্যে সময়ের গণনায় বিভ্রাট হয়। এই সময়ের বিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক দেশে একটি প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত কোনো একটি দেশের মধ্যভাগের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ধারণ করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় ধরা হয়।

দেশের আয়তনের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ সময় একাধিক হতে পারে। আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রে ৪টি এবং কানাডাতে ৬টি প্রমাণ সময় রয়েছে। সেসব দেশগুলোর প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য তারা একাধিক প্রমাণ সময় ব্যবহার করছে। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের অদূরে অবস্থিত গ্রিনিচের (০° দ্রাঘিমায়) স্থানীয় সময়কে সমগ্র পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের পূর্ব দিকে অবস্থিত, তাই আমাদের দেশে প্রমাণ সময় গ্রিনিচের সময়ের অগ্রবর্তী অর্থাৎ আমাদের এখানে গ্রিনিচের মধ্যাহ্নের পূর্বেই মধ্যাহ্ন হয়ে থাকে। গ্রিনিচের দ্রাঘিমা ০° অন্যদিকে আমাদের বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করেছে। আর আমরা জানি প্রতি ১ ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। তাই ৯০°-এর জন্য সময়ের পার্থক্য হবে ৯০ × ৪ = ৩৬০ মিনিট বা ৬ ঘণ্টা। ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ধরে কাজ করা হয়। আমাদের এখানে যখন দুপুর ১২টা তখন যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে সকাল ৬টা বাজে।

স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য (Time difference on the basis of location)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৪ মিনিট। আমরা জানি যে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। এজন্যই পূর্ব দিকের স্থানগুলোতে আগে দিন হচ্ছে এবং পশ্চিম দিকের স্থানগুলোতে পরে দিন হচ্ছে। এতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশ পূর্ব দিকে অবস্থিত, সেসব দেশে আগে সকাল হবে এবং আমাদের পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে পরে সকাল হবে।

আমরা জানি প্রতি ডিগ্রি দূরত্বের জন্য সময়ের ব্যবধান হচ্ছে ৪ মিনিট। এই প্রতিটি ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয় এবং প্রতি ১ মিনিট দূরত্বের জন্য ৪ সেকেন্ড সময়ের পার্থক্য হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করতে হবে দূরত্বের ব্যবধানের মিনিটকে অনেকে সময়ের মিনিট হিসেবে ধরে ভুল করে। আসলে দূরত্বের মিনিটের ক্ষেত্রে ১ ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয়। এই দূরত্বের ৬০ মিনিটের প্রতি মিনিটের জন্য সময়ের ৪ সেকেন্ড লাগে। এভাবে দূরত্বের ব্যবধানের ৬০ মিনিটের জন্য লাগে ৬০ × ৪ = ২৪০ সেকেন্ড অর্থাৎ ৪ মিনিট সময়।

স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝতে হলে কিছু গাণিতিক সমাধান করতে হবে।

উদাহরণ ১ : ঢাকা থেকে পূর্বে অবস্থিত একটি স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য ৫০°৩০′। ঢাকায় যখন ভোর ৬টা তখন সেই স্থানের স্থানীয় সময় কত?

সমাধান

ঢাকা থেকে স্থানটির ব্যবধান = ৫০°৩০′

= (৫০×৪) মিনিট + (৩০×৪) সেকেন্ড (পূর্ব দ্রাঘিমায় এই ব্যবধানের জন্য সময়ের পার্থক্য যোগ হবে)

= ২০০ মিনিট + ১২০ সেকেন্ড

= ২০০ মিনিট + ২ মিনিট [যেহেতু ১ মিনিট = ৬০ সেকেন্ড]

= ২০২ মিনিট

সময়ের ব্যবধান হবে ২০২ মিনিট বা ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট

এখানে যে স্থানটির স্থানীয় সময় নির্ণয় করতে হবে সেটা ঢাকার পূর্ব দিকে অবস্থিত। সুতরাং স্থানীয় সময় ঢাকার সময়ের চেয়ে বেশি হবে কারণ পূর্ব দিকে সূর্য আগে উদিত হয়েছে। তাই ঢাকার সময়ের সঙ্গে ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট যোগ করতে হবে।

∴ স্থানটির সময়

= ঢাকার সময় + সময়ের পার্থক্য

= ৬টা + ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট

= ৯টা ২২ মিনিট

∴ স্থানটির নির্ণেয় স্থানীয় সময় ৯টা ২২ মিনিট।

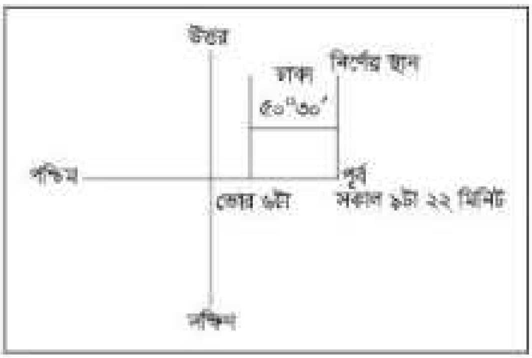

উত্তর : সকাল ৯টা ২২ মিনিট।

উদাহরণ ২ : ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০° পূর্ব এবং রিয়াদের দ্রাঘিমা ৪৫° পূর্ব। ঢাকার স্থানীয় সময় দুপুর ২টা হলে সেই সময় রিয়াদের স্থানীয় সময় কত?

সমাধান

আমরা জানি, প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট

ঢাকা ও রিয়াদের দ্রাঘিমার পার্থক্য ৯০°– ৪৫° = ৪৫°

সময়ের পার্থক্য হবে ৪৫ × ৪ = ১৮০ মিনিট অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা

প্রশ্নে উল্লিখিত ৪৫° পূর্ব দ্রাঘিমা দেখে আমরা বুঝতে পারি, রিয়াদ ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত। তাই ঢাকার স্থানীয় সময় থেকে এই ৩ ঘণ্টা বাদ যাবে।

∴ রিয়াদের স্থানীয় সময় হবে

= দুপুর ২টা – ৩ ঘণ্টা [এখানে দুপুর ২টা বলতে ১৪টা হবে।]

= ১৪টা – ৩ ঘণ্টা

= ১১টা

উত্তর : রিয়াদের স্থানীয় সময় হবে সকাল ১১টা।

উদাহরণ ৩ : 'ক' শহরের দ্রাঘিমা ৭০°৪৫′ পূর্ব এবং 'খ' শহরের দ্রাঘিমা ১৫°১৫′ পূর্ব। 'ক' শহরের স্থানীয় সময় সকাল ৭টা হলে 'খ' শহরের স্থানীয় সময় কত?

সমাধান

দুটি শহরের দ্রাঘিমার পার্থক্য = ৭০°৪৫′ – ১৫°১৫′

= ৫৫°৩০′

আমরা জানি, প্রতি ১° -এর জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট এবং প্রতি ১′ -এর জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ সেকেন্ড
সুতরাং, ৫৫°৩০′ -এর জন্য সময়ের পার্থক্য হবে

= (৫৫ × ৪) মিনিট + (৩০ × ৪) সেকেন্ড

= ২২০ মিনিট + ১২০ সেকেন্ড

= ২২০ মিনিট + ২ মিনিট [যেহেতু ১ মিনিট = ৬০ সেকেন্ড]

= ২২২ মিনিট = ৩ ঘণ্টা ৪২ মিনিট

যেহেতু 'ক' শহরের দ্রাঘিমা থেকে 'খ' শহরের দ্রাঘিমার মান কম সেহেতু আমরা বুঝতে পারি 'খ' শহরটি 'ক' শহরের পশ্চিমে অবস্থিত। তাই 'ক' শহরের স্থানীয় সময় থেকে সময়ের ব্যবধান বিয়োগ করলে 'খ' শহরের স্থানীয় সময় পাওয়া যাবে। সুতরাং, সময় হবে–

'খ' স্থানের স্থানীয় সময়

= সকাল ৭টা – ৩ ঘণ্টা ৪২ মিনিট

= ৩টা ১৮ মিনিট অর্থাৎ ভোর ৩টা ১৮ মিনিট

উত্তর : 'খ' শহরের স্থানীয় সময় ভোর ৩টা ১৮ মিনিট।

উদাহরণ ৪ : ঢাকা ও টোকিওর স্থানীয় সময়ের ব্যবধান ৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ১৬ সেকেন্ড। ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০°২৬′ পূর্ব হলে টোকিওর দ্রাঘিমা কত?

সমাধান

ঢাকা ও টোকিওর সময়ের ব্যবধান ৩ ঘণ্টা ১৭ মিনিট ১৬ সেকেন্ড

= (১৮০ +১৭) মিনিট ১৬ সেকেন্ড = ১৯৭ মিনিট ১৬ সেকেন্ড

প্রতি ৪ মিনিটে ১° এবং প্রতি ৪ সেকেন্ডে ১ মিনিট সময়ের পার্থক্য হিসাব করে পাওয়া যায়,

১৯৬ মিনিট-এর জন্য ৪৯° এবং বাকি ১ মিনিট ১৬ সেকেন্ড-এর জন্য ১৯′ অর্থাৎ ৪৯°১৯′।

সুতরাং টোকিও ঢাকার পূর্বে বলে এর দ্রাঘিমা হবে = ৯০°২৬′ + ৪৯°১৯′= ১৩৯°৪৫′ পূর্ব।

উত্তর : ১৩৯°৪৫′ পূর্ব।

মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস (GPS and GIS in Maps)

বর্তমানে মানচিত্র তৈরি, পঠন এবং ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে আধুনিক ব্যবহার হচ্ছে জিপিএস এবং জিআইএস। জিপিএস-এর ইংরেজি হলো Global Positioning System (GPS)। কোনো একটি স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান জানতে চাইলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে জিপিএস-এর মাধ্যমে জানা।

জিপিএস দ্বারা যেসব কাজ করা যায় তা হলো :

জিপিএস দ্বারা কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা ও দূরত্ব জানা যায়। এছাড়া ঐ স্থানের উত্তর দিক, তারিখ ও সময় জানা যায়।

চিত্র ৩.৭ : জিপিএস

জিপিএস-এর কার্যনীতি (Working Principle of GPS)

জিপিএস তার রিসিভার দিয়ে ভূ-উপগ্রহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে (চিত্র ৩.৭)। এই তথ্য সংগ্রহের জন্য জিপিএস-এর মোটামুটি মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশের প্রয়োজন হয়। তখন জিপিএস যন্ত্রটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। কোনো কোনো সময় উঁচু খাড়া পাহাড়, উঁচু ইমারত থাকলে তখন জিপিএস দ্বারা সেই স্থানের অবস্থান নির্ণয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এতে সময় বেশি লাগে।

জিপিএস-এর সুবিধা : প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কারের মধ্যে ভূগোলবিদদের জন্য জিপিএস একটি অত্যন্ত মূল্যবান যন্ত্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। এ যন্ত্রের সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে আমরা কোনো একটি স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ থেকে শুরু করে সব বিষয়ে জানতে পারছি। বিশেষ করে আমাদের দেশে ভূমির জরিপের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হয়। এখন আমরা জিপিএস-এর মাধ্যমে ঝামেলা ছাড়াই জমির সীমানা চিহ্নিত করতে পারব।

২০২৫

এতে করে সময় অনেক কম অপচয় হবে। যে কোনো দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা এই জিপিএস-এর মাধ্যমে কোনো একটি স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ জানতে পেরে তার সঠিক অবস্থান জেনে সেখানে সাহায্য পাঠাতে পারব।

জিপিএস-এর অসুবিধা : জিপিএস-এর সুবিধার পাশাপাশি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। তা হলো– এর মূল্য বেশি তাই সহজলভ্য নয়। বেশিরভাগ জনগণ এর সঙ্গে পরিচিত নয়, বেশিরভাগ লোক এটি চালাতে পারে না। এছাড়া রয়েছে সনাতনী পদ্ধতি না ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা।

জিআইএস (Geographical Information System)

ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে জিআইএস বলে। এটি একটি কম্পিউটার হিসাবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে ভৌগোলিক তথ্যগুলোর সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানিক ও পারস্পরিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, মানচিত্রায়ণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। ১৯৬৪ সালে কানাডায় সর্বপ্রথম এই কৌশলের ব্যবহার আরম্ভ হয়। ১৯৮০ সালের দিক থেকে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন, পানি গবেষণা, আঞ্চলিক গবেষণা, নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা, জনসংখ্যা বিশ্লেষণ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ প্রভৃতি বহুবিধ কাজে জিআইএস ব্যবহার হচ্ছে।

জিআইএস-এর মাধ্যমে একটি মানচিত্রের মধ্যে অনেক ধরনের উপাত্ত উপস্থাপন করে সেই উপাত্তগুলোকে মানচিত্রের মধ্যে বিশ্লেষণ করে মানচিত্রটির উপযোগিতা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যেমন– একটা মানচিত্রের মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা, টপোগ্রাফি, ভূমি ব্যবহার, যোগাযোগ, মৃত্তিকা ও রাস্তা এই সবগুলো জিনিস দেখিয়ে আমরা তার মধ্য দিয়ে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের পুরো চিত্র সম্বন্ধে জানতে পারি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দেয়াল মানচিত্র কোথায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়?

(ক) শ্রেণিকক্ষ (খ) মাঠ

(গ) পর্বত (ঘ) জলবায়ু

২। মূল মধ্যরেখা থেকে ৫° পূর্ব দিকে সরে গেলে সময়ের ব্যবধান কত মিনিট হবে?

(ক) ১৬ (খ) ২০

(গ) ২৪ (ঘ) ২৮

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমন যে গ্রামে বসবাস করে সেখানে সমভূমি ও নিম্নভূমি উভয়ই রয়েছে। মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার অধ্যায় পাঠ শেষে সে তার গ্রামের একটি মানচিত্র অঙ্কন করল।

৩। সুমনের গ্রামের মানচিত্রটি কোন ধরনের মানচিত্র?

(ক) এটলাস (খ) প্রাকৃতিক

(গ) সাংস্কৃতিক (ঘ) ক্যাডাস্ট্রাল

৪। সুমনের গ্রামের মানচিত্রে ভূমির জন্য কোন রং ব্যবহার করা হবে?

(ক) নীল (খ) সাদা

(গ) সবুজ (ঘ) বাদামি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ফ্লোরা বেগম শুক্রবার সকাল ৯টায় ঢাকা থেকে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দিলেন। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে নামার পর তিনি দেখলেন বিমানবন্দরের ঘড়িতে সন্ধ্যা ৬টা। কিন্তু নিজের ঘড়িতে তখন রাত ১২টা।

ক. স্থানীয় সময় কাকে বলে?

খ. প্রমাণ সময় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. ফ্লোরা বেগমের দেখা শহরটির দ্রাঘিমা 0° হলে ঢাকার দ্রাঘিমা কত? নির্ণয় কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্থানের সময়ের সঙ্গে ঢাকার সময়ের তারতম্য হওয়ার কারণ– বিশ্লেষণ কর।

২।

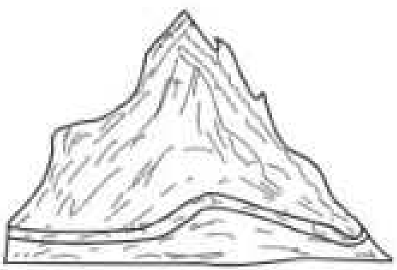

চিত্র ১

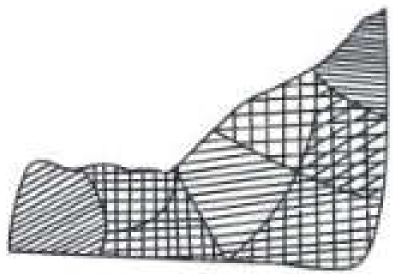

চিত্র ২

ক. জিআইএস-এর পূর্ণ রূপ কী?

খ. প্রতিভূ অনুপাত বলতে কী বোঝায়?

গ. উপরের ১ নম্বর চিত্রটি কোন মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আমাদের জীবনে চিত্র ২-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন

Internal and External Structure of the Earth

সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবী ছিল এক উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড। এই গ্যাসপিণ্ড ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়। এ সময় এর উপর যে আস্তরণ পড়ে তা হলো ভূত্বক। ভূগর্ভের রয়েছে তিনটি স্তর। অশ্মমণ্ডল, গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল। ভূত্বক যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি তার সাধারণ নাম শিলা। পৃথিবীতে কার্যরত বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রক্রিয়া শিলা ও খনিজের ধরন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভূপৃষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন দুরকম। ধীর পরিবর্তন ও আকস্মিক পরিবর্তন। এ অধ্যায়ে আমরা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন, বিভিন্ন রকম শিলা, ভূপৃষ্ঠের ধীর ও আকস্মিক পরিবর্তন এবং বিভিন্ন ভূমিরূপ নিয়ে আলোচনা করব।

পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা করতে পারব;
- পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন বর্ণনা করতে পারব;
- ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারব;
- পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে অতীতে সংঘটিত কোনো একটি সুনামির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal Structure of the Earth)

সৃষ্টির সময় পৃথিবী ছিল একটি উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড। উত্তপ্ত অবস্থা থেকে এটি শীতল ও ঘনীভূত হয়। এই সময় পৃথিবীর বাইরের ভারী উপাদানগুলো এর কেন্দ্রের দিকে জমা হয়। আর হালকা উপাদানগুলো ভরের তারতম্য অনুসারে নিচ থেকে উপরে স্তরে স্তরে জমা হয়। পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরকে মণ্ডল বলে। উপরের স্তরটিকে অশ্মমণ্ডল বলে। অশ্মমণ্ডলের উপরের অংশ ভূত্বক নামে পরিচিত।

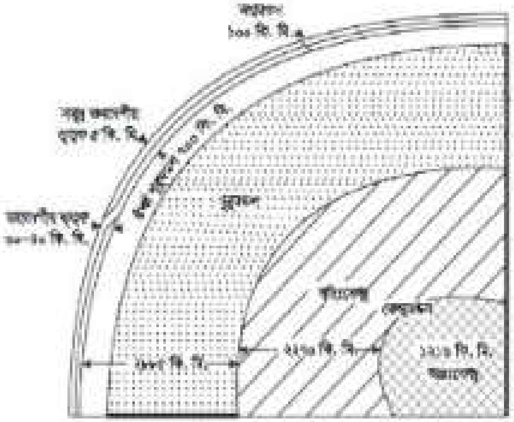

চিত্র ৪.১ : পৃথিবীর গঠন কাঠামোর আড়াআড়ি চিত্র
উৎস : Trabuck and Lutgens (1994)

ভূত্বক (Earth's Crust) : ভূপৃষ্ঠে শিলার যে কঠিন বহিরাবরণ দেখা যায় তাই ভূত্বক (চিত্র ৪.১)। ভূঅভ্যন্তরের অন্যান্য স্তরের তুলনায় ভূত্বকের পুরুত্ব সবচেয়ে কম; গড়ে ২০ কিলোমিটার। ভূত্বক মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে তা গড়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার পুরু। সাধারণভাবে মহাদেশীয় ভূত্বকের এ স্তরকে সিয়াল (Sial) স্তর বলে, যা সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্বারা গঠিত। এটি সিয়াল স্তরের তুলনায় ভারী এবং এর প্রধান খনিজ উপাদান সিলিকন (Si) ও ম্যাগনেসিয়াম (Mg) যা সাধারণভাবে সিমা (Sima) নামে পরিচিত। অনুমান করা হয় যে, এ ব্যাসল্ট স্তরই সারা পৃথিবী জুড়ে বহিরাবরণ ও গভীর সমুদ্র তলদেশে বিদ্যমান। ভূত্বকের উপরের ভাগেই বাহ্যিক অবয়বগুলো দেখা যায়। যেমন– পর্বত, মালভূমি, সমভূমি ইত্যাদি। ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে।

গুরুমণ্ডল (Barysphere) : ভূত্বকের নিচে প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরুমণ্ডলকে গুরুমণ্ডল বলে। গুরুমণ্ডল মূলত ব্যাসল্ট (Basalt) শিলা দ্বারা গঠিত। এ অংশে রয়েছে সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কার্বন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ। গুরুমণ্ডল দুই ভাগে বিভক্ত। (ক) ঊর্ধ্ব গুরুমণ্ডল যা ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মণ্ডল প্রধানত লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ দ্বারা গঠিত। (খ) নিম্ন গুরুমণ্ডল যা প্রধানত আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং সিলিকন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ খনিজ দ্বারা গঠিত।

কেন্দ্রমণ্ডল (Centrosphere) : গুরুমণ্ডলের ঠিক পরে রয়েছে কেন্দ্রমণ্ডল। গুরুমণ্ডলের নিচ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত এই মণ্ডল বিস্তৃত। এ স্তর প্রায় ৩,৪৮৬ কিলোমিটার পুরু। ভূকম্পন তরঙ্গের সাহায্যে জানা গেছে যে, কেন্দ্রমণ্ডলের একটি তরল বহিরাবরণ আছে, যা প্রায় ২,২৭০ কিলোমিটার পুরু এবং একটি কঠিন অন্তঃভাগ আছে, যা ১,২১৬ কিলোমিটার পুরু। বিজ্ঞানীগণ বিশ্বাস করেন যে, কেন্দ্রমণ্ডলের উপাদানগুলোর মধ্যে লোহা, নিকেল, পারদ ও সিসা রয়েছে। তবে প্রধান উপাদান হলো নিকেল ও লোহা।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন-উপাদান : শিলা ও খনিজ (Rocks and Minerals)

ভূত্বক শিলা দ্বারা গঠিত। শিলা বিভিন্ন খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত। খনিজ বলতে কী বোঝায়? শিলা ও খনিজের পার্থক্য কী? কতকগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাই খনিজ। খনিজ হলো একটি প্রাকৃতিক অজৈব পদার্থ যার সুনির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন এবং ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম রয়েছে। আর শিলা হলো এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। খনিজ দুই বা ততোধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত হলেও কিছু কিছু খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন– হীরা, সোনা, তামা, রূপা, পারদ ও গন্ধক।

শিলা গঠনকারী প্রতিটি খনিজের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যদিও বেশিরভাগ শিলাই একাধিক খনিজ দ্বারা গঠিত হয়। সে ক্ষেত্রে খনিজ এবং শিলা একই পদার্থ। উদাহরণ হলো, পাললিক শিলা চুনাপাথর। এটি ক্যালসাইট নামের একটি খনিজ। শিলা হিসেবে এটি চুনাপাথর নামে পরিচিত।

শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য (Difference between rocks and minerals) : খনিজ এক বা একাধিক মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত আর শিলা এক বা একাধিক খনিজ পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। খনিজ সমসত্ত্ব অজৈব পদার্থ, শিলা অসমসত্ত্ব পদার্থ। খনিজ কঠিন ও স্ফটিকাকার হয়, কিছু কিছু শিলা কঠিন হলেও স্ফটিকাকার হয় না। খনিজের নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংকেত আছে, শিলার কোনো রাসায়নিক সংকেত নেই। খনিজের ধর্ম এর গঠনকারী মৌলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে শিলার ধর্ম এর গঠনকারী খনিজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কাজ : নিম্নে ছকের মধ্যে শিলা ও খনিজের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।	
শিলা	খনিজ
• • • •	• • • •

শিলা ও এর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Rocks)

ভূত্বক যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তাদের সাধারণ নাম শিলা। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে দুই বা ততোধিক খনিজ দ্রব্যের সংমিশ্রণে এসব শিলার সৃষ্টি হয়। ভূত্বক গঠনকারী সকল কঠিন ও কোমল পদার্থই শিলা। উদাহরণস্বরূপ নুড়ি, কাঁকর, গ্রানাইট, কাদা, বালি প্রভৃতি। গঠনপ্রণালি অনুসারে শিলাকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : (১) আগ্নেয় শিলা, (২) পাললিক শিলা ও (৩) রূপান্তরিত শিলা।

১। আগ্নেয় শিলা (Igneous Rocks) : জন্মের প্রথমে পৃথিবী একটি উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড ছিল। এই গ্যাসপিণ্ড ক্রমান্বয়ে তাপ বিকিরণ করে তরল হয়। পরে আরও তাপ বিকিরণ করে এর উপরিভাগ শীতল ও কঠিন আকার ধারণ করে। এভাবে গলিত অবস্থা থেকে ঘনীভূত বা কঠিন হয়ে যে শিলা গঠিত হয় তাকে আগ্নেয় শিলা বলে। আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ে সৃষ্টি হয় তাই এই শিলাকে প্রাথমিক শিলাও বলে। এ শিলায় কোনো স্তর নেই। তাই আগ্নেয় শিলার অপর নাম অস্তরীভূত শিলা। এই শিলায় জীবাশ্ম নেই। এই শিলার বৈশিষ্ট্য হলো– (ক) স্ফটিকাকার, (খ) অস্তরীভূত, (গ) কঠিন ও কম ভঙ্গুর, (ঘ) জীবাশ্ম দেখা যায় না এবং (ঙ) অপেক্ষাকৃত ভারী।

আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় ভূত্বকের দুর্বল অংশে ফাটলের সৃষ্টি হয়। তখন পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উত্তপ্ত গলিত লাভা নির্গত হয়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে। এভাবে ব্যাসল্ট ও গ্রানাইট শিলার সৃষ্টি হয়। আগ্নেয় শিলাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) বহিঃজ আগ্নেয় শিলা ও (খ) অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা।

(ক) বহিঃজ আগ্নেয় শিলা (Extrusive Igneous Rocks) : ভূগর্ভের উত্তপ্ত তরল পদার্থ ম্যাগমা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা অন্য কোনো কারণে বেরিয়ে এসে শীতল হয়ে জমাট বেঁধে বহিঃজ আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়, এদের দানা খুব সূক্ষ্ম এবং রং গাঢ়। এই শিলার উদাহরণ হলো ব্যাসল্ট, রায়োলাইট, অ্যান্ডিসাইট ইত্যাদি।

(খ) অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা (Intrusive Igneous Rocks) : উত্তপ্ত ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের বাইরে না এসে ভূগর্ভে জমাট বাঁধলে তৈরি হয় অন্তঃজ আগ্নেয় শিলা। এর দানাগুলো স্থূল ও হালকা রঙের হয়। গ্রানাইট, গ্যাব্রো, ডলোরাইট, ল্যাকোলিথ, ব্যাথোলিথ, ডাইক ও সিল এ শিলার অন্যতম উদাহরণ (চিত্র ৪.২)।

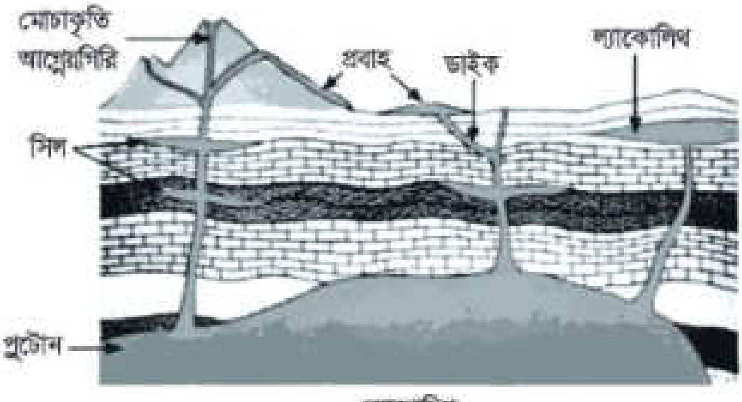

চিত্র ৪.২ : আগ্নেয় শিলা

২। পাললিক শিলা (Sedimentary Rocks) : পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠিত হয়েছে তাকে পাললিক শিলা বলে। বৃষ্টি, বায়ু, তুষার, তাপ, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতি শক্তির প্রভাবে আগ্নেয় শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত ও বিচূর্ণীভূত হয়ে রূপান্তরিত হয় এবং কাঁকর, কাদা, বালি ও ধূলায় পরিণত হয়। ক্ষয়িত শিলাকণা জলস্রোত, বায়ু এবং হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পলল বা তলানিরূপে কোনো নিম্নভূমি, হ্রদ এবং সাগরগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে।

পরবর্তীতে ঐসব পদার্থ ভূগর্ভের উত্তাপে ও উপরের শিলাস্তরের চাপে জমাট বেঁধে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। পাললিক শিলা ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের শতকরা ৫ ভাগ দখল করে আছে। তবে মহাদেশীয় ভূত্বকের আবরণের ৭৫ ভাগই পাললিক শিলা। পলল বা তলানি থেকে গঠিত হয় বলে এরূপ শিলাকে পাললিক শিলা বলে (চিত্র ৪.৩)। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। পাললিক শিলা যৌগিক, জৈবিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হতে পারে। বেলেপাথর, কয়লা, শেল, চুনাপাথর, কাদাপাথর ও কেওলিন পাললিক শিলার উদাহরণ। জীবদেহ থেকে উৎপন্ন হয় বলে কয়লা ও খনিজ তেলকে জৈব শিলাও বলে। অনেক পাললিক শিলার মধ্যে নানাপ্রকার উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ বা জীবাশ্ম দেখা যায়।

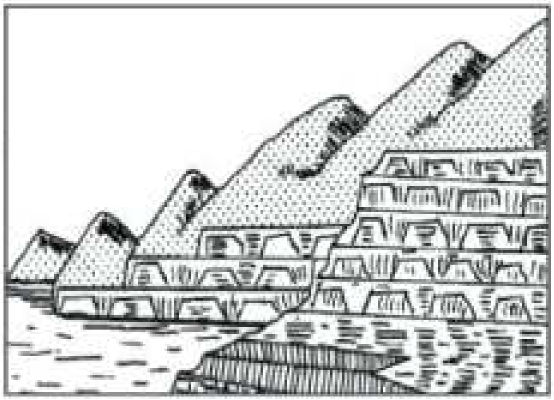

চিত্র ৪.৩ : পাললিক শিলা

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য : পাললিক শিলা স্তরীভূত, নরম ও হালকা এবং সহজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে জীবাশ্ম দেখা যায়। এই শিলায় ছিদ্র দেখা যায়।

৩। **রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rocks) :** আগ্নেয় ও পাললিক শিলা যখন প্রচণ্ড চাপ, উত্তাপ এবং রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে রূপ পরিবর্তন করে নতুন রূপ ধারণ করে তখন তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। ভূআন্দোলন, অগ্ন্যুৎপাত ও ভূমিকম্প, রাসায়নিক ক্রিয়া কিংবা ভূগর্ভস্থ তাপ আগ্নেয় ও পাললিক শিলাকে রূপান্তরিত করে। চুনাপাথর রূপান্তরিত হয়ে মার্বেল, বেলেপাথর রূপান্তরিত হয়ে কোয়ার্টজাইট, কাদা ও শেল রূপান্তরিত হয়ে স্লেট, গ্রানাইট রূপান্তরিত হয়ে নিস এবং কয়লা রূপান্তরিত হয়ে গ্রাফাইটে পরিণত হয়।

রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য : এই শিলা স্ফটিকযুক্ত, খুব কঠিন হয়। এতে জীবাশ্ম দেখা যায় না। কোনো কোনো রূপান্তরিত শিলায় ঢেউ খেলানো স্তর দেখা যায়।

কাজ : দলগতভাবে শিলার শ্রেণিবিভাগের ছকটি পূরণ কর।

গঠনপ্রণালি অনুসারে শিলার শ্রেণীবিভাগ	প্রকারভেদ	বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
আগ্নেয় শিলা			
পাললিক শিলা			
রূপান্তরিত শিলা			

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া (Changing process of the earth surface)

ভূপৃষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। নানাপ্রকার ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে। যে সমস্ত কার্যাবলির কারণে প্রাকৃতিকভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন সাধিত হয় তা ভূপ্রক্রিয়া। যেমন– নদী অবক্ষেপণের মাধ্যমে প্লাবন ভূমি গড়ে তুলছে। এখানে নদী অবক্ষেপণ একটি প্রক্রিয়া। ভূপ্রক্রিয়া তার কার্য সাধনের জন্য নানাপ্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নেয়। যেমন– মাধ্যাকর্ষণ, ভূতাপীয় শক্তি এবং সৌরশক্তি। এ সমস্ত শক্তির সাহায্যে ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের কোথাও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে, আবার কখনো কখনো খুব দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে। সাধারণভাবে বহিঃশক্তির (যেমন–সৌরশক্তি) সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠে ধীর পরিবর্তন আনে। সুদীর্ঘ সময় ধরে ভূপৃষ্ঠে এই পরিবর্তন চলে বিধায় একে ধীর পরিবর্তন বলে। ধীর পরিবর্তন সাধারণত দুটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যেমন– নগ্নীভবন ও অবক্ষেপণ। অপরদিকে অন্তঃশক্তির (যেমন– ভূমিকম্প) সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। নিচে ভূত্বকের পরিবর্তন সাধনকারী ভূপ্রক্রিয়াসমূহের একটি ছক দেওয়া হলো।

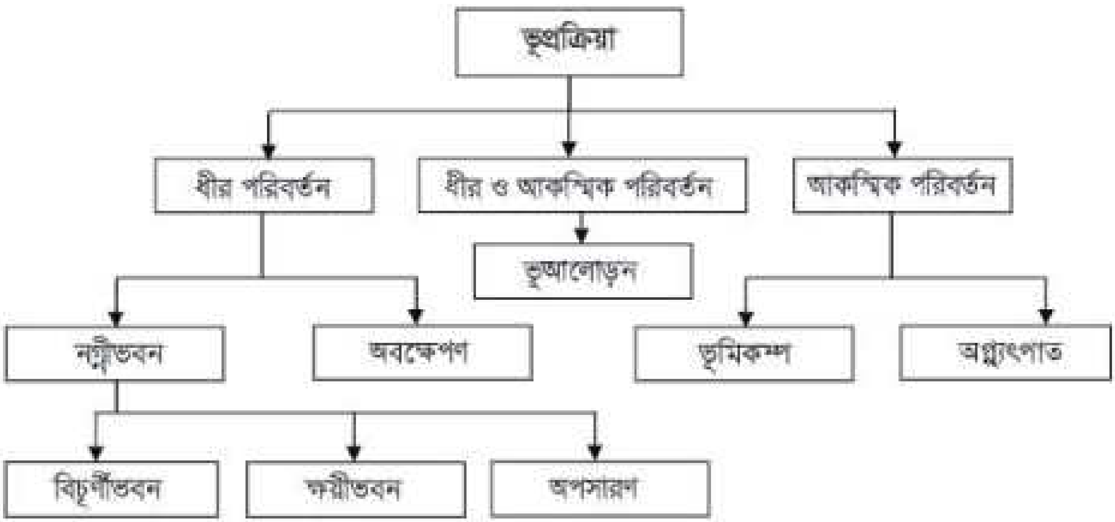

ধীর পরিবর্তন : ধীর পরিবর্তন হলো আকস্মিক পরিবর্তনের একেবারেই বিপরীত অবস্থা। অনেকগুলো প্রাকৃতিক শক্তি যেমন– সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা যে পরিবর্তন ধীরে ধীরে সংঘটিত হয় তাকে ধীর পরিবর্তন বলে। এই ধীর পরিবর্তন বিশাল এলাকা জুড়ে হয়ে থাকে।

আকস্মিক পরিবর্তন : পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত ও গলিত অবস্থায় রয়েছে। এসব উত্তপ্ত বস্তুর মধ্যে তাপ ও চাপের পার্থক্য হলে ভূত্বকে যে আলোড়ন ঘটে তাকে ভূআলোড়ন বলে। এ ভূআলোড়নের ফলেই ভূপৃষ্ঠের বেশিরভাগ পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তির প্রভাবে ভূগর্ভে সর্বদা নানারূপ পরিবর্তন হচ্ছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূকম্পন, পৃথিবীর অভ্যন্তরের সংকোচন, ভূগর্ভের তাপ ও অন্যান্য প্রচণ্ড শক্তির ফলে ভূপৃষ্ঠে হঠাৎ যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে আকস্মিক পরিবর্তন বলে। এরূপ পরিবর্তন খুব বেশি স্থান জুড়ে হয় না। আকস্মিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় প্রধানত ভূমিকম্প, সুনামি ও আগ্নেয়গিরি দ্বারা।

ভূমিকম্প (Earthquake)

পৃথিবীর কঠিন ভূত্বকের কোনো কোনো অংশ প্রাকৃতিক কোনো কারণে কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্য হঠাৎ কেঁপে ওঠে। ভূত্বকের এরূপ আকস্মিক কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। ভূকম্পন সাধারণত কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয় আবার কখনো কিছু সময় পর পর অনুভূত হয়। এ কম্পন কখনো অত্যন্ত মৃদু আবার কখনো অত্যন্ত প্রচণ্ড হয়।

ভূমিকম্পের প্রধান কারণ (Main causes of earthquake)

- পৃথিবীর উপরিভাগ কতকগুলো ফলক/প্লেট দ্বারা গঠিত। এই প্লেটসমূহের সঞ্চালন প্রধানত ভূমিকম্প ঘটিয়ে থাকে।
- অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্লেটসমূহের উপর ভূকম্পন সৃষ্টি হয়।

অপ্রধান কারণ

১। **শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি :** কোনো কারণে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে বড় ধরনের শিলাচ্যুতি ঘটলে বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প হয়। ১৯৩৫ সালে বিহারে এবং ১৯৫০ সালে আসামে এ কারণেই ভূমিকম্প হয়।

২। **তাপ বিকিরণ :** ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হয়।

৩। **ভূগর্ভস্থ বাষ্প :** পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যধিক তাপের কারণে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্প ভূত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেওয়ার ফলে প্রচণ্ড ভূকম্পন অনুভূত হয়।

৪। **ভূগর্ভস্থ চাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস :** অনেক সময় ভূগর্ভে হঠাৎ চাপের হ্রাস বা বৃদ্ধি হলে তার প্রভাবে ভূমিকম্প হয়।

৫। **হিমবাহের প্রভাব :** হঠাৎ করে হিমবাহ পর্বতগাত্র থেকে নিচে পতিত হলে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পের ফলাফল (Effects of earthquakes) : ভূমিকম্পের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক ধরনের পরিবর্তন ঘটে এবং বহু ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। ঘরবাড়ি, ধনসম্পদ ও যাতায়াত ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়। এতে জীবনেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। নিচে ভূমিকম্পের ফলাফল আলোচনা করা হলো :

(১) ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকের মধ্যে অসংখ্য ভাঁজ, ফাটল বা ধসের সৃষ্টি হয়। নদীর গতিপথ পাল্টে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৮৭ সালে আসামে যে ব্যাপক ভূমিকম্প হয় তাতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। ফলে নদটি তার গতিপথ পাল্টে বর্তমানে যমুনা নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

(২) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় সমুদ্রতল উপরে উত্থিত হয়, পাহাড়-পর্বত বা দ্বীপের সৃষ্টি করে। আবার কোথাও স্থলভাগের অনেক স্থান সমুদ্রতলে ডুবে যায়। ১৮৯৯ সালে ভারতের কচ্ছ উপসাগরের উপকূলে প্রায় ৫,০০০ বর্গকিলোমিটার স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়।

(৩) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় নদীর গতি পরিবর্তিত হয় বা কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়। কখনো কখনো নদী শুকিয়ে যায়। আবার সময় সময় উচ্চভূমি অবনমিত হয়ে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্পে দিবং নদীর গতি পরিবর্তিত হয়।

(৪) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় পর্বতগাত্র থেকে হিমানীসম্প্রপাত হয় এবং পর্বতের উপর শিলাপাত হয়।

(৫) ভূমিকম্পের ফলে হঠাৎ করে সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন এলাকা জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়।

সুনামি (Tsunami)

সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ। জাপানি ভাষায় এর অর্থ হলো 'পোতাশ্রয়ের ঢেউ'। সুনামির পানির ঢেউ সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউয়ের মতো নয়। এটা সাধারণ ঢেউয়ের চেয়ে অনেক বিশালাকৃতির। অতি দ্রুত ফুঁসে ফুলে ওঠা জোয়ারের মতো, যা উপকূল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে। সুনামির পানির ঢেউগুলো একের পর এক উঁচু হয়ে আসতেই থাকে তাই একে ঢেউয়ের রেলগাড়ি বা 'ওয়েভ ট্রেন' বলে। সুনামি হলো পানির এক মারাত্মক ঢেউ যা সমুদ্রের মধ্যে বা বিশাল হ্রদে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পানির নিচে কোনো পারমাণবিক বা অন্য কোনো বিস্ফোরণ, ভূপাত ইত্যাদি কারণেও সুনামি হতে পারে। সুনামির ক্ষয়ক্ষতি সমুদ্র উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এর আশেপাশে সুনামির ধ্বংসাত্মক লীলা সংঘটিত হয়। ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে যে সুনামি সৃষ্টি হয় তা এই মহাসাগরের আশেপাশে ১৪টি দেশে আঘাত হানে এবং মারাত্মক একটি দুর্যোগ সৃষ্টি করে।

কাজ : ২০০৪ ও ২০১১ সালে এশিয়ায় দু'টি সুনামি হয়। তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকা দলগতভাবে তৈরি কর।

আগ্নেয়গিরি (Volcano)

চিত্র ৪.৪ : আগ্নেয়গিরি

ভূত্বকের শিলাস্তর সর্বত্র একই ধরনের কঠিন বা গভীর নয়। কোথাও নরম আবার কোথাও কঠিন। কোনো কোনো সময় ভূগর্ভের চাপ প্রবল হলে শিলাস্তরের কোনো দুর্বল অংশ ফেটে যায় বা সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়। ভূপৃষ্ঠের দুর্বল অংশের ফাটল বা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভূগর্ভের উষ্ণ বায়ু, গলিত শিলা, ধাতু, ভস্ম, জলীয়বাষ্প, উত্তপ্ত পাথরখণ্ড, কাদা, ছাই প্রভৃতি প্রবলবেগে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠে ঐ ছিদ্রপথ বা ফাটলের চারপাশে ক্রমশ জমাট বেঁধে যে উঁচু মোচাকৃতি পর্বত সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরির মুখকে জ্বালামুখ এবং জ্বালামুখ দিয়ে নির্গত গলিত পদার্থকে লাভা বলে (চিত্র ৪.৪)।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণ (Reasons of Volcanism)

(১) ভূত্বকে দুর্বল স্থান বা ফাটল দিয়ে ভূঅভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা, ভস্ম, ধাতু প্রবলবেগে বের হয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

(২) যখন ভূপৃষ্ঠের চাপ কমে যায় তখন ভূগর্ভের শিলাসমূহ স্থিতিস্থাপক অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হয়। এতে শিলার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে তরল পদার্থ দুর্বল স্থান ভেদ করে প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে।

(৩) কখনো কখনো ভূত্বকের ফাটল দিয়ে নদী-নালা, খাল-বিল এবং সমুদ্রের পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করলে প্রচণ্ড উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়। ফলে আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে ভূত্বক ফাটিয়ে দেয়। তখন ঐ ফাটলের ভিতর দিয়ে পানি, বাষ্প, তপ্ত শিলা প্রভৃতি নির্গত হয়ে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

(৪) ভূগর্ভে নানা রাসায়নিক ক্রিয়া ও বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাবে প্রচুর তাপ বৃদ্ধি পেয়ে গ্যাসের সৃষ্টি হয়। তাতে ভূঅভ্যন্তরের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

(৫) ভূআন্দোলনের সময় পার্শ্বচাপে ভূত্বকের দুর্বল অংশ ভেদ করে এ উত্তপ্ত তরল লাভা উপরে উত্থিত হয়। এভাবে ভূআন্দোলনের ফলেও অগ্ন্যুৎপাত হয়।

আগ্নেয়গিরির প্রকারভেদ (Types of Volcanoes) : অগ্ন্যুৎপাতের ভিত্তিতে আগ্নেয়গিরিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি (Active Volcano) : যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এখনও বন্ধ হয়নি, তাকে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন– হাওয়াই দ্বীপের মাওনালোয়া ও মাওনাকেয়া।

২। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি (Dormant Volcano) : যেসব আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত অনেককাল আগে বন্ধ হয়ে গেছে; তাদেরকে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন– জাপানের ফুজিয়ামা।

৩। মৃত আগ্নেয়গিরি (Extinct Volcano) : যেসব আগ্নেয়গিরি দীর্ঘকাল ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতেও অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নেই, সেগুলোকেই মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। যেমন– ইরানের কোহিসুলতান।

আকার ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে আগ্নেয়গিরিকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে।

১। শিল্ড আগ্নেয়গিরি (Shield Volcano) : গম্বুজ আকৃতির শিল্ড আগ্নেয়গিরিগুলোর তলদেশ চওড়া এবং ঢাল সামান্য, সাধারণত আকারে বৃহৎ। এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি কেন্দ্রীয় নির্গমনপথে বা সারি সারি নির্গমনপথ দিয়ে দ্রুত বেগে প্রবাহিত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো লাভা দ্বারা গঠিত। হাওয়াই দ্বীপের মাওনালোয়া এর উদাহরণ।

২। স্ট্র্যাটো আগ্নেয়গিরি (Strato Volcano) : জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত ভস্ম ও লাভার সমন্বয়ে স্তরসমূহ দ্বারা এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি গঠিত হয়। অধিকাংশ স্ট্র্যাটো আগ্নেয়গিরি অনিয়মিতভাবে গঠিত পর্বতসমূহ বা পর্বত পার্শ্বে উৎপন্ন কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য নির্গমনপথ দিয়ে প্রবাহিত বিক্ষিপ্ত পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

৩। সিন্ডার কোণ আগ্নেয়গিরি (Cinder Cone Volcano) : আকারে ছোট আগ্নেয়গিরিগুলোকে সিন্ডার কোণ আগ্নেয়গিরি বলা হয়। এগুলো গ্যাসপূর্ণ ম্যাগমার পুনঃপুনঃ ক্ষুদ্র বিস্ফোরণের ফল, যেগুলো

লাভা ও ভস্মেও সামান্য পরিমাণ নিক্ষেপ করে নির্গমনপথের আশপাশের ছোট এলাকায়। সিন্ডার কোণ আগ্নেয়গিরি এর গড় আকৃতি প্রায় ৮০০ মিটার চওড়া তল এবং ১০০ মিটার উঁচু। মেক্সিকোর পেরিকোটিন এর উদাহরণ।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফল (Effects of Volcanism) : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। অন্যদিকে ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো স্থানে এর দ্বারা সামান্য সুফলও পাওয়া যায়। নিম্নে আগ্নেয়গিরির ফলাফলের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো :

১। অনেক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত পদার্থ চারদিকে সঞ্চিত হয়ে মালভূমির সৃষ্টি করে। ভারতের দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণমৃত্তিকাময় মালভূমি এরূপ নির্গত লাভা দিয়ে গঠিত।

২। সমুদ্রের তলদেশেও অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। এ থেকে নির্গত লাভা সঞ্চিত হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এভাবে সৃষ্ট একটি আগ্নেয় দ্বীপ।

৩। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশ ধসে গভীর গহ্বরের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৩ সালে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী অংশে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এক বিরাট গহ্বর দেখা যায়।

৪। মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে পানি জমে আগ্নেয় হ্রদের সৃষ্টি করে। আলাস্কার মাউন্ট আডাকামা, নিকারাগুয়ার কোসেগোয়না এ ধরনের হ্রদ।

৫। আগ্নেয়গিরির নির্গত লাভা, শিলা দ্রব্য প্রভৃতি দীর্ঘকাল ধরে একটা স্থানে সঞ্চিত হয়ে পর্বতের সৃষ্টি করে। এ ধরনের পর্বতকে আগ্নেয় পর্বত বলে। যেমন– ইতালির ভিসুভিয়াস।

৬। অনেক সময় আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হতে হতে বিস্তৃত এলাকা নিম্ন সমভূমিতে পরিণত হয়। যেমন– উত্তর আমেরিকার স্নেক নদীর লাভা সমভূমি।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে লাভা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম, নগর ও কৃষিক্ষেত্র সব ধ্বংস করে। ১৮৭৯ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই নামের দু'টি নগর উত্তপ্ত লাভা ও ভস্মরাশির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

আগ্নেয়গিরির কারণে কেবল মানুষের অপকার নয় উপকারও হয়ে থাকে। এতে ভূমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। যেমন– দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত কৃষ্ণমৃত্তিকা কার্পাস চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

অনেক সময় লাভার সঙ্গে অনেক খনিজ পদার্থ নির্গত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে অগ্ন্যুৎপাতের জন্য অধিক পরিমাণে খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। অগভীর সমুদ্রে বা হ্রদে লাভা ও ভস্ম সঞ্চিত হয়ে এরূপ ভূভাগ সৃষ্টি হয়।

ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল (Causes and effects of slow changes of the earth's surface)

আমরা জানি পৃথিবীর আকস্মিক পরিবর্তনের জন্য তিনটি প্রধান ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। তা হলো– পর্বত, মালভূমি এবং সমভূমি। এসব ভূমিরূপ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক শক্তি যেমন– সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টি, নদী প্রভৃতি দ্বারা খুব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে নতুন ভূমিরূপে পরিণত হয়। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ধীর পরিবর্তন বলে। এতে সূর্যতাপ, বায়ু, বৃষ্টি, নদী প্রভৃতি শক্তি খুব ধীরে ধীরে ভূত্বকের ক্ষয়সাধন করে থাকে। ফলে ভূত্বকের উপরিস্থিত শিলা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এই শিলা অপসারিত হয়, আবার নতুন করে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে।

যেসব প্রক্রিয়ায় ভূমিরূপের ধীর পরিবর্তন হচ্ছে তাদেরকে প্রধানত চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

(ক) **বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন (Weathering and Erosion)**

(খ) **অপসারণ (Transporation)**

(গ) **নগ্নীভবন (Denudation)**

(ঘ) **অবক্ষেপণ (Deposition)**

(ক) বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন : শিলারাশির চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট হওয়া কিন্তু স্থানান্তর না হলে তাকে বিচূর্ণীভবন বলে। সাধারণত প্রাকৃতিক কারণে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত ও হিমবাহ দ্বারা শিলা ক্ষয়সাধন হয়। যে প্রক্রিয়ায় শিলাখণ্ড স্থানান্তরিত হয় তাকে ক্ষয়ীভবন বলে।

(খ) অপসারণ : নদীস্রোত, বায়ুপ্রবাহ ও হিমবাহ প্রভৃতি শক্তির দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ পদার্থগুলো স্থানান্তরিত হয়। একে অপসারণ বলে।

(গ) নগ্নীভবন : বিচূর্ণীভবনের সময় শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। ক্ষয়ীভবন দ্বারা ঐ শিলা অপসারিত হলে নিচের অবিকৃত শিলাগুলো নগ্ন হয়ে পড়ে। এরূপ কার্যকে নগ্নীভবন বলে।

(ঘ) অবক্ষেপণ : বায়ুপ্রবাহ, নদীস্রোত, হিমবাহ প্রভৃতি শক্তির প্রভাবে নানা স্থান থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাগুলো যে প্রক্রিয়ায় কোনো একস্থানে এসে জমা হয়ে নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাকে অবক্ষেপণ বলে।

যেসব প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ক্ষয়ীভবনের মধ্য দিয়ে ধীর পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে বায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ প্রভৃতি প্রধান। এদের ক্ষয়কার্য নিম্নে আলোচিত হলো :

বায়ুর কাজ : বায়ুতে থাকা অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাষ্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার বিচ্ছেদ ও ক্ষয়সাধন করে। বায়ুর ক্ষয়কার্য মরুভূমিতে অধিক দেখা যায়। মরু এলাকা শুষ্ক, প্রায় বৃষ্টিহীন এবং গাছপালা শূন্য। মরু এলাকায় গাছপালা কম থাকার কারণে মৃত্তিকা সুদৃঢ় নয়। এছাড়া দিনের বেলায় সূর্যের তাপে এবং রাতের শীতলতায় শিলার সংকোচন ও প্রসারণের ফলেও সংবদ্ধতা শিথিল হয়ে যায়। এরপর বায়ুপ্রবাহের আঘাতে এ অঞ্চলের শিলা সহজেই বাহিত হয়ে ধীর পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষয়সাধন করে।

বৃষ্টির কাজ : বৃষ্টির পানি ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ভূপৃষ্ঠকে ব্যাপকভাবে ক্ষয় করে। প্রবাহিত হওয়ার সময় পানি শিলাকে আংশিকভাবে ক্ষয় ও আলগা করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাকে প্রসারিত করে। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে কর্ষিত জমির মাটি বৃষ্টির পানির দ্বারা অপসারিত হয়। আবার পর্বতের মধ্যে কর্দম স্তরের উপর অনেক ভারী শিলা হেলানো অবস্থায় থাকে। পর্বতের ফাটল দিয়ে পানি প্রবেশ করে কাদার স্তরকে গলিয়ে দেয়, এতে বড় শিলাস্তর কাদার উপর থাকতে না পেরে নিচে ধসে পড়ে। একে ভূমিধস বলে। এভাবে অনেকদিন ধরে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তন সাধিত হয়।

হিমবাহের কাজ : হিমবাহের দ্বারাও ভূপৃষ্ঠের কোনো কোনো অঞ্চল ব্যাপকভাবে ক্ষয় হয়ে থাকে। হিমবাহের নিচে নামার সময় এর নিচের প্রস্তরখণ্ড পর্বতগাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক দূরে গিয়ে পতিত হয়। পর্বতগাত্রের মধ্যে ছিদ্র যদি থাকে তাহলে তার ভিতর পানি প্রবেশ করে বরফে পরিণত হয়ে প্রস্তরগুলোকে আলগা করে দেয়। ফলে হিমবাহের চাপে এটি পর্বতগাত্র থেকে খুব সহজেই পৃথক হয়ে যায়। এই হিমবাহ অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে হয় বলে এটি ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের একটি উদাহরণ।

নদীর কাজ : যেসব প্রাকৃতিক শক্তি ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত ধীর পরিবর্তন করছে তাদের মধ্যে নদীর কাজ অন্যতম। নদী যখন পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন স্রোতের আঘাতে বাহিত নুড়ি, কর্দম প্রভৃতির ঘর্ষণে নদীগর্ভ ও পার্শ্ব ক্ষয় হয়। পার্বত্য অবস্থায় নদীর স্রোতের বেগ বেশি থাকে। এতে নদী নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং কোনো সঞ্চয় হতে পারে না। যখন নদী সমভূমিতে আসে তখন নদী ক্ষয় এবং সঞ্চয় দুটোই করে। নদীর চলার পথে যেখানে নরম শিলা পাবে নদী ঠিক সেদিক দিয়ে ক্ষয় করে অগ্রসর হয়। ক্ষয়কৃত নরম শিলা অবক্ষেপণ করে বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠন করে। এভাবে নদী ক্ষয় ও সঞ্চয় করতে করতে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। অনেকদিন ধরে এভাবে ক্ষয় ও সঞ্চয় কাজ চলে বলে একে নদীর দ্বারা ধীর পরিবর্তন বলে।

নদীর গতিপথ : আমাদের জীবনে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন যতগুলো শহর দেখতে পাই তার সবগুলোই নদীর পাশে অবস্থিত। কেননা অতীতে মানুষ পানিপথেই চলাফেরা করত সবচেয়ে বেশি। নদীর গতি ও কাজ সম্পর্কে জানতে হলে নদী বিষয়ে আরও কিছু মৌলিক ধারণা থাকা দরকার। এগুলো হলো–

নদীর সংজ্ঞা : নদীর গতিপথ সম্পর্কে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে নদী কাকে বলে? উঁচু পর্বত, মালভূমি বা উঁচু কোনো স্থান থেকে বৃষ্টি, প্রস্রবণ, হিমবাহ বা বরফ গলা পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতধারার মিলিত প্রবাহ যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়ে সমভূমি বা নিম্নভূমির উপর দিয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদ অথবা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাকে নদী বলে। যেখান থেকে নদীর উৎপত্তি হয় তাকে নদীর উৎস বলে। নদী যখন কোনো হ্রদ বা সাগরে এসে পতিত হয়, তখন সেই পতিত স্থানকে মোহনা বলে। নদীর অধিক বিস্তৃত মোহনাকে খাঁড়ি বলে।

দোয়াব : প্রবহমান দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূমিকে দোয়াব বলে।

নদীসংগম : দুই বা ততোধিক নদীর মিলনস্থলকে নদীসংগম বলে।

উপনদী : পর্বত বা হ্রদ থেকে যেসব ছোট নদী উৎপন্ন হয়ে কোনো বড় নদীতে পতিত হয় তাকে সেই বড় নদীর উপনদী বলে। বাংলাদেশের তিস্তা ও করতোয়া হলো যমুনা নদীর উপনদী।

শাখানদী : মূল নদী থেকে যে সকল নদী বের হয় তাকে শাখানদী বলে। বাংলাদেশের কুমার ও গড়াই হলো পদ্মা নদীর শাখানদী।

নদী উপত্যকা : যে খাতের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় সে খাতকে উক্ত নদীর উপত্যকা বলে।

নদীগর্ভ : নদী উপত্যকার তলদেশকে নদীগর্ভ বলে।

নদী অববাহিকা : উৎপত্তি স্থান থেকে শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে সমুদ্র বা হ্রদে পতিত হয় সেই সমগ্র অঞ্চলই নদীর অববাহিকা।

নদীর বিভিন্ন গতি বা অবস্থা (Life cycle of a river)

উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত নদীর গতিপথের আয়তন, গভীরতা, ঢাল, স্রোতের বেগ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে নদীর গতিপথকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৪.৫)। যথা–

(ক) ঊর্ধ্বগতি (Youthful Stage/Upper Course)

(খ) মধ্যগতি (Mature Stage/Middle Course)

(গ) নিম্নগতি (Old Stage/Lower Course)

(ক) ঊর্ধ্বগতি : ঊর্ধ্বগতি হলো নদীর প্রাথমিক অবস্থা। পর্বতের যে স্থান থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে সেখান থেকে সমভূমিতে পৌঁছানো পর্যন্ত অংশকে নদীর ঊর্ধ্বগতি বলে। ঊর্ধ্বগতিতে নদীর প্রধান কাজ হলো ক্ষয়সাধন। ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় নদী স্থলভাগকে ক্ষয় করে এবং তা পরিবহন করে। এ অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ ক্ষয় করা হলেও অনেক সময় নদীর ঢাল কমে গেলে হঠাৎ অধিক পরিমাণে পাথরের টুকরা এলে নদী তখন তা বহন করতে না পেরে হালকা সঞ্চয় করে।

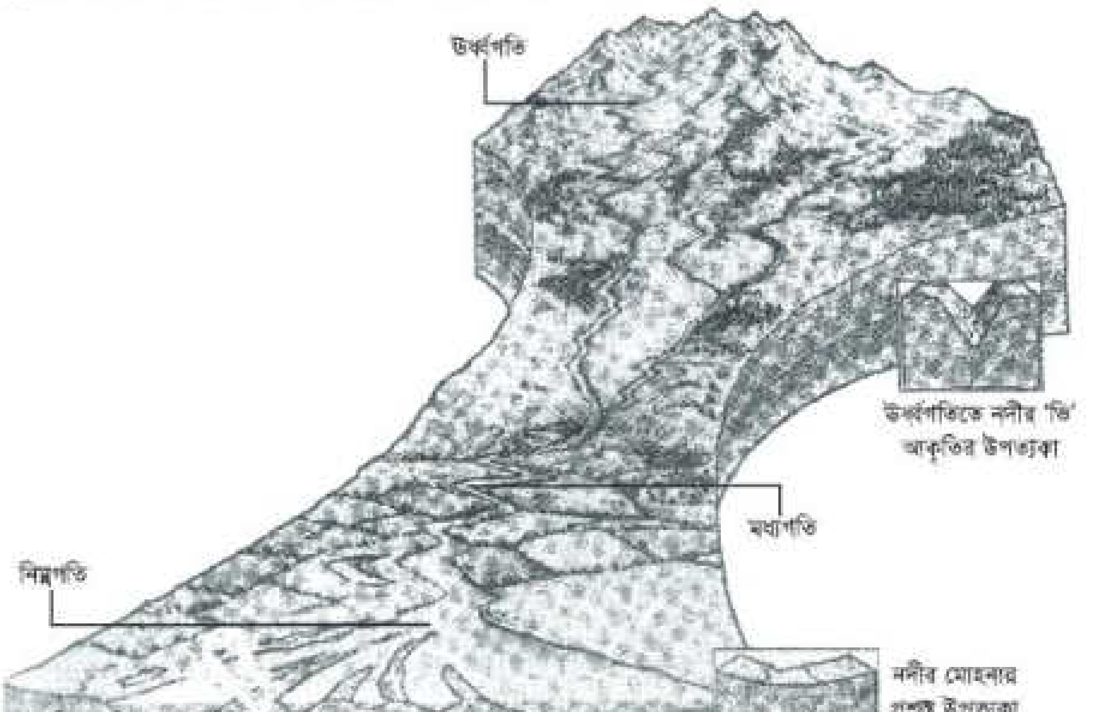

চিত্র ৪.৫ : নদীর বিভিন্ন অবস্থা

(খ) মধ্যগতি : পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে নদী যখন সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন এর প্রবাহকে মধ্যগতি বলে। মধ্যগতিতে নদীর বিস্তার ঊর্ধ্বগতি অবস্থার তুলনায় অনেক বেশি হয় কিন্তু গভীরতা ঊর্ধ্বগতি অবস্থার তুলনায় অনেক কমে যায়। মধ্যগতি অবস্থায় নদীর সঞ্চয় কাজ শুরু হয়। মধ্যগতিতে নদীর দু'দিকের নিম্নভূমি পলি দ্বারা ভরাট হয়ে প্রায় সমতলভূমিতে পরিণত হয়। একে প্লাবন সমভূমি বলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানই এক বিস্তীর্ণ প্লাবন সমভূমি।

(গ) নিম্নগতি : নদীর জীবনচক্রের শেষ পর্যায় হলো নিম্নগতি। এ অবস্থায় স্রোত একেবারে কমে যায়। নিম্নক্ষয় বন্ধ ও পার্শ্বক্ষয় হয় অল্প পরিমাণে। নদী উপত্যকা খুব চওড়া ও অগভীর হয়। স্রোতের বেগ কমে যাওয়ায় পানিবাহিত বালুকণা, কাদা নদীগর্ভে ও মোহনায় সঞ্চিত হয়।

নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ (Landforms created by river)

নদী দুইভাবে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। একটি হলো এর ক্ষয়কার্য ও অপরটি হলো এর সঞ্চয়কার্য। নিম্নে নদীর ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ বর্ণনা করা হলো।

নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ (Landforms due to river erosion)

'ভি' আকৃতির উপত্যকা ('V' Shaped Valley) : ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর স্রোতের বেগ প্রবল হওয়ার কারণে নদী বড় বড় শিলাখণ্ডকে বহন করে নিচের দিকে অগ্রসর হয়। পর্বতগুলো কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত হলেও মাঝে মাঝে নরম শিলাও থাকে। নদীখাতে পার্শ্ব অপেক্ষা নিম্নদিকের শিলা বেশি কোমল বলে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি হয়। এভাবে ক্রমশ ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজি 'V' আকৃতি হয়। তাই একে 'ভি' আকৃতির উপত্যকা বলে (চিত্র ৪.৬)।

চিত্র ৪.৬ : 'ভি' আকৃতির উপত্যকা

গিরিখাত ও ক্যানিয়ন (Gorge and Canyon) : ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এতে ভূপৃষ্ঠ ক্ষয় হয় এবং ভূত্বক থেকে শিলাখণ্ড ভেঙে পড়ে। শিলাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এবং নদীখাতের সঙ্গে সংঘর্ষে মসৃণ হয়ে অনেক দূর চলে যায়। এসব পাথরের সংঘর্ষে নদীর খাত গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। নদীর দুপাশের ভূমি ক্ষয় কম হলে বা না হলে এসব খাত খুব গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে। এক পর্যায়ে এসব খাত খুব গভীর হয়। তখন এরূপ খাতকে গিরিসংকট বা গিরিখাত বলে (চিত্র ৪.৭)।

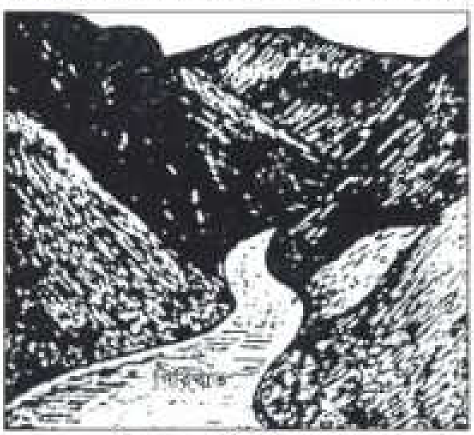

চিত্র ৪.৭ : গিরিখাত

সিন্ধু নদের গিরিখাতটি প্রায় ৫১৮ মিটার গভীর। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহৎ গিরিখাত।

২০২৫

নদী যখন শুষ্ক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে যদি কোমল শিলার স্তর থাকে তাহলে গিরিখাতগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গভীর হয়। এরূপ গিরিখাতকে ক্যানিয়ন বলে। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো নদীর গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (Grand Canyon) পৃথিবী বিখ্যাত। এটি ১৩৭-১৫৭ মিটার বিস্তৃত, প্রায় ২.৪ কিলোমিটার গভীর ও ৪৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ।

জলপ্রপাত (Waterfall) : ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর পানি যদি পর্যায়ক্রমে কঠিন শিলা ও নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাহলে কোমল শিলাস্তরটিকে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে। এর ফলে নরম শিলাস্তরের তুলনায় কঠিন শিলাস্তর অনেক উপরে অবস্থান করে এবং পানি খাড়াভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে। এরূপ পানির পতনকে জলপ্রপাত বলে (চিত্র ৪.৮)। উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত এরূপে গঠিত হয়েছে।

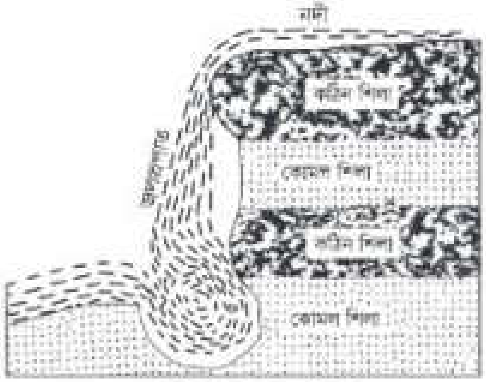

চিত্র ৪.৮ : জলপ্রপাত

নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ (Landforms from river deposition)

পলল কোণ ও পলল পাখা (Alluvial Cone and Alluvial Fan) : পার্বত্য কোনো অঞ্চল থেকে হঠাৎ করে কোনো নদী যখন সমভূমিতে পতিত হয়, তখন শিলাচূর্ণ, পলিমাটি প্রভৃতি পাহাড়ের পাদদেশে সমভূমিতে সঞ্চিত হয়ে ত্রিকোণ ও হাতপাখার ন্যায় ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়। এ কারণে এরূপ পললভূমিকে পলল কোণ বা পলল পাখা বলে (চিত্র ৪.৯)।

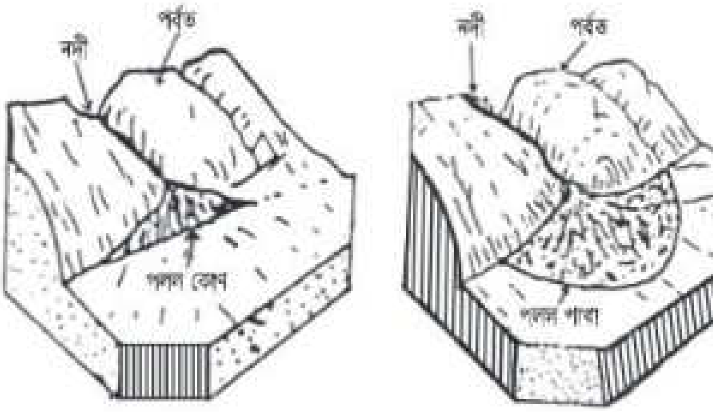

চিত্র ৪.৯ : পলল কোণ ও পলল পাখা

যেসব অঞ্চলে মাটি অধিক পানি শোষণ করতে পারে সেসব অঞ্চলে পানি শোষণের ফলে শিলাচূর্ণ অধিক দূরত্বে যেতে পারে না এবং সেসব অঞ্চলের সঞ্চয় প্রশস্ত না হয়ে কোণাকৃতি হয়। একে পলল কোণ বলে। পানি বেশি শোষণ করে না বলে শিলাচূর্ণ বিস্তৃত হয়ে হাতপাখার ন্যায় ভূখণ্ডের সৃষ্টি হয়। এরূপ পললভূমিকে পলল পাখা বলে। হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গার বিভিন্ন উপনদীর গতিপথে এরূপ ভূখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়।

পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Peidmont Alluvial Plain) : অনেক সময় পাহাড়িয়া নদী পাদদেশে পলি সঞ্চয় করতে করতে একটা সময় পাহাড়ের পাদদেশে নতুন বিশাল সমভূমি গড়ে তোলে। এ ধরনের সমভূমিকে পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলে (চিত্র ৪.১০)। বাংলাদেশের তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া সংলগ্ন রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশে স্থানই পলল সমভূমি নামে পরিচিত। এসব নদী উত্তরের হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে সহজেই পাহাড় থেকে পলল বহন করে এ অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পললভূমি গঠন করেছে।

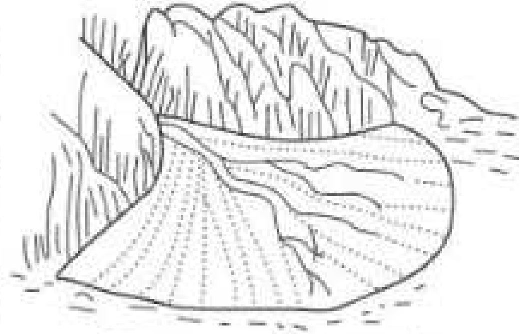

চিত্র ৪.১০ : পাদদেশীয় পলল সমভূমি

প্লাবন সমভূমি (Flood Plain): বর্ষাকালে বিশেষ করে পানি বৃদ্ধির কারণে যখন নদীর উভয়কূল প্লাবিত হয় তখন তাকে প্লাবন বা বন্যা বলে। বন্যা শেষে নদীর দু'পাশের ভূমিতে খুব পুরু স্তর কাদা, পলি দেখতে পাওয়া যায়। এভাবে অনেকদিন পলি জমতে জমতে যে বিস্তৃত সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে প্লাবন সমভূমি বলে (চিত্র ৪.১১)। সমভূমি বলা হলেও এর কোথাও কোথাও সামান্য উঁচুনিচু দেখা যায়।

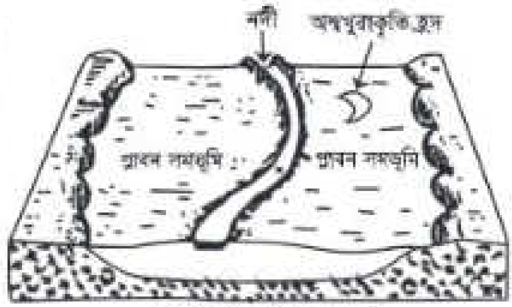

চিত্র ৪.১১ : প্লাবন সমভূমি

কয়েকটি জেলা ব্যতীত মোটামুটি সমগ্র বাংলাদেশই পদ্মা, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদীবিধৌত প্লাবন সমভূমি। প্লাবন সমভূমির মধ্যে অনেক ধরনের সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ দেখা যায়। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো– (ক) অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, (খ) বালুচর, (গ) প্রাকৃতিক বাঁধ।

ব-দ্বীপ (Delta) : নদী যখন মোহনার কাছাকাছি আসে তখন তার স্রোতের বেগ একেবারেই কমে যায়। এতে বালি ও কাদা তলানিরূপে সঞ্চিত হয়। নদীর স্রোতটান যদি কোনো সাগরে এসে পতিত হয় তাহলে ঐ সমস্ত বালি, কাদা নদীর মুখে জমে নদীমুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এর স্তর সাগরের পানির উচ্চতার উপরে উঠে যায়। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই চরাভূমিকে বেষ্টন করে সাগরে পতিত হয়। ত্রিকোণাকার এই নতুন সমতলভূমিকে ব-দ্বীপ বলে (চিত্র ৪.১২)। এটি দেখতে মাত্রাহীন বাংলা 'ব'এর মতো এবং গ্রিক শব্দ 'ডেল্টা'র মতো তাই এর বাংলা নাম ব-দ্বীপ এবং ইংরেজি নাম 'Delta' হয়েছে। হুগলি নদী থেকে পূর্ব দিকে মেঘনার সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে সমস্ত দক্ষিণাংশে গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বিখ্যাত ব-দ্বীপ অঞ্চল।

চিত্র ৪.১২ : ব-দ্বীপ

পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন (External Structure of the Earth)

পৃথিবীর উপরিভাগে বৈচিত্র্যময় ভূমিরূপসমূহই পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন। নিম্নে প্রধান ভূমিরূপসমূহ বর্ণনা করা হলো।

পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপ (The Main Landforms of the Earth)

ভূপৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়। এর আকৃতি, প্রকৃতি এবং গঠনগত বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ভূমির এই আকৃতি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যকেই ভূমিরূপ বলে। ভূপৃষ্ঠের কোথাও রয়েছে উঁচু পর্বত, কোথাও সমতল, কোথাও পাহাড় এবং কোথাও মালভূমি। এছাড়া বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা, বন্ধুরতা এবং ঢালের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচার করলে পৃথিবীর সমগ্র ভূমিরূপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো– (১) পর্বত, (২) মালভূমি ও (৩) সমভূমি।

পর্বত (Mountains)

সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১,০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। সাধারণত ৬০০ থেকে ১,০০০ মিটার উঁচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে। পর্বতের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার হতে পারে। পর্বতের ভূপ্রকৃতি বন্ধুর, ঢাল খুব খাড়া এবং সাধারণত চূড়াবিশিষ্ট হয়। কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। যেমন– পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো। আবার কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। যেমন– হিমালয় পর্বতমালা।

পর্বতের প্রকারভেদ (Classification of mountains)

উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতির ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত চার প্রকার। যথা–

(ক) ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountains)

(খ) আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountains)

(গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত (Fault-block Mountains)

(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত (Dome/Laccolith Mountains)

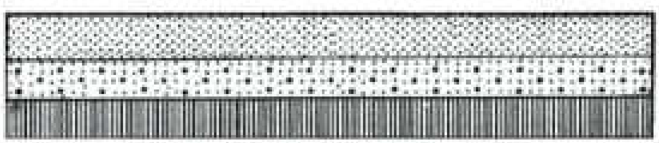

ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির পূর্বে ভূমিখণ্ড

(ক) ভঙ্গিল পর্বত : ভঙ্গ বা ভাঁজ থেকে ভঙ্গিল শব্দটির উৎপত্তি। কোমল পাললিক শিলায় ভাঁজ পড়ে যে পর্বত গঠিত হয়েছে তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে। এশিয়ার হিমালয়, ইউরোপের আল্পস, উত্তর

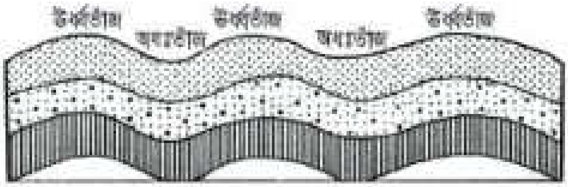

ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা

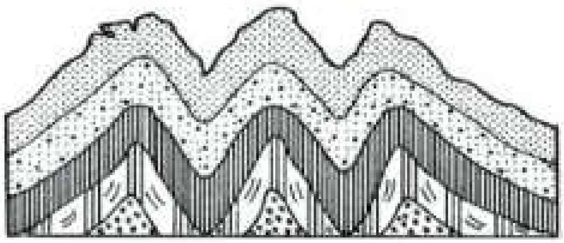

চিত্র ৪.১৩ : ভঙ্গিল পর্বত

আমেরিকার রকি এবং দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাঁজ। ভঙ্গিল পর্বত কীভাবে সৃষ্টি হয়? সমুদ্র তলদেশের বিস্তারিত অবনমিত স্থানে দীর্ঘকাল ধরে বিপুল পরিমাণ পলি এসে জমা হয়। এর চাপে অবনমিত স্থান আরও নিচে নেমে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে ভূআলোড়ন বা ভূমিকম্পের ফলে এবং পার্শ্ববর্তী সুদৃঢ় ভূমিখণ্ডের প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে ঊর্ধ্বভাঁজ ও নিম্নভাঁজের সৃষ্টি হয়। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ সমস্ত ঊর্ধ্ব ও অধঃভাঁজ সংবলিত ভূমিরূপ মিলেই ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয় (চিত্র ৪.১৩)।

কাজ : পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ভাঁজ পর্বতের তথ্য সংগ্রহ করে লেখ (দলগতভাবে)।

(খ) আগ্নেয় পর্বত : আগ্নেয়গিরি থেকে উদগিরিত পদার্থ সঞ্চিত ও জমাট বেঁধে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয় (চিত্র ৪.১৪)। একে সঞ্চয়জাত পর্বতও বলে। এই পর্বত সাধারণত মোচাকৃতির (Conical) হয়ে থাকে। আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ হলো– ইতালির ভিসুভিয়াস, কেনিয়ার কিলিমানজারো, জাপানের ফুজিয়ামা এবং ফিলিপাইনের পিনাটুবো পর্বত।

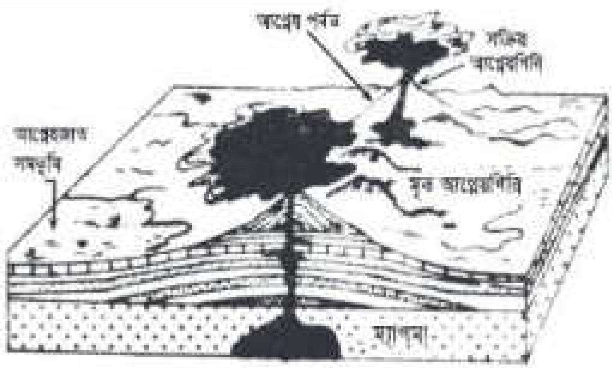

চিত্র ৪.১৪ : আগ্নেয় পর্বত

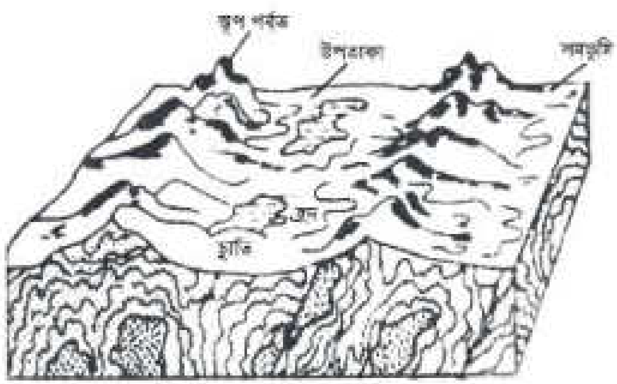

চিত্র ৪.১৫ : চ্যুতি-স্তূপ পর্বত

(গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত : ভূআলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে প্রসারণ এবং সংকোচনের সৃষ্টি হয়। এই প্রসারণ এবং সংকোচনের জন্য ভূত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এ ফাটল বরাবর ভূত্বক ক্রমে স্থানচ্যুত হয়। ভূগোলের ভাষায় একে চ্যুতি বলে। ভূত্বকের এ স্থানচ্যুতি কোথাও উপরের দিকে হয়, আবার কোথাও নিচের দিকে হয়। চ্যুতির ফলে উঁচু হওয়া অংশকে স্তূপ পর্বত বলে (চিত্র ৪.১৫)। ভারতের বিন্ধ্যা ও সাতপুরা পর্বত, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাকিস্তানের লবণ পর্বত চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।

(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত : পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় বাধা পেয়ে এগুলো ভূপৃষ্ঠের উপরে না এসে ভূত্বকের নিচে একস্থানে জমাট বাঁধে। ঊর্ধ্বমুখী চাপের কারণে স্ফীত হয়ে ভূত্বকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে (চিত্র ৪.১৬)। ঢাল সামান্য খাড়া স্বল্প অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত। এ পর্বতের কোনো শৃঙ্গ থাকে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডাকোটা প্রদেশের ব্ল্যাক হিলস এবং ইউটাহ্ প্রদেশের হেনরী পর্বত এর উদাহরণ।

চিত্র ৪.১৬ : ল্যাকোলিথ পর্বত

মালভূমি (Plateaus)

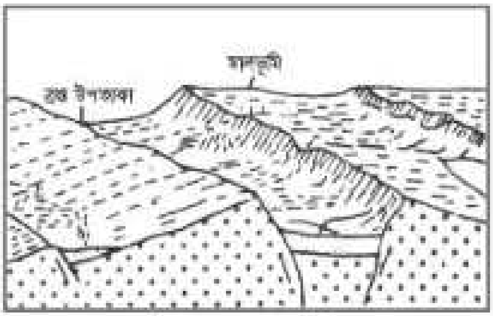

চিত্র ৪.১৭ : মালভূমি

পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে মালভূমি বলে (চিত্র ৪.১৭)।

মালভূমির উচ্চতা শত মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। পৃথিবীর বৃহত্তম মালভূমির উচ্চতা ৪,২৭০ থেকে ৫,১৯০ মিটার।

অবস্থানের ভিত্তিতে মালভূমি তিন ধরনের। যথা– (ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি (Intermontane Plateau), (খ) পাদদেশীয় মালভূমি (Piedmont Plateau) ও (গ) মহাদেশীয় মালভূমি (Continental Plateau)।

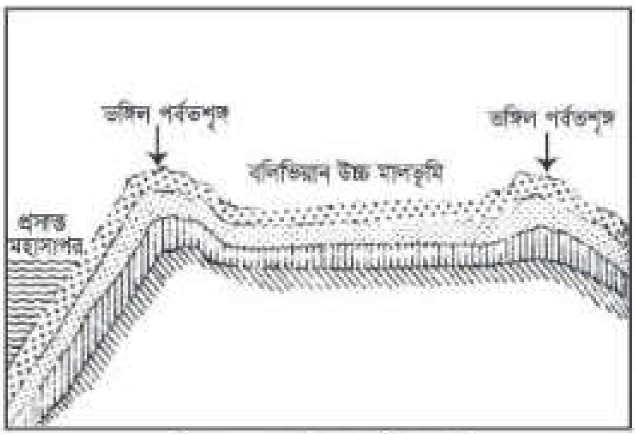

চিত্র ৪.১৮ : পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি

(ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি : এই মালভূমি পর্বতবেষ্টিত থাকে। তিব্বত মালভূমি একটি পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি, যার উত্তরে কুনলুন ও দক্ষিণে হিমালয় পর্বত এবং পূর্ব-পশ্চিমেও পর্বত ঘিরে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো এবং এশিয়ার মঙ্গোলিয়া ও তারিম এ ধরনের মালভূমি (চিত্র ৪.১৮)।

(খ) পাদদেশীয় মালভূমি : উচ্চ পর্বত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এর পাদদেশে তলানি জমে যে মালভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় মালভূমি বলে। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো এবং দক্ষিণ আমেরিকার পাতাগোনিয়া পাদদেশীয় মালভূমি।

(গ) মহাদেশীয় মালভূমি : সাগর বা নিম্নভূমি পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। এ ধরনের মালভূমির সঙ্গে পর্বতের কোনো সংযোগ থাকে না। স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, সৌদি আরব, গ্রিনল্যান্ড, এন্টার্কটিকা এবং ভারতীয় উপদ্বীপ এর অন্যতম উদাহরণ।

সমভূমি (Plains)

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন– নদী, হিমবাহ ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয়ক্রিয়ার ফলে সমভূমির সৃষ্টি হয়। মৃদু ঢাল ও স্বল্প বন্ধুরতার জন্য সমভূমি কৃষিকাজ, বসবাস ও রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য খুবই উপযোগী। তাই সমভূমিতে সবচেয়ে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

উৎপত্তির ধরনের ভিত্তিতে সমভূমিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ক্ষয়জাত সমভূমি ও সঞ্চয়জাত সমভূমি।

ক্ষয়জাত সমভূমি (Erosional plains) : বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির যেমন– নদীপ্রবাহ, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে কোনো উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্ষয়জাত সমভূমির সৃষ্টি হয়। আপালেশিয়ান পাদদেশীয় সমভূমি, ইউরোপের ফিনল্যান্ড ও সাইবেরিয়া সমভূমি এ ধরনের ক্ষয়জাত সমভূমি। বাংলাদেশের মধুপুরের চত্বর ও বরেন্দ্রভূমি ক্ষয়জাত সমভূমির উদাহরণ।

সঞ্চয়জাত সমভূমি (Depositional plains) : নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা পলি, বালুকণা, ধূলিকণা কোনো নিম্ন অঞ্চলে সঞ্চিত হয়ে কালক্রমে যে সমভূমি সৃষ্টি হয় তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। এ ধরনের সঞ্চয়জাত সমভূমি পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু করে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত যে কোনো অবস্থানে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন– নদীর পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে সৃষ্ট প্লাবন সমভূমি, নদীর মোহনার কাছাকাছি এসে নদী সঞ্চয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ব-দ্বীপ এবং শীতপ্রধান এলাকায় হিমবাহের গ্রাবরেখা দ্বারা সঞ্চয়কৃত পলি থেকে গড়ে ওঠা হিমবাহ সমভূমি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোনটি থেকে গ্রাফাইট উৎপন্ন হয়?

(ক) চুনাপাথর (খ) কয়লা

(গ) বেলেপাথর (ঘ) গ্রানাইট

২। নিম্নগতিতে নদীর–

i. স্রোতের গতি বেড়ে যায়

ii. গভীরতা কমে যায়

iii. পার্শ্বক্ষয় হ্রাস পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্র দুটি পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

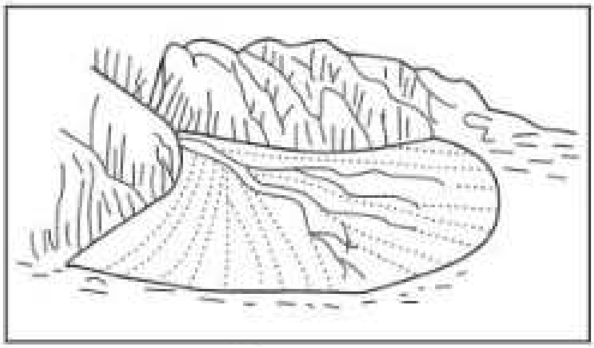

চিত্র ১

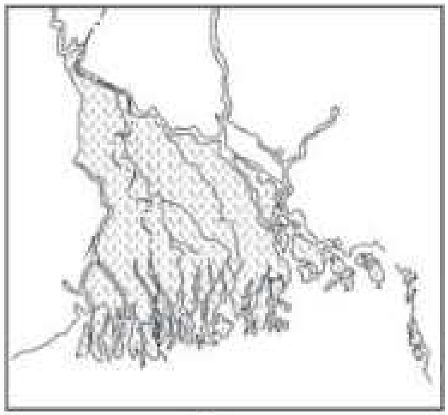

চিত্র ২

৩। চিত্র ১-এর ভূমিরূপ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে দেখা যায়?

(ক) দক্ষিণ-পূর্ব (খ) দক্ষিণ-পশ্চিম

(গ) উত্তর-পশ্চিম (ঘ) উত্তর-পূর্ব

৪। চিত্র ১ ও চিত্র ২ উভয়ের ভূমি গঠিত হয়–

i. পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে

ii. নদীর মোহনায়

iii. ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বিধান ও হিমেল কর্মসংস্থানের উদ্দেশে ইতালি গেলেন। একদিন বিকেলে তারা ঘুরতে গিয়ে দেখতে পান একটি স্থানের ভূমি খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং দেখতে অনেকটা মোচাকৃতির। কথা প্রসঙ্গে তারা জানতে পারেন বিধানের বাড়ি বাংলাদেশের বান্দরবানে এবং হিমেলের বাড়ি খুলনায়।

ক. নদী উপত্যকা কাকে বলে?

খ. ঊর্ধ্বগতিতে নদী উপত্যকা 'ভি' আকৃতির হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. বিধান ও হিমেলের দেখা ভূমিরূপটির ভূপ্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তাদের উভয়ের বাড়ি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই অঞ্চল দুটির ভূমির গঠন বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২।

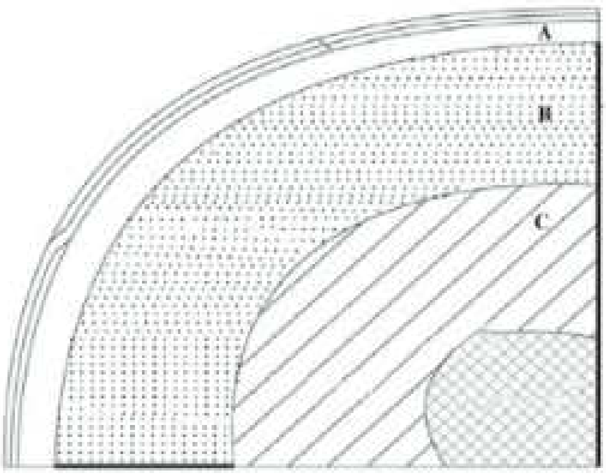

ক. খনিজ কী?

খ. পাললিক শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উপরের চিত্রে 'A' চিহ্নিত স্তরের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরের চিত্রে 'B' ও 'C' স্তরের গঠন বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা আছে কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২০২১

পঞ্চম অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

Atmosphere

আমরা জানতে পেরেছি এখন পর্যন্ত মহাকাশে অবিষ্কৃত সৌরজগতের বাসযোগ্য আদর্শ গ্রহটি হচ্ছে পৃথিবী। ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জীবজগতের প্রাণ ধারণের প্রয়োজনীয় বায়ুর উপাদান বেষ্টিত রয়েছে। এটাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি। এই বায়ুর উপাদানসমূহ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত হয়ে অবস্থান করছে। এগুলো পৃথিবীর মানুষ ও অন্যান্য জীবজগতের জন্য কত দরকার, তা আমরা জানার ও বোঝার চেষ্টা করব।

বায়ুমণ্ডল

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারব;
- বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারব;
- জলবায়ুর নিয়ামক বর্ণনা করতে পারব;
- বায়ুপ্রবাহ ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- পানিচক্র ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকারের বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাব্য যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থান, জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।

বায়ুমণ্ডলের গঠন উপাদান (Composition of the Atmosphere)

জীবন ধারণের জন্য পৃথিবীর জীবকুলের কাছে যেসব জিনিস অপরিহার্য বায়ুমণ্ডল তাদের মধ্যে অন্যতম। যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বলে বায়ুমণ্ডল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলও ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জড়িয়ে থেকে অনবরত আবর্তন করছে। বায়ুমণ্ডলের বর্ণ, গন্ধ, আকার কিছুই নেই। তাই একে খালি চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। বায়ুমণ্ডলের বিশালতা এবং এর ক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের গবেষণা নিরন্তর চলছে। বিভিন্ন উপগ্রহ ও গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের ব্যাপ্তি যত বিশাল হোক না কেন, এর প্রায় ৯৭ ভাগ উপাদানই ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই মানুষ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর উপর এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বায়ুমণ্ডল প্রধানত তিন প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন– বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, জলীয়বাষ্প এবং ধূলিকণা ও কণিকা (সারণি ১)।

সারণি ১ : বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আরগন (Ar)	০.৮০
কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)	০.০৩
অন্য গ্যাসসমূহ (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, ওজোন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড)	০.০২
জলীয়বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১
	মোট ১০০.০০

বায়ুমণ্ডল নানাপ্রকার গ্যাস ও বাষ্পের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর প্রধান উপাদান দুটি– নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলে আয়তনের দিক থেকে এ দুটি গ্যাস একত্রে শতকরা ৯৮.৭৩ ভাগ এবং বাকি শতকরা ১.২৭ ভাগ অন্যান্য গ্যাস, জলীয়বাষ্প ও কণিকাসমূহ জায়গা জুড়ে আছে। জীবজগৎ পরস্পর অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের গ্রহণ ও ত্যাগের মাধ্যমে বেঁচে আছে। ওজোন গ্যাসের স্তর সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মিকে শোষণ করে জীবজগৎকে রক্ষা করে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য (Atmospheric Layers and Characteristics)

বায়ুমণ্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উষ্ণতার পার্থক্য অনুসারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা– ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, তাপমণ্ডল ও এক্সোমণ্ডল (চিত্র ৫.১)। উল্লিখিত স্তরগুলোর প্রথম তিনটি সমমণ্ডল (Homosphere) এবং পরবর্তী দুটি বিষমমণ্ডল (Hetrosphere)-এর অন্তর্ভুক্ত।

ট্রপোমণ্ডল (Troposphere)

এই স্তরটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর, ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেগে আছে। মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, শিশির ও কুয়াশা সবকিছুই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। ট্রপোমণ্ডলের শেষ প্রান্তের অংশের নাম ট্রপোবিরতি (Tropopause)। এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬–১৯ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

ট্রপোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Troposphere)

(ক) ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব ও উষ্ণতা কমতে থাকে। সাধারণভাবে প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় ৬.৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

(খ) উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়।

(গ) নিচের দিকের বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে।

(ঘ) ধূলিকণার অবস্থানের ফলে সমগ্র বায়ুমণ্ডলের ওজনের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ এই স্তর বহন করে।

(ঙ) যে উচ্চতায় তাপমাত্রা কমা বন্ধ হয়ে যায় তাকে ট্রপোবিরতি বলে। এখানে তাপমাত্রা –৫৪° সেলসিয়াসের নিচে হতে পারে।

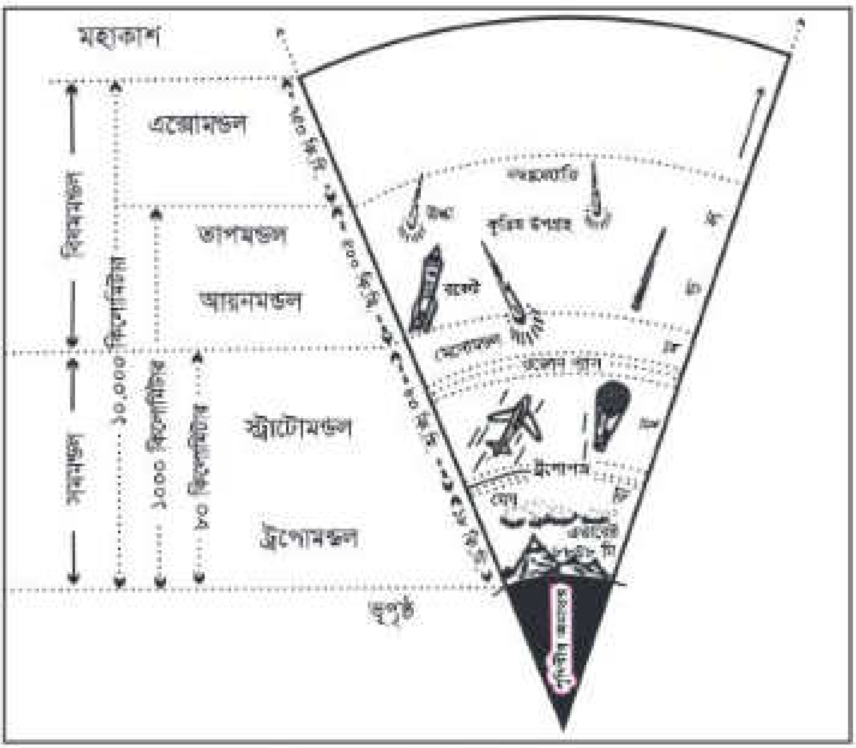

চিত্র ৫.১ : বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস

স্ট্রাটোমণ্ডল (Stratosphere)

ট্রপোবিরতির উপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্রাটোমণ্ডল নামে পরিচিত। স্ট্রাটোমণ্ডল ও মেসোমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রার স্থিতাবস্থাকে স্ট্রাটোবিরতি (Stratopause) বলে।

স্ট্রাটোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Stratosphere)

(ক) এই স্তরেই ওজোন (O_3) গ্যাসের স্তর বেশি পরিমাণে আছে। এ ওজোন স্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolate rays) শুষে নেয়। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা ৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

(খ) এই স্তরের বায়ুতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোনোরকম জলীয়বাষ্প থাকে না। ফলে আবহাওয়া থাকে শান্ত ও শুষ্ক। ঝড়বৃষ্টি থাকে না বলেই এই স্তরের মধ্য দিয়ে সাধারণত জেট বিমানগুলো চলাচল করে।

(গ) প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় তাপমাত্রা পুনরায় হ্রাস পেতে শুরু করে। এটি স্ট্রাটোমণ্ডলের শেষ প্রান্ত নির্ধারণ করে।

মেসোমণ্ডল (Mesosphere)

স্ট্রাটোবিরতির উপরে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে মেসোমণ্ডল বলে। এই স্তরের উপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়। এই স্তরকে মেসোবিরতি (Mesopause) বলে।

মেসোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Mesosphere)

(ক) এই স্তরে ট্রপোমণ্ডলের মতোই উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমতে থাকে। যা −৮৩° সেলসিয়াস পর্যন্ত নিচে নেমে যায়। মেসোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে শীতলতম তাপমাত্রা ধারণ করে।

(খ) মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলোর অধিকাংশই এই স্তরের মধ্যে এসে পুড়ে যায়।

তাপমণ্ডল (Thermosphere)

মেসোবিরতির উপরে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে তাপমণ্ডল বলে। এই মণ্ডলে বায়ুস্তর অত্যন্ত হালকা ও চাপ ক্ষীণ। তাপমণ্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমণ্ডল (Ionosphere) বলে।

তাপমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Thermosphere)

(ক) এই স্তরে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮০° সেলসিয়াসে পৌঁছায়।

(খ) তাপমণ্ডলের উপরের স্তরে তাপমাত্রার পরিমাণ প্রায় স্থির থাকে।

(গ) তীব্র সৌর বিকিরণে রঞ্জন রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়।

(ঘ) ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বিভিন্ন বেতারতরঙ্গ আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

এক্সোমণ্ডল (Exosphere)

তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোমণ্ডল বলে। এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

এক্সোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Exosphere)

(ক) এক্সোমণ্ডল, তাপমণ্ডল অতিক্রম করে ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এটি ক্রমান্বয়ে আন্তগ্রহ স্থান (Interplanetary Space) এ প্রবেশ করে।

(খ) এ স্তরের তাপমাত্রা প্রায় ৩০০° সেলসিয়াস থেকে ১৬৫০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়।

(গ) এ স্তরে খুব সামান্য পরিমাণ গ্যাস যেমন– অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং হিলিয়াম ধারণ করে, কেননা মাধ্যাকর্ষণের ঘাটতির কারণে গ্যাস অণু বা কণাগুলো সহজে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

কাজ : নিচের ছকটিতে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্যগুলো দলে কাজ করে লেখ।

ট্রপোমণ্ডল	স্ট্রাটোমণ্ডল	মেসোমণ্ডল	তাপমণ্ডল	এক্সোমণ্ডল

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব (Importance of Different Atmospheric Layers)

- বায়ুমণ্ডল ছাড়া যেমন কোনো শব্দতরঙ্গ স্থানান্তরিত হয় না, তেমনি ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতারতরঙ্গ আয়নস্তরে বাধা পেয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
- ট্রপোমণ্ডল ছাড়া কোনো আবহাওয়ারও সৃষ্টি হতো না; বরফ জমত না; মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির, তুষার, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির সৃষ্টি হতো না। শস্য ও বনভূমির জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হতো না।
- পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলীয় স্তর থাকায় এর দিকে আগত উল্কাপিণ্ড অধিক পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়। ওজোন স্তর না থাকলে সূর্য থেকে মারাত্মক অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে প্রাণিকুল বিনষ্ট করত।
- বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ না থাকলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব থাকত না, বরং পৃথিবীর উপরিভাগ চাঁদের মতো মরুময় হতো।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান (Elements of Weather and Climate)

আমরা পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন ও ইন্টারনেট থেকে প্রতিদিন আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহ করে থাকি। আবহাওয়া মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশের আবহাওয়া অফিস এ সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য প্রচার মাধ্যমে প্রতিদিন সরবরাহ করছে। আবহাওয়া অফিসগুলোতে দিনের পর দিন আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদান পর্যবেক্ষণ করে জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা করা হয়। যে কোনো স্থানের আবহাওয়ার উপাদানগুলো নিত্য পরিবর্তনশীল। আবার পৃথিবীর সব স্থানের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য একরকম নয়।

কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন সামগ্রিক অবস্থাকে সেই দিনের আবহাওয়া বলে। কোনো একটি অঞ্চলের সাধারণত ৩০–৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে। কাজেই জলবায়ু হলো কোনো একটি অঞ্চলের অনেক দিনের বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের সামগ্রিক অবস্থা।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানগুলো হলো বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা ও বারিপাত।

জলবায়ুর নিয়ামক (Factors of Climate)

পৃথিবীর সব অঞ্চলের জলবায়ু একই রকম নয়। এর কোনো অঞ্চল উষ্ণ এবং কোনো অঞ্চল শীতল। আবার কোনো স্থান বৃষ্টিবহুল এবং কোনো স্থান বৃষ্টিহীন। কিছু ভৌগোলিক বিষয়ের পার্থক্যের কারণে স্থানভেদে জলবায়ুর এরকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়গুলোকে জলবায়ুর নিয়ামক বলে। বিভিন্ন নিয়ামকের বিবরণ ও জলবায়ুর উপাদানের উপর তাদের প্রভাব বর্ণনা করা হলো :

১। অক্ষাংশ (Latitude) : সূর্যকিরণের মাত্রা অক্ষাংশভেদে বিভিন্ন রকম হয়। নিরক্ষরেখার উপর সারাবছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। আর নিরক্ষরেখা থেকে যতই উত্তর বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পড়তে থাকে। এর ফলে নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুর দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে।

২। উচ্চতা (Altitude) : সমুদ্র সমতল থেকে যতই উপরে ওঠা যায়, উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা ততই হ্রাস পায়। সাধারণত প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় প্রায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এ উচ্চতার পার্থক্যের কারণে দুই জায়গা একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অপরটির চেয়ে ভিন্ন জলবায়ু ধারণ করে। যেমন– দিনাজপুর ও শিলং একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু উচ্চতার তারতম্যের জন্য এদের জলবায়ু ভিন্ন রকম। উচ্চতা বেশি হওয়াতে শিলং-এ দিনাজপুরের চেয়ে তাপমাত্রা কম হয়।

৩। সমুদ্র থেকে দূরত্ব (Distance from the sea) : জলভাগের অবস্থান কোনো এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে। যেমন– কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানকার জলবায়ু রাজশাহীর তুলনায় বেশ মৃদুভাবাপন্ন। সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকার তাপমাত্রায় শীত-গ্রীষ্ম তেমন পার্থক্য হয় না। এ ধরনের জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে। কিন্তু সমুদ্র উপকূল থেকে দূরের এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই চরম হয়। কারণ স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা যেমন দ্রুত উষ্ণ হয়, আবার দ্রুত ঠান্ডাও হয়। এজন্য গ্রীষ্মকালে মহাদেশের অভ্যন্তরভাগের এলাকা অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে, আবার শীতকালে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়। এ ধরনের জলবায়ুকে মহাদেশীয় বা চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে।

৪। বায়ুপ্রবাহ (Wind movement) : বায়ুপ্রবাহ কোনো এলাকার জলবায়ুর উপরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু কোনো এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন– বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার শীতকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে শুষ্ক মহাদেশীয় বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে।

৫। সমুদ্রস্রোত (Ocean currents) : শীতল বা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকার বায়ু ঠান্ডা বা উষ্ণ হয়। যেমন– উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। আবার শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলকে শীতল রাখে।

৬। পর্বতের অবস্থান (Location of the mountains) : উচ্চ পার্বত্যময় এলাকা বায়ুপ্রবাহের পথে বাধা হলে এর প্রভাব জলবায়ুর উপর পরিলক্ষিত হয়। যেমন– মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উত্তরে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত হিমালয় পর্বতে বাধা পাওয়ায় বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে শীতকালে মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ু হিমালয় অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের জলবায়ু ইউরোপের মতো তত শীতল হয় না।

৭। ভূমির ঢাল (Slope of the land) : সূর্যকিরণ উঁচুভূমির ঢাল বরাবর লম্বভাবে পতিত হলে সেখানকার বায়ু এবং ভূমি বেশি উত্তপ্ত হয়। কিন্তু ঢালের বিপরীত দিকে সূর্যকিরণ কিছুটা তির্যকভাবে পড়ে বা কখনো সূর্যালোক খুব কম পায় ফলে বায়ু শীতল হয়।

৮। মৃত্তিকার গঠন (Composition of the soil) : মৃত্তিকার গঠন বা বুনট সূর্যতাপ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রস্তর বা বালুকাময় মৃত্তিকার তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতা কম। এজন্য তা দ্রুত উত্তপ্ত এবং দ্রুত শীতল হয়। যেমন– মরুভূমিতে দিনে প্রচণ্ড গরম এবং রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা।

৯। বনভূমির অবস্থান (Location of the forest) : গাছপালা থেকে প্রস্বেদন (Transpiration) ও বাষ্পীভবনের (Evaporation) সাহায্যে বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তাছাড়া বনভূমি ঝড়-তুফান ও সাইক্লোনের গতিপথে বাধা দিয়ে এর শক্তি কমিয়ে দেয়। বনভূমিতে সূর্যালোক মাটিতে পৌঁছতে পারে না, ফলে সেখানকার বায়ু তুলনামূলকভাবে শীতল হয়।

> কাজ : বাংলাদেশের জলবায়ুর ক্ষেত্রে কোন কোন নিয়ামকসমূহ কীভাবে প্রভাব রাখছে? তা দলে মাথা খাটিয়ে (Brain storming) ব্যাখ্যা কর। প্রত্যেক দল ১৫ মিনিট কাজ করবে এবং দলে কাজ সম্পাদন শেষে সমগ্র দল শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট সময় পাবে।

পানিচক্র (Hydrological Cycle)

সাধারণভাবে পানি কোথাও স্থির অবস্থায় নেই, বিভিন্নভাবে সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে এবং অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। কারণ পানি বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন এ তিন অবস্থায় থাকতে পারে। সমগ্র বিশ্বের পানি সরবরাহের সর্ববৃহৎ ও স্থায়ী আধার হচ্ছে সমুদ্র। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে বাষ্পাকারে উপরে ওঠে এবং সুবিশাল বায়ুমন্ডলে মিশে যায়। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদনের মাধ্যমে জলীয় অংশ বায়ুমন্ডলে সম্পৃক্ত হয়। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, কুয়াশা, তুষার, বরফ প্রভৃতিতে পরিণত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বিভিন্ন উপায়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত

পানির কিছু অংশ বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়, কিছু অংশ নদী দ্বারা বাহিত হয়ে (Run off) সমুদ্রে পতিত হয়, কিছু অংশ উদ্ভিদ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় (Osmosis) গ্রহণ করে এবং অবশিষ্টাংশ ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের মধ্যে চুয়ে (Percolation) প্রবেশ করে। এভাবেই প্রকৃতিতে পানিচক্র চলতে থাকে (চিত্র ৫.২)।

চিত্র ৫.২ : পানিচক্র

পানিচক্রের প্রক্রিয়াগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

১। বাষ্পীভবন (Evaporation) : সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতি থেকে পানি ক্রমাগত বাষ্পে পরিণত হচ্ছে এবং তা অপেক্ষাকৃত হালকা বলে উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলে মিশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একে বাষ্পীভবন বলে। বায়ুর বাষ্প ধারণ করার একটা সীমা আছে। তা বায়ুর উষ্ণতার উপর নির্ভর করে। বায়ু যত উষ্ণ হয়, তত বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। সমুদ্রই জলীয়বাষ্পের প্রধান উৎস। উদ্ভিদজগৎ, নদ-নদী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় থেকেও বায়ু জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে থাকে।

২। ঘনীভবন (Condensation) : পরিপৃক্ত বায়ু উষ্ণতর হলে তখন এটি আরও বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। আবার বায়ু শীতল হতে থাকলে পূর্বের মতো বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করে রাখতে পারে না, তখন জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ পানিতে পরিণত হয়, তাকে ঘনীভবন বলে।

বায়ু নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। কিন্তু বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্প বায়ুতে থাকলে বায়ু আর অধিক জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না। তখন তাকে সম্পৃক্ত বা পরিপৃক্ত বায়ু (Saturated air) বলে।

বায়ু যে উষ্ণতায় (জলীয়বাষ্পরূপে) ঘনীভূত হয় তাকে শিশিরাঙ্ক (Dew point) বলে। তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াস বা হিমাঙ্কের (Freezing point) নিচে নেমে গেলে তখন ঘনীভূত জলীয়বাষ্প কঠিন আকার ধারণ করে এবং তুষার ও বরফরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। কিন্তু হিমাঙ্ক শিশিরাঙ্কের উপরে থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির, কুয়াশা অথবা বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity) : জলীয়বাষ্প বায়ুর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করাকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগেরও কম। বায়ুতে জলীয়বাষ্প যখন একদম থাকে না, তাকে শুষ্ক বায়ু বলে। যে বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে, তাকে আর্দ্র বায়ু বলে। আর্দ্র বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ থাকে প্রায় শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ। বায়ুর আর্দ্রতা হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। বায়ুর আর্দ্রতা দু'ভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা– পরম আর্দ্রতা (Absolute humidity) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative humidity)।

কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আর্দ্রতা বলে। অপরদিকে, কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ আর একই আয়তনের বায়ুকে একই উষ্ণতায় পরিপৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্পের প্রয়োজন এ দুটির অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।

৩। **বারিপাত (Precipitation) :** জলীয়বাষ্প উপরে উঠে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ও তুষারকণায় পরিণত হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে বারিপাত বলে। সকল প্রকার বারিপাত এই জলীয়বাষ্পের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতি অনুযায়ী বারিপাত বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা– তুষার, তুহিন, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি।

শিশির (Dew) : ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণের মাধ্যমে রাতে শীতল হয়। এ সময় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র জলবিন্দুরূপে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়। এটাই শিশির নামে পরিচিত।

কুয়াশা (Fog) : কখনো কখনো বায়ুমণ্ডলের ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জলীয়বাষ্প রাত্রিবেলায় অল্প ঘনীভূত হয়ে ধোঁয়ার আকারে ভূপৃষ্ঠের কিছু উপরে ভাসতে থাকে। একে কুয়াশা বলে।

তুষারপাত (Snow fall) : শীতপ্রধান এলাকায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নামলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পেঁজা তুলার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে তুষারপাত বলে।

৪। **পানিপ্রবাহ (Run off) :** বারিপাতের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে আগত পৃষ্ঠপ্রবাহ পানিরূপে নদী, হ্রদ ও সমুদ্রে পতিত হয়। আবার ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করে অন্তঃপ্রবাহরূপে নদী ও সমুদ্রে জমা হয়। পানির কিছু অংশ ভূগর্ভে জমা হয়। পানিপ্রবাহকে আবার কতকগুলো ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) পৃষ্ঠপ্রবাহ (Surface flow) (খ) অন্তঃপ্রবাহ (Subsurface flow)

(গ) চুয়ানো (Percolation) (ঘ) পরিস্রবণ (Infiltration)

ভূঅভ্যন্তরস্থ পানি পুনরায় প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বায়ুতে ফিরে আসে।

কাজ : নিচের শব্দগুলো দিয়ে কী বোঝায়? তা দলে আলোচনা করে ছকে উল্লেখ কর।			
বাষ্পীভবন	ঘনীভবন	বারিপাত	পৃষ্ঠপ্রবাহ

বৃষ্টিপাত (Rainfall)

স্বাভাবিকভাবে ভাসমান মেঘ ঘনীভূত হয়ে পানির ফোঁটা ফোঁটা আকারে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তাকে বৃষ্টিপাত বলে। এই বৃষ্টিপাত কখনো প্রবল এবং কখনো গুঁড়ি গুঁড়ি আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বৃষ্টিপাত বৃষ্টিমাপক যন্ত্রের (Rain gauge) দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

বৃষ্টিপাতের কারণ (Causes of Raifall) : সূর্যের উত্তাপে সৃষ্ট জলীয়বাষ্প উপরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এলে সহজেই তা পরিপৃক্ত হয়। পরে ঐ পরিপৃক্ত বায়ু অতি ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়ে বায়ুমন্ডলের ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জমাট বেঁধে মেঘের আকারে আকাশে ভাসতে থাকে। বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা কোনো কারণে আরও হ্রাস পেলে ঐ মেঘ ঘনীভূত হয়ে পানিবিন্দুতে অথবা বরফকুচিতে পরিণত হয় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তা ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। এভাবে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সুতরাং বৃষ্টিপাতের কারণ হলো– (১) বাতাসে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতি, (২) ঊর্ধ্ব গমন এবং (৩) বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা হ্রাস পাওয়া।

বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Rainfall) : জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু যে কারণে উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাতে পরিণত হয়। সেই অনুসারে বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাজন করা হয়ে থাকে। বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুসারে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতকে প্রধানত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা– (১) পরিচলন বৃষ্টি, (২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, (৩) বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি ও (৪) ঘূর্ণি বৃষ্টি।

(১) পরিচলন বৃষ্টি (Convectional Rain) : দিনের বেলায় সূর্যের কিরণে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে সোজা উপরে উঠে যায় এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঐ জলীয়বাষ্প প্রথমে মেঘ ও পরে বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে সোজাসুজি নিচে নেমে আসে। এরূপ বৃষ্টিপাতকে পরিচলন বৃষ্টি বলে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে (Equatorial region) স্থলভাগের চেয়ে জলভাগের বিস্তৃতি বেশি এবং এখানে সূর্যকিরণ সারাবছর লম্বভাবে পড়ে। এ দুটি কারণে এখানকার বায়ুমন্ডলে সারাবছর জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। জলীয়বাষ্প হালকা বলে সহজেই তা উপরে উঠে গিয়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে পরিচলন বৃষ্টিরূপে ঝরে পড়ে। তাই নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর প্রতিদিনই বিকেল অথবা সন্ধ্যার সময় এরূপ বৃষ্টিপাত হয়। নাতিশীতোষ্ণমন্ডলে গ্রীষ্মকালের শুরুতে পরিচলন বৃষ্টি হয়ে থাকে। এ সময়ে এই অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ যথেষ্ট উত্তপ্ত হলেও উপরের বায়ুমন্ডল বেশ শীতল থাকে। ফলে ভূপৃষ্ঠের জলাশয়গুলো থেকে পানি বাষ্পে পরিণত হয়ে সোজা উপরে উঠে যায় এবং শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে পরিচলন বৃষ্টিরূপে পতিত হয় (চিত্র ৫.৩)।

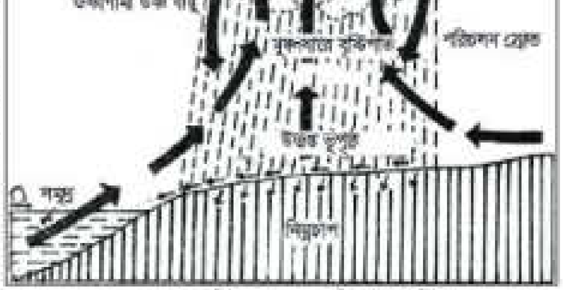

চিত্র ৫.৩ : পরিচলন বৃষ্টি

পরিচলন বৃষ্টি নিম্নলিখিত পর্যায় অনুসরণ করে ঘটে থাকে :

- প্রচণ্ড সূর্যকিরণে ভূপৃষ্ঠ দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
- ভূপৃষ্ঠের উপরস্থ বায়ু উষ্ণ এবং হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে পরিচলনের সৃষ্টি করে।
- ঊর্ধ্বমুখী বায়ু শুষ্ক রুদ্ধ তাপ হ্রাস হারে শীতল হতে থাকে এবং বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে ঘনীভবন হয়।
- ঘনীভবনের ফলে মেঘ উপরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে বজ্রোপুঞ্জ মেঘের সৃষ্টি করে। এ ধরনের মেঘ থেকে ঝড়সহ মুষলধারে বৃষ্টি এবং কখনো কখনো শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়ে থাকে।

(২) শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি (Orographic Rain) : জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় যদি গমনপথে কোনো উঁচু পর্বতশ্রেণিতে বাধা পায়, তাহলে ঐ বায়ু উপরের দিকে উঠে যায়। তখন জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ক্রমশ প্রসারিত হয় এবং পর্বতের উঁচু অংশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে (Windward slope) বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে (চিত্র ৫.৪)।

চিত্র ৫.৪ : শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি

পর্বত অতিক্রম করে ঐ বায়ু যখন পর্বতের অপর পার্শ্বে অর্থাৎ অনুবাত ঢালে (Leeward slope) এসে পৌঁছায়, তখন জলীয়বাষ্প কমে যায়। এছাড়া নিচে নামার ফলে ঐ বায়ু উষ্ণ ও আরও শুষ্ক হয়। এ দুটো কারণে এখানে বৃষ্টি বিশেষ হয় না। এরূপ প্রায় বৃষ্টিহীন স্থানকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rain-shadow region) বলে।

> জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু হিমালয় পর্বতে বাধা পেয়ে আসাতে প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু তার উত্তর দিকে অবস্থিত তিব্বতের মালভূমিকে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বলে। যেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশ কম।

(৩) বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি (Frontal Rain) : শীতল ও উষ্ণ বায়ু মুখোমুখি উপস্থিত হলে উষ্ণ বায়ু এবং শীতল বায়ু একে অপরের সঙ্গে মিশে না গিয়ে তাদের মধ্যবর্তী এলাকায় অদৃশ্য বায়ুপ্রাচীরের (Front) সৃষ্টি করে। বায়ুপ্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় ফলে শিশিরাঙ্কের সৃষ্টি হয়। ফলে উভয় বায়ুর সংযোগস্থলে বৃষ্টিপাত ঘটে, একে বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি বলে (চিত্র ৫.৫)। এ প্রকার বৃষ্টিপাত সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়।

চিত্র ৫.৫ : বায়ুপ্রাচীরজনিত বৃষ্টি

(৪) ঘূর্ণি বৃষ্টি (Cyclonic Rain) : কোনো অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হলে জলভাগের উপর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ এবং স্থলভাগের উপর থেকে শুষ্ক শীতল বায়ু ঐ একই নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে অনুভূমিকভাবে ছুটে আসে। শীতল বায়ু ভারী বলে উষ্ণ বায়ু শীতল বায়ুর উপর ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। জলভাগের উপর থেকে আসা উষ্ণ বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। ঐ বায়ু শীতল বায়ুর উপরে উঠলে তার ভিতরে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে ঘূর্ণি বৃষ্টি বলে (চিত্র ৫.৬)। এই বৃষ্টিপাত সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শীতকালে এরূপ বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়।

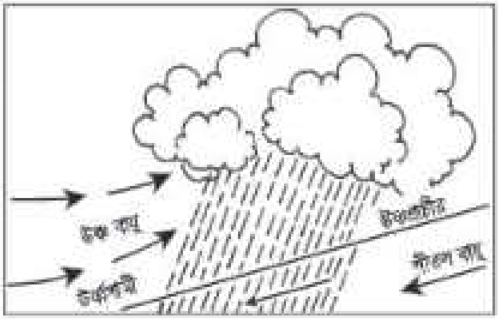

চিত্র ৫.৬ : ঘূর্ণি বৃষ্টি

> **কাজ :** বাংলাদেশে কী কী ধরনের বৃষ্টিপাত হয় এবং কেন হয়? তা ব্যাখ্যা কর। এ কাজটি শ্রেণিকক্ষে দলে আলোচনা করে সম্পাদন কর।

বায়ুপ্রবাহ (Movement of Wind)

বায়ুর তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। ভূপৃষ্ঠের সমান্তরাল বায়ু চলাচলকে বায়ুপ্রবাহ বলে। বায়ুপ্রবাহ সাধারণত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়।

> **চাপ বলয় (Pressure Belts) :** ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশের তাপের পার্থক্য এবং গোলাকার পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে বায়ুমণ্ডলে কয়েকটি চাপমণ্ডলের সৃষ্টি হয় : (১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়, (২) ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়, (৩) উপ-মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় এবং (৪) মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়।

১। নিম্নচাপমণ্ডলের উত্তপ্ত ও হালকা বায়ু ঊর্ধ্বে উত্থিত হলে বায়ুমণ্ডলে চাপের অসমতা সৃষ্টি হয়। এ কারণে উচ্চচাপমণ্ডল থেকে শীতল ও ভারী বায়ু সর্বদা নিম্নচাপমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়।

২। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তনশীল এবং নিরক্ষরেখা থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে আবর্তনের কারণে গতিবেগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এ উভয় কারণে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীপৃষ্ঠে গতিশীল পদার্থ (যেমন– বায়ুপ্রবাহ ও জলস্রোত) সরাসরি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত না হয়ে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। ফেরেলের সূত্র (Ferrel's Law) অনুসারে ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহের দিক নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিম্নে কয়েকটি বায়ুপ্রবাহ যেমন– নিয়ত বায়ু, সমুদ্র ও স্থলবায়ু ও মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা করা হলো।

নিয়ত বায়ু (Planetary Winds)

নিয়ত বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বছরের সকল সময় একই দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু তিন প্রকারের। যথা– অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু (চিত্র ৫.৭)।

অয়ন বায়ু (The Trade Winds) : নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে পরিচালিত বাণিজ্য জাহাজগুলো এ বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসরণে যাতায়াত করত বলে এগুলোকে অয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে এটি উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নামে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু ঘণ্টায় প্রায় ১৬ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু প্রায় ২২.৫৪ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়। উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হলে অত্যধিক তাপে উষ্ণ ও হালকা হয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায়। তখন নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর অনুভূমিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং নিরক্ষরেখার উভয়দিকে উত্তর-দক্ষিণে ৫° অক্ষাংশে পর্যন্ত একটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ বলয়কে নিরক্ষীয় শান্ত বলয় (Doldrum) বলে।

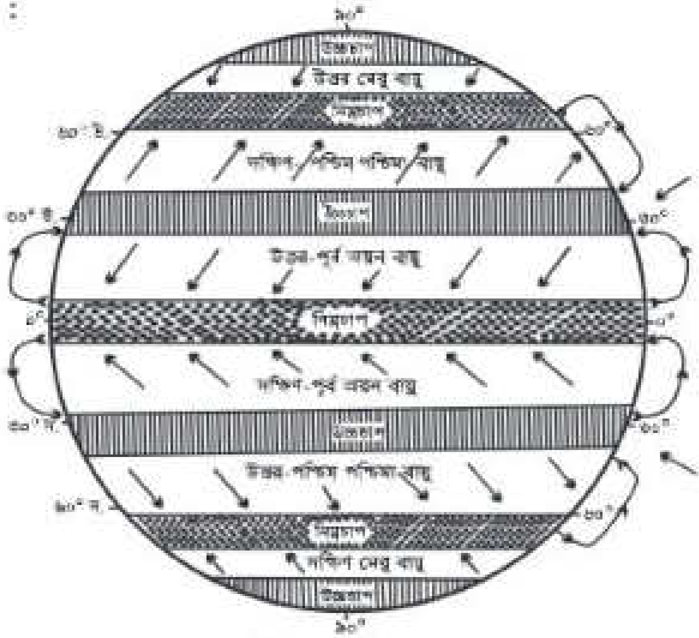

চিত্র ৫.৭ : নিয়ত বায়ু

পশ্চিমা বায়ু (The Westerlies) : কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে অয়ন বায়ু ব্যতীত আরও দুটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে এটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ুপ্রবাহকে পশ্চিমা বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের পরিমাণ অধিক বলে স্থানীয় কারণে পশ্চিমা বায়ুর সাময়িক বিরতি ঘটে। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগের পরিমাণ বেশি বলে পশ্চিমা বায়ু প্রবলবেগে এ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। এজন্য এই বায়ুপ্রবাহকে প্রবল পশ্চিমা বায়ু (Brave west winds) বলে। ৪০° থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশে পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সর্বাপেক্ষা বেশি। এ অঞ্চলকে গর্জনশীল চল্লিশ (Roaring forties) বলে।

নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের ন্যায় ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়েও দুটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়। ৩০° থেকে ৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় দুটি অবস্থিত। বায়ু নিম্নগামী বলে এই অঞ্চলে অনুভূমিক বায়ুপ্রবাহ অনুভব করা যায় না। প্রাচীনকালে যখন আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে জাহাজযোগে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় অশ্ব ও অন্যান্য পশু রপ্তানি করা হতো, তখন এ অঞ্চলে পৌঁছলে বায়ুপ্রবাহের অভাবে পালচালিত জাহাজের গতি মন্থর বা প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ত। এ অবস্থায় নাবিকগণ খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অনেক সময় তাদের অশ্বগুলো সমুদ্রে ফেলে দিত। এজন্য আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত

বলয়কে অশ্ব অক্ষাংশ (Horse latitude) বলে। উত্তর গোলার্ধে ৩০° থেকে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলটিতে শীতকালেও পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।

মেরু বায়ু (Polar Winds) : মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় থেকে অতি শীতল ও ভারী বায়ু উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এ প্রবাহদ্বয়কে উত্তর সুমেরু বায়ু ও দক্ষিণ কুমেরু বায়ু বলে।

সমুদ্র ও স্থলবায়ু (Sea and Land Breeze) : দিনের বেলায় স্থলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় বলে সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, কিন্তু জলভাগ বেশি উত্তপ্ত হয় না বলে সেখানকার বায়ু উচ্চচাপযুক্ত হয়। ফলে তখন জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে সমুদ্রবায়ু বলে (চিত্র ৫.৮)।

আবার রাত্রিকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বেশি শীতল বলে স্থলভাগের বায়ু উচ্চচাপযুক্ত হয়। তখন স্থলভাগ থেকে জলভাগ বা সমুদ্রের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। একে স্থলবায়ু বলে (চিত্র ৫.৯)। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থানের কারণে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু নিয়মিত প্রবাহিত হয়।

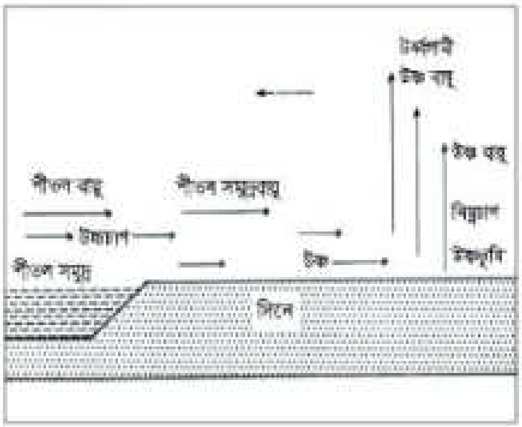

চিত্র ৫.৮ : সমুদ্রবায়ু

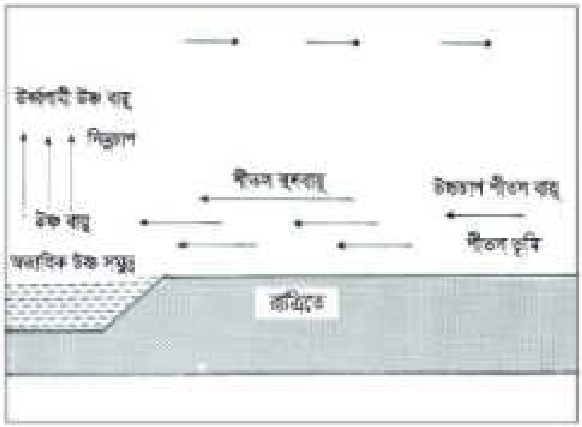

চিত্র ৫.৯ : স্থলবায়ু

মৌসুমি বায়ু (Monsoon Wind) : আরবি ভাষায় 'মওসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় তাকে মৌসুমি বায়ু বলে। সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের ফলে শীত-গ্রীষ্মে ঋতুভেদে স্থলভাগ ও জলভাগের তাপের তারতম্য ঘটে। সেজন্য মৌসুমি বায়ুর সৃষ্টি হয়। উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালে সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এর ফলে কর্কটক্রান্তি অঞ্চলের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি স্থানের স্থলভাগ অতিশয় উত্তপ্ত হয়। ফলে এ সকল অঞ্চলে বায়ুর চাপ কমে যায় এবং একটি সুবৃহৎ নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতিতে দক্ষিণ গোলার্ধের ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় থেকে আগত দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে এশিয়া মহাদেশের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে ছুটে যায়। এ বায়ুকে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু বলে। নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর গতি বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। এজন্য গ্রীষ্মের এ বায়ুকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বলে। গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু সমুদ্রের উপর দিয়ে আসে বলে এতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। এটি আরব সাগরীয় ও

বঙ্গোপসাগরীয় এ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। আরব সাগরীয় শাখা পাকিস্তান ও পশ্চিম ভারতে এবং বঙ্গোপসাগরীয় শাখা বাংলাদেশ, মিয়ানমার এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এছাড়া মধ্য-এশিয়ায় নিম্নচাপের দরুন প্রশান্ত মহাসাগর থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর উৎপত্তি হয়। ফলে কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, চীন ও জাপানে বৃষ্টিপাত ঘটে।

শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির নিকট অবস্থান করায় সেখানে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ অত্যন্ত শীতল হওয়ায় সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে স্থলভাগের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। এ বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে বলে একে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু বলে। স্থলভাগের উপর দিয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসে বলে এটা শুষ্ক। মৌসুমি বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায় এবং উত্তর-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুরূপে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়।

ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে ঋতু আশ্রয়ী বায়ু। এর মধ্যে রয়েছে মৌসুমি বায়ু। আরও রয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় বায়ু।

স্থানীয় বায়ু (Local Wind) : স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কিংবা তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে ভূপৃষ্ঠের স্থানে স্থানে স্থানীয় বায়ুর উৎপত্তি হয়। রকি পর্বতের চিনুক (Chinook), ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় মালভূমি থেকে প্রবাহিত মিস্ট্রাল (Mistral), আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের পম্পাস অঞ্চলের উত্তরে পাম্পেরু (Pampero), আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব উপকূলে বোরা (Bora), উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইতালিতে সিরক্কো (Sirocco), আরব মালভূমির সাইমুম (Simoom), মিসরের খামসিন (Khamsin) ও ভারতীয় উপমহাদেশের লু (Loo) কয়েকটি স্থানীয় বায়ুর উদাহরণ।

কাজ : নিম্নের বায়ুসমূহ কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়? তা নিয়ত বায়ুপ্রবাহ পাঠ করে উল্লেখ কর।

অয়ন বায়ু	পশ্চিমা বায়ু	মেরু বায়ু

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন (Global Warming and Climate Change)

বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global warming) বর্তমান পৃথিবীতে পরিবেশগত প্রধান সমস্যাসমূহের মধ্যে অন্যতম। বিশ্ব উষ্ণায়ন হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে জলবায়ু কখনো এক থাকেনি। কখনো খুব উষ্ণ ও শুষ্ক থেকেছে। কখনো শীতল হয়ে বরফে ঢেকেছে। কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে অনেক ধীর গতিতে। লক্ষ লক্ষ বছর লেগেছে এবং বলা হয়ে থাকে এই পরিবর্তন হয়েছে কিছু প্রাকৃতিক কারণে (যেমন– পৃথিবীর কক্ষপথ বা পৃথিবীর আবর্তনের পরিবর্তন)। তবে সমকালীন পরিবর্তন নিয়ে সবাই খুব চিন্তিত কারণ এ পরিবর্তন ঘটছে অতি দ্রুত এবং এই পরিবর্তনের একটি বড় কারণ হচ্ছে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের ক্রিয়া-কর্ম। একশত বছর পূর্বের গড় তাপমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.৬° সেলসিয়াস

তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীগণ কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ুগত পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ২১ শতকের সমাপ্তিকালের মধ্যে গড় তাপমাত্রা প্রায় আরও অতিরিক্ত ২.৫° থেকে ৫.৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা যুক্ত হতে পারে। এর ফলে পর্বতের উপরিভাগের জমাকৃত বরফ এবং মেরু অঞ্চলের হিমবাহের দ্রুত গলনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডল হলো গ্রিনহাউসের বা কাচ ঘরের কাচের দেয়াল বা ছাদের মতো। সূর্যের আলো পৃথিবীর সমস্ত তাপ ও শক্তির মূল উৎস। পৃথিবীতে আসা

চিত্র ৫.১০ : গ্রিনহাউস

সূর্যালোক ভূপৃষ্ঠ শোষণ করে ও বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত করে। মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন- কাঠ কয়লা পোড়ানো, গাছ কাটা, কলকারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ গ্যাসগুলোকে বলা হয় গ্রিনহাউস গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশ পুরু একটি (গ্রিনহাউস) গ্যাসের স্তর বা চাদর। এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ছেড়ে দেওয়া তাপ পুনরায় ফেরত যায় না। তাপ শোষণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশ উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে থাকছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির এই প্রক্রিয়াই হলো গ্রিনহাউস প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া। মেরু অঞ্চলে কাচের ঘরে সৌরতাপ আটকিয়ে সবজি চাষ করাকে গ্রিনহাউস বলে (চিত্র ৫.১০)।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ হিসেবে বলা হয় যে, মানুষের নেতিবাচক কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহের উপস্থিতির মাত্রার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যাকে আমরা গ্রিনহাউস প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করি। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসগুলো হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন। শিল্পায়ন, যানবাহনের সংখ্যাগত বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজাড় ও কৃষির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কারণে উল্লিখিত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত, ব্যাপক বন্যা, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি জলবায়ুগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন কৌশল পৃথিবী ও তার পরিবেশকে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের মতো দেশসমূহকে এর বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

কাজ : বিদ্যালয়ে অথবা বাড়িতে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে বিশ্বের জলবায়ুতে গ্রিনহাউসের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্যসমূহ উপস্থাপন কর।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বিশ্ব প্রেক্ষিত (Effect of climate change)

বিশ্বের আবহাওয়া ও তার ধরন দিন দিন বদলে যাচ্ছে। কোনো ঋতুতেই আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে স্বাভাবিক

আচরণ পাচ্ছি না। বৃষ্টির সময়ে অনাবৃষ্টি, খরার সময়ে বৃষ্টি, গরমের সময়ে উত্তরের হাওয়া, শীতের সময়ে তপ্ত হাওয়া—কেমন যেন এলোমেলো আবহাওয়া লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী গ্রিনহাউস প্রভাব পৃথিবীর কয়েকটি দেশে যথা—কানাডা, রাশিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলোর জন্য সাফল্য বয়ে আনবে। এ কারণে ঐসব অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ একর জমি বরফমুক্ত হয়ে চাষাবাদ ও বসবাসযোগ্য হয়ে উঠবে। অন্যদিকে দুর্ভোগ বাড়বে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকার দরিদ্র অধিবাসীদের। কারণ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপকূলীয় এলাকার এক বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী পৃথিবীর বেশ কয়েকটি বিখ্যাত শহর হবে ব্যাপক আকারে ক্ষতিগ্রস্ত (চিত্র ৫.১১)।

চিত্র ৫.১১ : গ্রিনহাউস প্রভাব

পৃথিবী উষ্ণায়নের ফলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বিশ্বের মোট জনসমষ্টির প্রায় ২০ শতাংশ অধিবাসীর সরাসরি ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ফুলে উঠলে আবহাওয়ার প্রকৃতিই বদলে যাবে। সময়ে অসময়ে জলোচ্ছ্বাসের শিকার হয়ে ফসল ডুবে যাবে, দূষিত হবে সুপেয় পানি ও লোনা পানি প্রবেশের ঝুঁকি বাড়বে, বনাঞ্চল ধ্বংস হবে, বন্য জীবজন্তুর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং একই দেশের মানুষ অন্য অঞ্চলে হবে জলবায়ু শরণার্থী (Climate refugee)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলের মানুষ হবে প্রথম শিকার।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী সমানভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিরতায় এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। উন্নত বিশ্ব তাদের উৎপাদিত শস্যের বাড়তি অংশ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে, আর উন্নয়নশীল গরিব দেশগুলোর মানুষ না খেয়ে কঙ্কালসার জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে পরিবেশ শরণার্থী হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং অনেক দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টি দারিদ্র্যসীমার

নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের জলবায়ুর ধরন সাম্প্রতিক সময়ে সম্পূর্ণভাবে বদলে যাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, শীতকালও পুর্বের তুলনায় বর্ষাসিক্ত হয়ে উঠেছে।

কাজ : পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী দুর্যোগের সৃষ্টি হচ্ছে তার একটি তালিকা প্রত্যেকে তৈরি কর।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (Impact of climate change in Bangladesh)

মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের কারণে মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস অর্থাৎ কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসগুলো নির্গমনের কারণে বিশ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা শুরু হয়েছে, তাতে বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল অনেক দেশ ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। আর এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আছে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে। অন্যান্য দেশ এ ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার আগেই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে গেছে। আগামী দিনগুলোতে এর মাত্রা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘ তার সতর্কীকরণে বলেছে পরবর্তী ৫০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে তাতে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অংশ প্লাবিত হবে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে। আনুমানিক ৩ কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর তথ্য অনুসারে ২০৩০ সালের পর নদীর প্রবাহ নাটকীয়ভাবে কমে যাবে। ফলে এশিয়ায় পানির স্বল্পতা দেখা দেবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে ঘন ঘন বন্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। যা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে অনুভূত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (ADB) একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, উষ্ণায়নের বর্তমান ধারা ২০৫০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় শস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। জলবায়ুর অন্য আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ১৫০ কোটির বেশি মানুষ সরাসরি পানি ও খাদ্য ঝুঁকিতে পড়বে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে এ শতকের শেষ নাগাদ বিশ্বে চাষাবাদ ২০ থেকে ৪০ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজি (MIT) অর্থনীতিবিদদের নতুন গবেষণা অনুসারে, বিশ্ব উষ্ণায়ন ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যকার ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেবে।

২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংক বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য ৫টি ঝুঁকিপূর্ণ দিক চিহ্নিত করেছে। এগুলো হলো– মরুকরণ, বন্যা, ঝড়, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং কৃষিক্ষেত্রে অধিকতর অনিশ্চয়তা। এগুলোর প্রতিটিতে শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সেই তালিকার ৫টি ভাগের একটিতে শীর্ষ ঝুঁকিপূর্ণসহ ৩টিতে নাম আছে বাংলাদেশের। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ (সারণি ২)।

সারণি ২ : বৈশ্বিক ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকা

মরুকরণ	বন্যা	ঝড়	সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি	কৃষিক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা
মালাউয়ি	*বাংলাদেশ	ফিলিপাইন	সব নিচু দ্বীপদেশ	সুদান
ইথিওপিয়া	চীন	*বাংলাদেশ	ভিয়েতনাম	সেনেগাল
জিম্বাবুয়ে	ভারত	মাদাগাস্কার	মিসর	জিম্বাবুয়ে
ভারত	কম্বোডিয়া	ভিয়েতনাম	তিউনিসিয়া	মালি
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক	মলডোভা	ইন্দোনেশিয়া	জাম্বিয়া
নাইজার	লাওস	মঙ্গোলিয়া	মৌরিতানিয়া	মরক্কো
মৌরিতানিয়া	পাকিস্তান	হাইতি	চীন	নাইজার
ইরিত্রিয়া	শ্রীলঙ্কা	সামোয়া	মেক্সিকো	ভারত
সুদান	থাইল্যান্ড	টোঙ্গা	মিয়ানমার	মালাউয়ি
শাদ	ভিয়েতনাম	চীন	*বাংলাদেশ	আলজেরিয়া
কেনিয়া	বেনিন	হন্ডুরাস	সেনেগাল	ইথিওপিয়া
ইরান	রুয়ান্ডা	ফিজি	লিবিয়া	পাকিস্তান

উৎস : বিশ্বব্যাংক, ২০০৯

১৯৯২ সালে UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) নামে জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংগঠন প্রতিবছর বিশ্বনেতাদের নিয়ে বিশ্ব জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা নিরসনে কাজ করা এর মূল লক্ষ্য। এই সম্মেলনকে সংক্ষেপে বলা হয় 'কপ' (COP- Conference of the Parties).

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ২০০৯ সালে জাতিসংঘের বিশ্বজলবায়ু সম্মেলনে তিন পৃষ্ঠার অঙ্গীকারনামাকে একটি নোট হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অঙ্গীকারনামায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২° সেলসিয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এবং ২০১০-২০১২ সালের জন্য তিন হাজার কোটি ডলারের একটি তহবিলের কথা বলা হয়েছে। জলবায়ু তহবিলের অর্থ বনায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সক্ষমতা অর্জনের জন্য ব্যয় করা হবে। ফলে এই তহবিলের অর্থ দরিদ্র দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশ যেমন– চীন, ভারত ও ব্রাজিল পাবে। জাতিসংঘ একে রাজনৈতিক সমঝোতা হিসেবে উল্লেখ করেছে।

কাজ : সারণি ২-তে বৈশ্বিক ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকায় এশিয়ার অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ কতটুকু হুমকিতে রয়েছে, তা বিশ্লেষণ কর (দলগতভাবে)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আরগন গ্যাসটি বায়ুমন্ডলের কোন স্তরে থাকে?

(ক) স্ট্রাটোমন্ডল (খ) ট্রপোমন্ডল

(গ) এক্সোমন্ডল (ঘ) তাপমন্ডল

২। স্ট্রাটোমন্ডলের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি–

i. আর্দ্র বায়ুযুক্ত

ii. বিমান চলাচলের উপযোগী

iii. অতিবেগুনি রশ্মি শোষণে সক্ষম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অনন্য তার বাবার সঙ্গে সিলেট বেড়াতে যায়। সেখান থেকে তারা জয়ন্তিয়া পাহাড় দেখতে গেল। দূর থেকে দেখল পাহাড়ের একটি ঢালে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু বিপরীত ঢালে বৃষ্টি হচ্ছে না।

৩। অনন্য কোন ধরনের বৃষ্টিপাত দেখেছিল?

(ক) পরিচলন (খ) শৈলোৎক্ষেপ

(গ) ঘূর্ণি (ঘ) বায়ুপ্রাচীরজনিত

৪। পাহাড়ের অপর ঢালে বৃষ্টি না হওয়ার কারণ–

i. বায়ুতে জলীয়বাষ্পের অভাব

ii. বায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক হাওয়া

iii. বায়ুতে জলীয়বাষ্প বৃদ্ধি হওয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। বায়ু সর্বদা একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় কেন?

(ক) বায়ুর গতিপথে পর্বতের অবস্থানের জন্য (খ) তাপ ও চাপের পার্থক্যের জন্য
(গ) চাপ বলয়ের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য (ঘ) নিরক্ষীয় নিম্ন ও উচ্চচাপ বলয়ের জন্য

৬। বাংলাদেশে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু নিয়মিত প্রবাহিত হয় কেন?

(ক) স্থলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় (খ) উত্তরে হিমালয় পর্বত থাকায়
(গ) দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থান করায় (ঘ) নদীমাতৃক দেশ হওয়ায়

৭। মৌসুমি বায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–

i. এটি একটি আঞ্চলিক বায়ু
ii. ঋতু আশ্রয়ী বায়ু
iii. শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুভেদে এ বায়ুর দিক পরিবর্তন হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮। নিম্নের কোন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত?

(ক) কৃষিক্ষেত্রে নিশ্চয়তা (খ) ভূমিকম্প
(গ) তাপমাত্রা বৃদ্ধি (ঘ) মরুকরণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

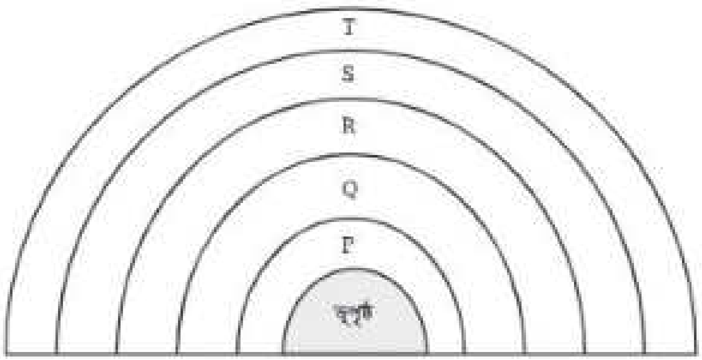

ক. বায়ুমণ্ডল কী?
খ. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস বেশি পরিমাণে থাকার সুবিধা কী বর্ণনা কর।
গ. 'Q' স্তরটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'R' এবং 'S' স্তরের মধ্যে কোনটি আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২।

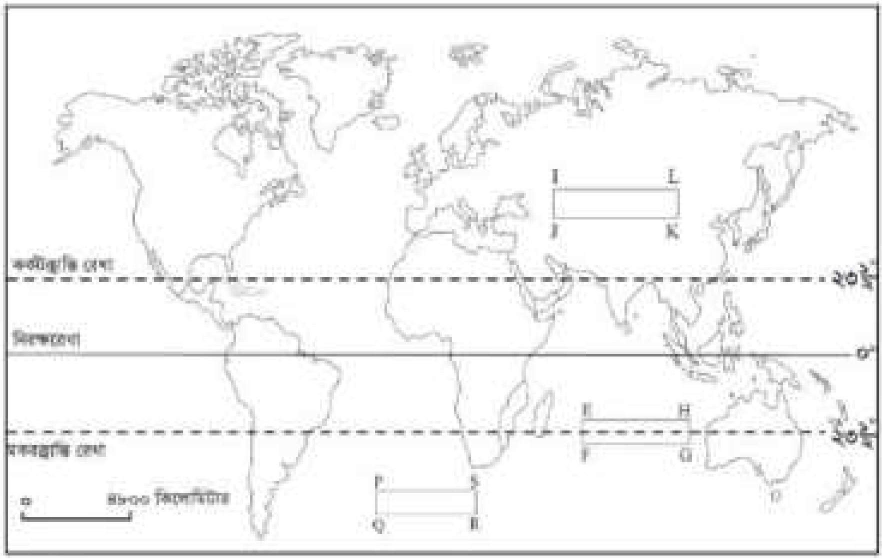

ক. থামসিন কী?

খ. ফেরেলের সূত্রটি লেখ।

গ. মানচিত্রে 'EFGH' স্থানে বিরাজমান বায়ুপ্রবাহ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'IJKL' এবং 'PQRS' স্থানের বায়ুর বেগ কি একইরকম? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বারিমণ্ডল

Hydrosphere

বারিমণ্ডল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। পৃথিবীতে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে এবং সম্পদের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এর জন্য বারিমণ্ডলের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে। কারণ বারিমণ্ডলের তলদেশে বৈচিত্র্যপূর্ণ গঠন রয়েছে এবং সেখানে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ।

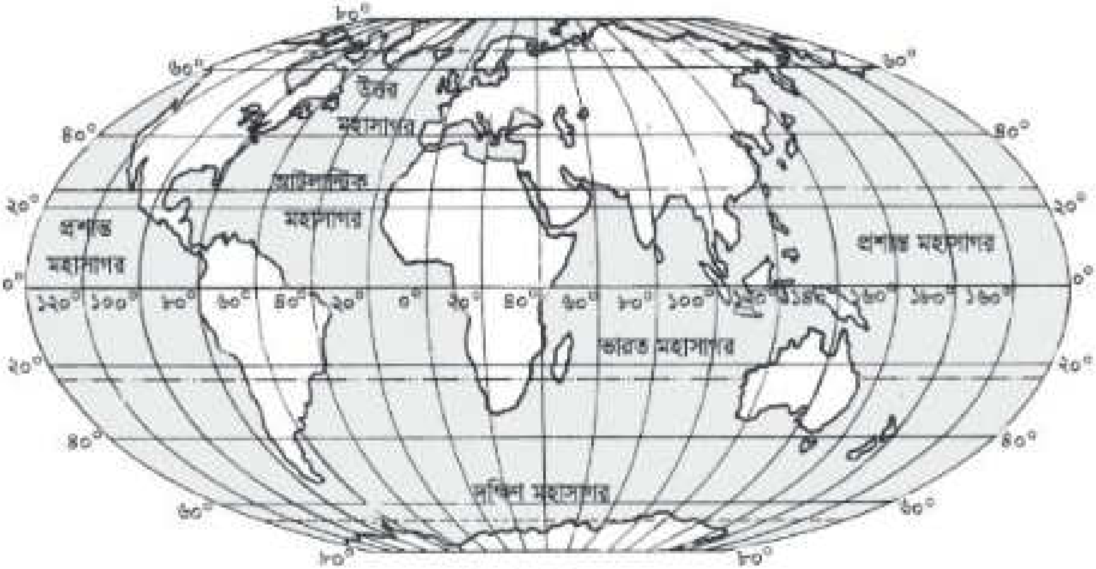

পৃথিবীর বারিমণ্ডল

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বারিমণ্ডলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর বর্ণনা করতে পারব;
- সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও সামুদ্রিক সম্পদ বর্ণনা করতে পারব;
- সমুদ্রস্রোতের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জোয়ার-ভাটার কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

বারিমণ্ডলের ধারণা (Concept of Hydrosphere)

'Hydrosphere'-এর বাংলা প্রতিশব্দ বারিমণ্ডল। 'Hydro' শব্দের অর্থ পানি এবং 'Sphere' শব্দের অর্থ মণ্ডল। আমরা জানি পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে পানি। এ বিশাল জলরাশি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে যেমন– কঠিন (বরফ), গ্যাসীয় (জলীয়বাষ্প) এবং তরল। বায়ুমণ্ডলে পানি রয়েছে জলীয়বাষ্প হিসেবে, ভূপৃষ্ঠে রয়েছে তরল ও কঠিন অবস্থায় এবং ভূপৃষ্ঠের তলদেশে রয়েছে ভূগর্ভস্থ তরল পানি। সুতরাং বারিমণ্ডল বলতে বোঝায় পৃথিবীর সকল জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণ (সারণি ১)। পৃথিবীর সকল জলরাশির শতকরা ৯৭ ভাগ পানি রয়েছে সমুদ্রে (মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর)। মাত্র ৩ ভাগ পানি রয়েছে নদী, হিমবাহ, ভূগর্ভস্থ, হ্রদ, মৃত্তিকা, বায়ুমণ্ডল ও জীবমণ্ডলে। পৃথিবীর সমস্ত পানিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন– লবণাক্ত ও মিঠা পানি। পৃথিবীর সকল মহাসাগর, সাগর ও উপসাগরের জলরাশি লবণাক্ত এবং নদী, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানি মিঠা পানির উৎস।

সারণি ১ : জলরাশির অবস্থানভিত্তিক বিস্তরণ ও শতকরা হার

জলবিভাগের নাম	পরিমাণ (ঘনকিলোমিটার^3× ১,০০,০০০)	শতকরা হার (%)
সমুদ্র	১৩৭০	৯৭.২৫
হিমবাহ	২৯	২.০৫
ভূগর্ভস্থ পানি	৯.৫	০.৬৮
হ্রদ	০.১২৫	০.০১
মাটির আর্দ্রতা	০.০৬৫	০.০০৫
বায়ুমণ্ডল	০.০১৩	০.০০১
নদী	০.০০১৭	০.০০০১
জীবমণ্ডল	০.০০০৬	০.০০০০৪

মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর

বারিমণ্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল লবণাক্ত জলরাশিকে মহাসাগর (Ocean) বলে। পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে, এগুলো হলো প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর এবং দক্ষিণ মহাসাগর (চিত্র ৬.১)। এর মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর বৃহত্তম ও গভীরতম (সারণি ২)। আটলান্টিক মহাসাগর ভগ্ন উপকূলবিশিষ্ট এবং এটি অনেক আবদ্ধ সাগরের (Enclosed sea) সৃষ্টি করেছে। ভারত

মহাসাগর এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে এন্টার্কটিকার হিমভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ মহাসাগরের অবস্থান। দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণে এন্টার্কটিকা মহাদেশ বছরের সকল সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকে। উত্তর গোলার্ধের উত্তর প্রান্তে উত্তর মহাসাগর অবস্থিত এবং এর চারদিক স্থলবেষ্টিত।

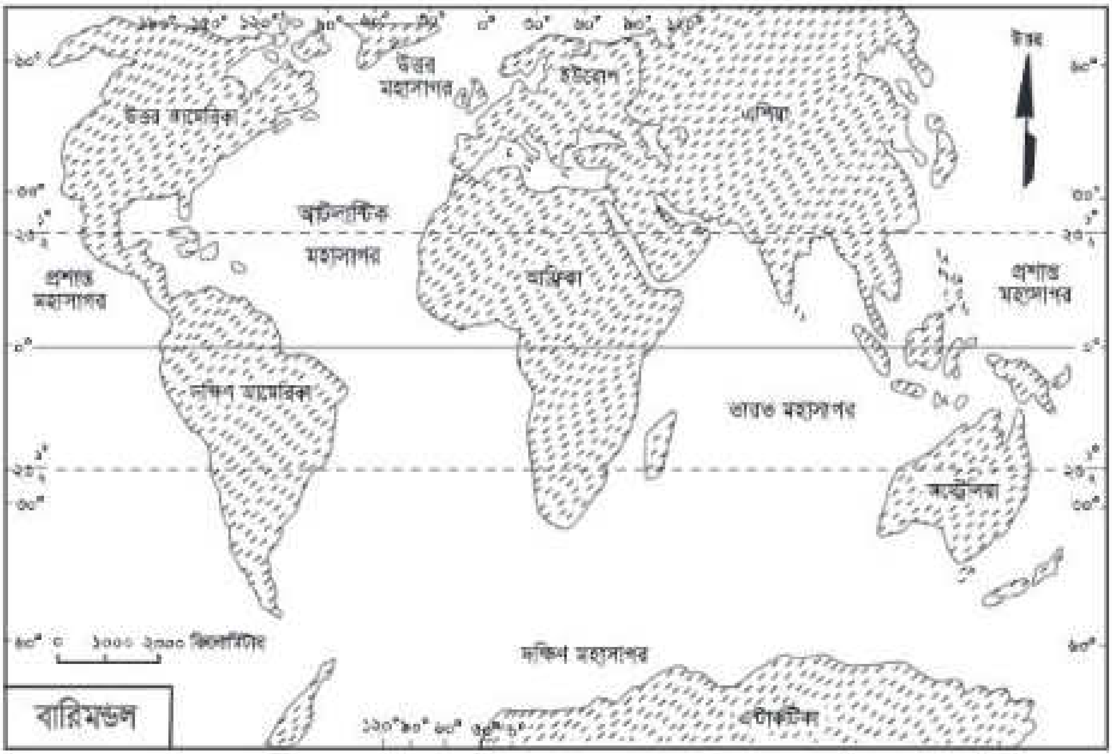

চিত্র ৬.১ : পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান

সারণি ৩ : মহাসাগরের আয়তন ও গড় গভীরতা

মহাসাগর	আয়তন (বর্গকিলোমিটার)	গড় গভীরতা (মিটার)	অবস্থান
প্রশান্ত মহাসাগর	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ	৪,২৭০	আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী
আটলান্টিক মহাসাগর	৮ কোটি ২৪ লক্ষ	৩,৯৩২	আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা
ভারত মহাসাগর	৭ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩,৯৬২	আফ্রিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া
উত্তর মহাসাগর	১ কোটি ৫০ লক্ষ	৮২৪	পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ
দক্ষিণ মহাসাগর	১ কোটি ৪৭ লক্ষ	১৪৯	এন্টার্কটিকা ও ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী

মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর (Sea) বলে। যথা– ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, জাপান সাগর ইত্যাদি। তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একদিকে জল তাকে উপসাগর (Bay) বলে। যথা– বঙ্গোপসাগর, পারস্য উপসাগর ও মেক্সিকো উপসাগর ইত্যাদি। চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত জলভাগকে হ্রদ (Lake) বলে। যথা– রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তে অবস্থিত সুপিরিয়র হ্রদ ও আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদ ইত্যাদি।

কাজ : পৃথিবীর মানচিত্রে মহাসাগরের অবস্থান মানচিত্র নির্দেশক কাঠি নিয়ে ক্লাসের অন্যান্য সতীর্থদের দেখাও।

সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও সামুদ্রিক সম্পদ (Topography of Ocean Floor and Marine Resources)

ভূপৃষ্ঠের উপরের ভূমিরূপ যেমন উঁচুনিচু তেমনি সমুদ্র তলদেশও অসমান। কারণ সমুদ্রতলে আগ্নেয়গিরি, শৈলশিরা, উচ্চভূমি ও গভীর খাত প্রভৃতি বিদ্যমান আছে। শব্দতরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। এ শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে পানির মধ্য দিয়ে প্রায় ১,৪৭৫ মিটার নিচে যায় এবং আবার ফিরে আসে। ফ্যাদোমিটার (Fathometer) যন্ত্রটি দিয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয় (চিত্র ৬.২)। যথা–

(১) মহীসোপান (Continental shelf)

(২) মহীঢাল (Continental slope)

(৩) গভীর সমুদ্রের সমভূমি (Deep sea plains)

(৪) নিমজ্জিত শৈলশিরা (Oceanic ridges)

(৫) গভীর সমুদ্রখাত (Oceanic trench)

(১) মহীসোপান : পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিছু অংশ অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে। এরূপে সমুদ্রের উপকূলরেখা থেকে তলদেশ ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। মহীসোপানের সমুদ্রের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫০ মিটার। এটি ১° কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত থাকে।

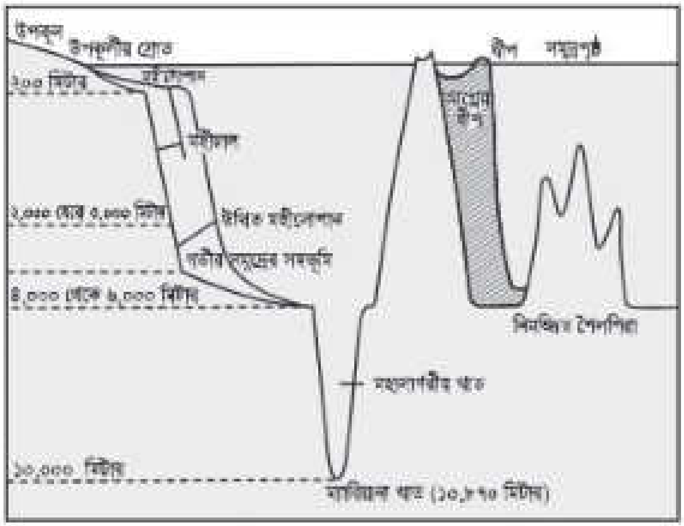

চিত্র ৬.২ : সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ

মহীসোপানের গড় প্রশস্ততা ৭০ কিলোমিটার। মহীসোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢাল বলে। মহীসোপানের বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়। উপকূলভাগের বন্ধুরতার উপর এর বিস্তৃতি নির্ভর করে। উপকূল যদি বিস্তৃত সমভূমি হয়, তবে মহীসোপান অধিক প্রশস্ত হয়। মহাদেশের উপকূলে পর্বত বা মালভূমি থাকলে মহীসোপান সংকীর্ণ হয়। ইউরোপের উত্তরে বিস্তীর্ণ সমভূমি থাকায় উত্তর মহাসাগরের মহীসোপান খুবই প্রশস্ত (প্রায় ১,২৮৭ কিলোমিটার)। তবে ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান অবস্থিত। মহীসোপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম অংশ উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে দেখতে পাওয়া যায়। অথচ এর পশ্চিমে উপকূল বরাবর উত্তর-দক্ষিণ ভজিল রকি পর্বত অবস্থান করায় সেখানে মহীসোপান খুবই সংকীর্ণ। আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ স্থান মালভূমি বলে এর পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মহীসোপান খুবই সরু।

স্থলভাগের উপকূলীয় অঞ্চল নিমজ্জিত হওয়ার ফলে অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য হওয়ার কারণে মহীসোপানের সৃষ্টি হয়। এছাড়া সমুদ্রতটে সমুদ্রতরঙ্গও ক্ষয়ক্রিয়ার দ্বারা মহীসোপান গঠনে সহায়তা করে থাকে।

(২) **মহীঢাল** : মহীসোপানের শেষ সীমা থেকে ভূভাগ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সঙ্গে মিশে যায়। এ ঢালু অংশকে মহীঢাল বলে। সমুদ্রে এর গভীরতা ২০০ থেকে ৩,০০০ মিটার। সমুদ্র তলদেশের এ অংশ অধিক খাড়া হওয়ার জন্য প্রশস্ত কম হয়। এটি গড়ে প্রায় ১৬ থেকে ৩২ কিলোমিটার প্রশস্ত। মহীঢালের উপরিভাগ সমান নয়। অসংখ্য আন্তঃসাগরীয় গিরিখাত অবস্থান করায় তা খুবই বন্ধুর প্রকৃতির। এর ঢাল মৃদু হলে জীবজন্তুর দেহাবশেষ, পলি প্রভৃতির অবক্ষেপণ দেখা যায়।

(৩) **গভীর সমুদ্রের সমভূমি** : মহীঢাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গড় গভীরতা ৫,০০০ মিটার। এ অঞ্চলটি সমভূমি নামে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধুর। কারণ গভীর সমুদ্রের সমভূমির উপর জলমগ্ন বহু শৈলশিরা ও উচ্চভূমি অবস্থান করে।

আবার কোথাও রয়েছে নানা ধরনের আগ্নেয়গিরি। এ সমস্ত উচ্চভূমির কোনো কোনোটি আবার জলরাশির উপর দ্বীপরূপে অবস্থান করে। সমুদ্রের এ গভীর অংশে পলিমাটি ও সিন্ধুমল এবং আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত লাভা ও সূক্ষ্ম ভস্ম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়। এ সকল সঞ্চিত পদার্থ স্তরে স্তরে জমা হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে।

(৪) **নিমজ্জিত শৈলশিরা :** সমুদ্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি অবস্থান করছে। ঐসব আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়ে শৈলশিরার ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করেছে। এগুলোই নিমজ্জিত শৈলশিরা নামে পরিচিত। নিমজ্জিত শৈলশিরাগুলোর মধ্যে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

(৫) **গভীর সমুদ্রখাত :** গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে মাঝে গভীর খাত দেখা যায়। এ সকল খাতকে গভীর সমুদ্রখাত বলে। পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট সংঘর্ষের ফলে সমুদ্রখাত প্লেট সীমানায় অবস্থিত। এ প্লেট সীমানায় ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি অধিক হয় বলেই এ সকল খাত সৃষ্টি হয়েছে। এ খাতগুলো অধিক প্রশস্ত না হলেও খাড়া ঢালবিশিষ্ট। এদের গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫,৪০০ মিটারের অধিক।

প্রশান্ত মহাসাগরেই গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা অধিক। এর অধিকাংশই পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ সকল গভীর সমুদ্রখাতের মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ম্যারিয়ানা খাত (Mariana trench) সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা প্রায় ১০,৮৭০ মিটার এবং এটাই পৃথিবীর গভীরতম খাত। এছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টোরিকো খাত (৮,৫৩৮ মিটার) এবং ভারত মহাসাগরের শুন্ডা খাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাজ : দলগতভাবে নিচের ছকে বৈশিষ্টগুলো লেখ।

মহীসোপান	মহীঢাল	গভীর সমুদ্রের সমভূমি	নিমজ্জিত শৈলশিরা	গভীর সমুদ্রখাত
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

সমুদ্রস্রোত (Ocean Currents)

সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ বায়ুপ্রবাহ। বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপরিভাগের পানির সঙ্গে ঘর্ষণ (Friction) তৈরি করে এবং ঘর্ষণের জন্য পানিতে ঘূর্ণন (Gyre/spiral pattern) তৈরি করে। সমুদ্রের পানি একটি নির্দিষ্ট গতিপথ অনুসরণ করে চলাচল করে, একে সমুদ্রস্রোত বলে।

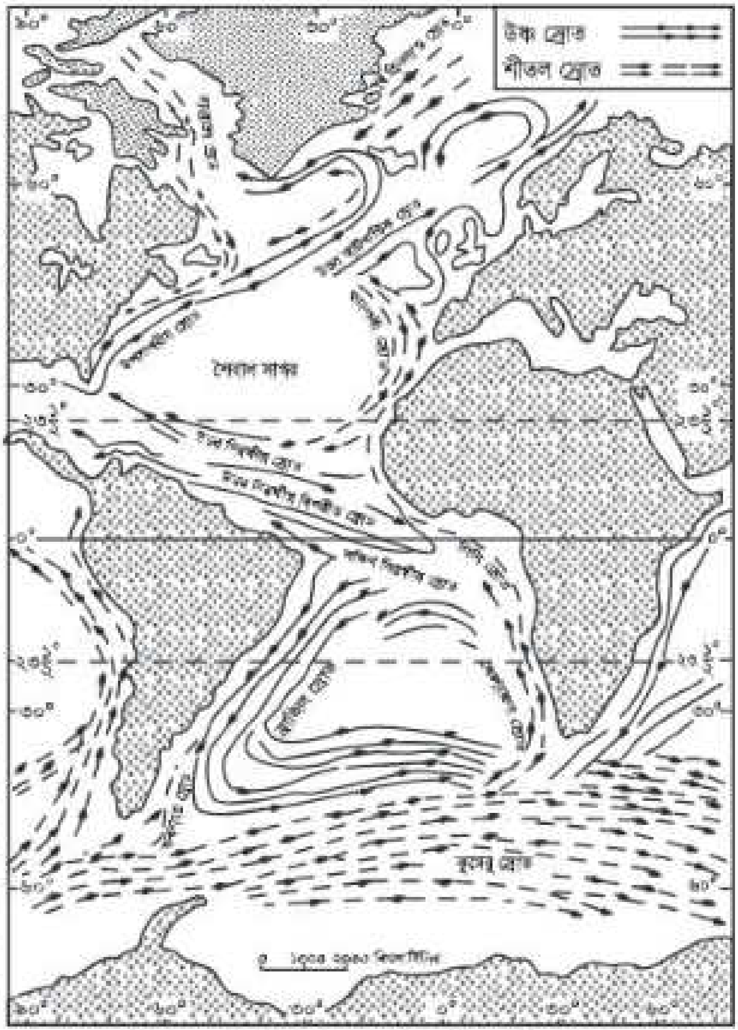

চিত্র ৬.৩ : আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ ও শীতল স্রোত

সমুদ্রস্রোতকে উষ্ণতার তারতম্য অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (ক) উষ্ণ স্রোত ও (খ) শীতল স্রোত (চিত্র ৬.৩)।

(ক) উষ্ণ স্রোত : নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি হওয়ায় জলরাশি হালকা হয় ও হালকা জলরাশি সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রবাহরূপে শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ স্রোতকে উষ্ণ স্রোত (Warm currents) বলে।

(খ) শীতল স্রোত : মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারী জলরাশি জলের নিচের অংশ দিয়ে অন্তঃপ্রবাহরূপে নিরক্ষীয় উষ্ণমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ স্রোতকে শীতল স্রোত (Cold currents) বলে।

সমুদ্রস্রোতের কারণ (Causes of Ocean Currents)

১। নিয়ত বায়ুপ্রবাহ : নিয়ত বায়ুপ্রবাহই সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ। এসব বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোতের দিক ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে। অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী প্রধান সমুদ্রস্রোতগুলোর সৃষ্টি হয় (চিত্র ৬.৪)।

২। পৃথিবীর আহ্নিক গতি : পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে বায়ুপ্রবাহের মতো সমুদ্রজলও উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। এর ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।

৩। সমুদ্রজলের তাপমাত্রার পার্থক্য : নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণমণ্ডলের সমুদ্রের জল বেশি উষ্ণ বলে তা জলের উপরের অংশ দিয়ে পৃষ্ঠপ্রবাহ বা বহিঃস্রোতরূপে মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে মেরু অঞ্চল থেকে শীতল ও ভারী জলরাশি জলের নিচের অংশ দিয়ে অন্তঃপ্রবাহ বা অন্তঃস্রোতরূপে নিরক্ষীয় উষ্ণমণ্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়। এইভাবে উষ্ণ ও শীতল সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।

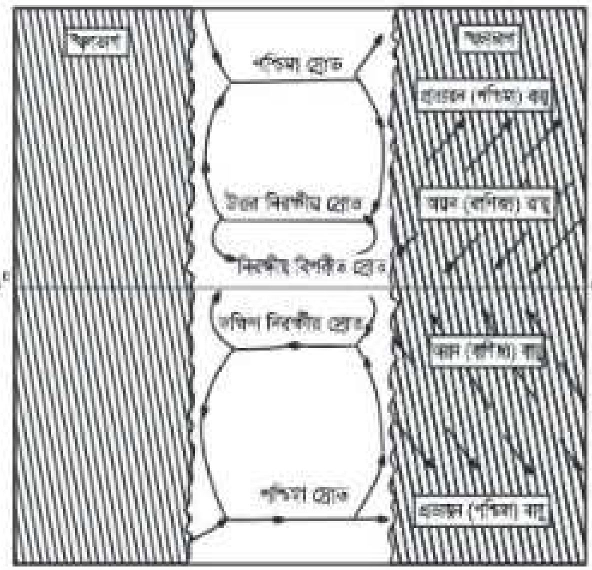

চিত্র ৬.৪ : সমুদ্রস্রোতের উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব

৪। মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে বরফের গলন : মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে বরফ কিছু পরিমাণ গলে গেলে জলরাশি স্ফীত হয় ও সমুদ্রজলের লবণাক্ততার পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।

৫। সমুদ্রের গভীরতার তারতম্য : সমুদ্রের গভীরতার তারতম্য অনুসারে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। অগভীর সমুদ্রের জল দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উপরে ওঠে। তখন গভীরতর অংশের শীতল জল নিচে নেমে আসে। এজন্য উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের পৃষ্ঠে গতি সবচেয়ে বেশি। সমুদ্রের ১০০ মিটার নিচ থেকে গতি কমতে থাকে।

৬। সমুদ্রজলের লবণাক্ততার পার্থক্য : সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। অধিক লবণাক্ত জল বেশি ভারী বলে তার ঘনত্বও বেশি। বেশি ঘনত্বের জল কম ঘনত্বের দিকে নিম্ন প্রবাহরূপে প্রবাহিত হয় ও সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি করে।

৭। ভূখণ্ডের অবস্থান : সমুদ্রস্রোতের প্রবাহপথে কোনো মহাদেশ, দ্বীপ প্রভৃতি ভূখণ্ড অবস্থান করলে সমুদ্রস্রোত তাতে বাধা পেয়ে দিক ও গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় এর প্রভাবে সমুদ্রস্রোত একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়।

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব (Influence of ocean currents)

নানাবিধ কারণে সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে এলাকার উপর দিয়ে সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয় সেখানে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার জলবায়ু এবং বাণিজ্যের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব অত্যধিক।

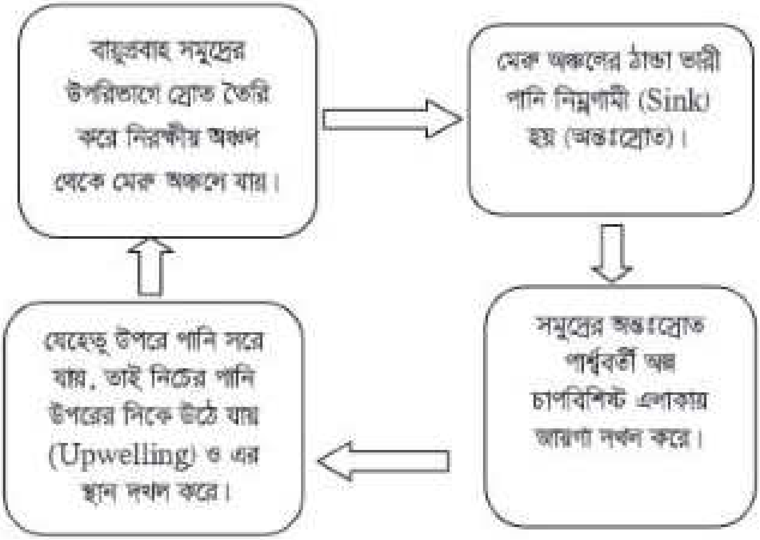

প্রবাহচিত্র : সমুদ্রের উপরের (Surface) এবং নিমজ্জিত (Deep) স্রোত একসঙ্গে সঞ্চালন স্রোত (Convection current) তৈরি করে, যার ফলে সমুদ্রের জলরাশি একস্থান থেকে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়।

১। **উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাব :** উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে কোনো অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই শীতল অঞ্চলের উপর দিয়ে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হলে শীতকালেও বরফ জমতে পারে না। বন্দরগুলো সারাবছর ব্যবহার করা যায়। যেমন– উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে নরওয়ে ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম উপকূল শীতকালে বরফমুক্ত থাকে, কিন্তু একই অক্ষাংশে অবস্থিত কানাডার পূর্ব উপকূলে বরফাচ্ছন্ন অবস্থা দেখা যায়।

২। **শীতল সমুদ্রস্রোতের প্রভাব :** শীতল সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে কোনো অঞ্চলের শীতলতা বৃদ্ধি পায়। যেমন– শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের প্রভাবে কানাডার পূর্ব উপকূলে ল্যাব্রাডর দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী অঞ্চল সারাবছর বরফাচ্ছন্ন থাকে। একই কারণে শীতল কামচাটকা স্রোতের প্রভাবে এশিয়ার পূর্ব উপকূলে কামচাটকা উপদ্বীপের শীতলতা বৃদ্ধি পায়।

৩। **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর প্রভাব :** সমুদ্রস্রোতের অনুকূলে নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি চলাচলের সুবিধা হয়। তবে শীতল সমুদ্রস্রোত অপেক্ষা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতে জাহাজ ও নৌচলাচলের সুবিধা বেশি। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রস্রোতের অনুকূলে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক জাহাজ যাতায়াত করে। শীতল স্রোতের গতিপথে তীব্র শীত ও হিমশৈলের জন্য জাহাজ চলাচলের অসুবিধা দেখা যায়।

৪। **আবহাওয়ার উপর প্রভাব :** উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে বায়ুপ্রবাহ প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প সংগ্রহ করে। এই উষ্ণ বায়ুর প্রভাবে উপকূল অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে। যেমন– উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

অপরদিকে শীতল সমুদ্রস্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক বলে বৃষ্টিপাত ঘটায় না। যেমন– কখনো শীতল মরুভূমির সৃষ্টি করে। দক্ষিণ আমেরিকার আতাকামা মরুভূমি শীতল পেরু স্রোত-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়।

৫। কুয়াশা ও ঝড়ঝঞ্ঝা সৃষ্টি : উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন অঞ্চলে অল্প স্থানব্যাপী উষ্ণতার ব্যাপক পরিবর্তন দেখা যায়। এই অঞ্চলে ঘন কুয়াশা ও ঘূর্ণিবাতের সৃষ্টির ফলে প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝার সৃষ্টি হয়। জাহাজ ও বিমান চলাচলে অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন– উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের মিলনের ফলে এবং এশিয়ার উপকূলে শীতল কামচাটকা স্রোত ও বেরিং স্রোত এবং উষ্ণ জাপান স্রোতের মিলনের ফলে এরূপ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

৬। সমুদ্রে অগভীর মগ্নচড়ার সৃষ্টি : উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন স্থলে শীতল স্রোতের সঙ্গে বাহিত বড় বড় হিমশৈল উষ্ণ স্রোতের প্রভাবে গলে যায়। ফলে হিমশৈলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন নুড়ি, কাঁকর, বালি প্রভৃতি সমুদ্রতলে সঞ্চিত হয় এবং একসময় মগ্নচড়ার সৃষ্টি করে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূলে গ্র্যান্ড ব্যাঙ্ক ও সেবল ব্যাঙ্ক এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে ডগার্স ব্যাঙ্ক এগুলো মগ্নচড়ার প্রকৃস্ট উদাহরণ।

৭। মৎস্য ব্যবসার সুবিধা : অগভীর মগ্নচড়াগুলোতে প্রচুর পরিমাণে প্ল্যাংকটন (একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী) জন্মায় ও বংশবৃদ্ধি করে। এই প্ল্যাংকটন মাছের অতি প্রিয় খাদ্য। এই মগ্নচড়াগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাছ আহরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূল ও জাপান উপকূলে পৃথিবীর অধিকাংশ মাছ ধরা হয়।

৮। হিমশৈলের আঘাতে বিপদ : শীতল সমুদ্রস্রোতের সঙ্গে যেসব হিমশৈল (Iceberg) ভেসে আসে সেগুলোর কারণে জাহাজ চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজডুবির ঘটনা ঘটে। যেমন–যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত টাইটানিক জাহাজ ১৯১২ সালে প্রথম যাত্রাতেই হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল।

জোয়ার-ভাটার কারণ (Causes of High and Low Tide)

প্রধানত দুটি কারণে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়। এগুলো হলো– (১) চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব এবং (২) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি।

(১) চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব : মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী মহাকাশে বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রতিটি জ্যোতিষ্ক পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই এর প্রভাবে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পৃথিবীর উপর সূর্য অপেক্ষা চাঁদের আকর্ষণ বল বেশি হয়। কারণ সূর্যের ভর অপেক্ষা চাঁদের ভর অনেক কম হলেও চাঁদ সূর্য অপেক্ষা পৃথিবীর অনেক

জোয়ার ও ভাটা (High Tide and Low Tide) : সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী নদীর জলরাশি প্রতিদিনই কোনো একটি সময়ে ঐ জলরাশি ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার তা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। জলরাশির এরকম নিয়মিত স্ফীতি এবং ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে।

মহাকর্ষ (Gravitional) : এ মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। এ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।

নিকটে অবস্থিত। তাই সমুদ্রের জল তরল বলে চাঁদের আকর্ষণেই প্রধানত সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে ও জোয়ার হয়। সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার তত জোরালো হয় না। চাঁদ ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থিত হলে চাঁদ ও সূর্য উভয়ের আকর্ষণে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়।

(২) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি : পৃথিবী নিজ মেরুরেখার চারদিকে অনবরত আবর্তন করে বলে কেন্দ্রাতিগ শক্তি বা বিকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয়। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর প্রতিটি অণুই মহাকর্ষ শক্তির বিপরীত দিকে বিকর্ষিত হয় বা ছিটকে যায়। তাই পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে যেখানে মহাশক্তির প্রভাবে জোয়ারের সৃষ্টি হয়, তার বিপরীত দিকে সমুদ্রের জল বিক্ষিপ্ত হয়েও জোয়ারের সৃষ্টি করে (চিত্র ৬.৫)।

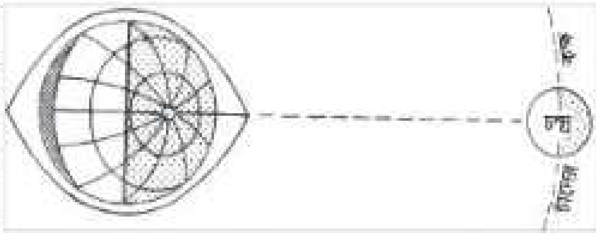

চিত্র ৬.৫ : পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ ও মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব

জোয়ার-ভাটার প্রভাব (Effects of Tides)

মানব-জীবনের উপর জোয়ার-ভাটার যথেষ্ট প্রভাব আছে। বিশ্বের সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশসমূহে জোয়ার-ভাটার নিম্নের প্রভাবসমূহ লক্ষ করা যায়।

১। জোয়ার-ভাটার মাধ্যমে ভূখণ্ড থেকে আবর্জনাসমূহ নদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়।

২। দৈনিক দু'বার জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে ভাটার টানে নদীর মোহনায় পলি ও আবর্জনা জমতে পারে না।

৩। জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট স্রোতের সাহায্যে নদীখাত গভীর হয়।

৪। বহু নদীতে ভাটার স্রোতের বিপরীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ (Hydroelectricity) উৎপাদন করা হয়।

৫। জোয়ারের পানি নদীর মাধ্যমে সেচে সহায়তা করে এবং অনেক সময় খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকিয়ে সেচকার্যে ব্যবহার করা হয়।

৬। শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জোয়ারের সাহায্যে নদীতে প্রবেশ করে এবং এর ফলে নদীর পানি সহজে জমে না।

৭। জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি অধিক হয় বলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদীতে প্রবেশ করা সুবিধা হয়। আবার জোয়ারের টানে ঐ জাহাজ অনায়াসে সমুদ্রে নেমে আসতে পারে। বাংলাদেশের দুটি প্রধান সমুদ্রবন্দর পতেঙ্গা ও মংলা এবং অন্যান্য উপকূলবর্তী নদীবন্দর সচল রাখতে জোয়ার-ভাটার ভূমিকা রয়েছে।

৮। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে অধিক মাত্রায় জোয়ারের সময় নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ক্ষতি হয়। এই অধিক জোয়ারে নদীর সংকীর্ণ মোহনায় শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হলে একে জোয়ারের বান বলে।

বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক সম্পদ (Marine Resources of the Bay of Bengal)

বাংলাদেশের প্রায় ৭১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চলের বঙ্গোপসাগরে রয়েছে অনেক সামুদ্রিক সম্পদ। এর তলদেশে ৪৪২ প্রজাতির মৎস্য, ৩৩৬ প্রজাতির মলাস্কস (Mollusks), ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, নানারকম কাঁকড়া এবং বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদ রয়েছে। কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকায় পারমাণবিক খনিজ জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রিওটাইল ও লিউকক্সেন পাওয়া গেছে। এছাড়া সমুদ্র তলদেশে রয়েছে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। হিমশৈল কী?

(ক) এন্টার্কটিকায় জমাট বাঁধা বরফ
(খ) গ্রিনল্যান্ডে জমাট বাঁধা বরফ
(গ) সমুদ্রস্রোতে ভেসে আসা বিশাল বরফখণ্ড
(ঘ) হিমালয়ের চূড়ায় জমাট বাঁধা বরফ

২। সমুদ্রের গভীরতার সঙ্গে সম্পর্কিত হলো–

i. তাপমাত্রা
ii. সমুদ্রস্রোত
iii. লবণাক্ততা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

নিচের মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

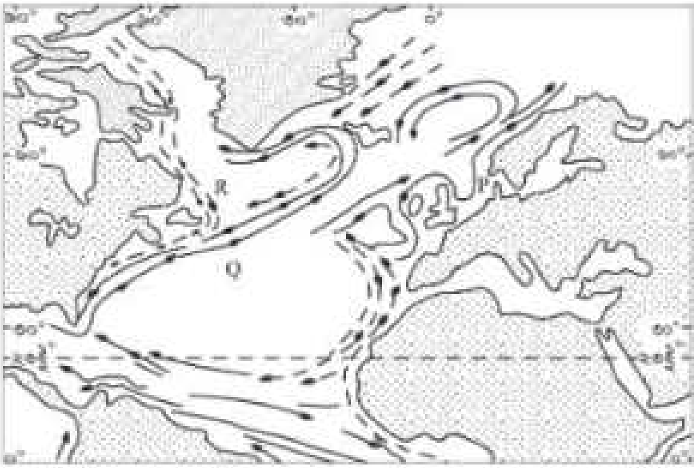

৩। 'P' চিহ্নিত স্রোত অঞ্চলে সারাবছর জাহাজ চলাচল করতে পারে কেন?

(ক) সমুদ্রের গভীরতার জন্য
(খ) ভগ্ন উপকূলের জন্য
(গ) উষ্ণ স্রোতের জন্য
(ঘ) জাহাজের শক্তির জন্য

৪। 'Q' ও 'R' স্রোতদ্বয়ের মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়–

i. মগ্নচড়া ii. হিমপ্রাচীর iii. হিমশৈল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

ক. পৃথিবীর গভীরতম খাতের নাম কী?

খ. মহীসোপানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. 'A' চিহ্নিত স্থানের পানির প্রবাহ স্থলভাগের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'P' ও 'B' চিহ্নিত স্থানের পানিরাশির আবর্তন না হলে ঐ এলাকার বাণিজ্যের উপর সম্ভাব্য প্রভাব– বিশ্লেষণ কর।

২। তুহিন তার বাবার সঙ্গে কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যায়। সকাল বেলায় দেখতে পায় সমুদ্রের পানি স্ফীত হয়ে উপরে উঠে এসেছে কিন্তু সন্ধ্যার সময় আবার নেমে গেছে।

ক. সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ কী?

খ. জোয়ার-ভাটা সৃষ্টিতে কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পানির এরূপ আচরণের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুহিনের দেখা সমুদ্রের পানির ঐরূপ আচরণ উপকূলীয় অঞ্চলে কিরূপ প্রভাব ফেলে বিশ্লেষণ কর।

সপ্তম অধ্যায়

জনসংখ্যা

Population

বর্তমান পৃথিবীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, প্রতিষেধক আবিষ্কার, পুষ্টিকর খাবার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার ও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। ফলে নবজাতক ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। মানুষের আয়ুকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে জন্মহার বৃদ্ধি কিছুটা কমলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ হার কমেনি। এর ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসংখ্যার গুরুত্ব রয়েছে। পরিমিত শ্রমশক্তি ব্যতীত উন্নয়ন সম্ভব নয় আবার জনাধিক্য অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে সমস্যা। প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক উপাদানগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানকে জনবহুল বা জনবিরল করে তোলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সমস্যা। এ সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

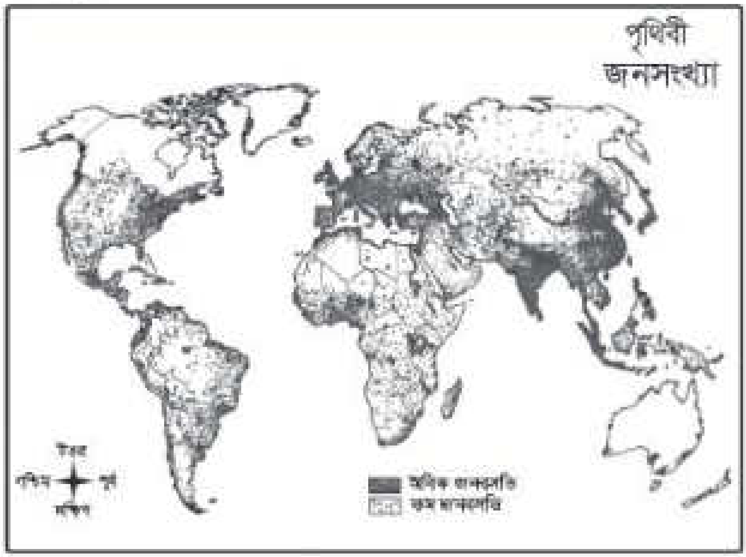

পৃথিবীর জনসংখ্যার ঘনত্ব

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বিশ্বের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জনসংখ্যার পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অভিবাসনের কারণ, সুফল ও কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অভিবাসনের সুফল-কুফল সম্পর্কে সচেতন হবো এবং অন্যকেও সচেতন করব;
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জনসংখ্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বণ্টন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বণ্টনের প্রভাবকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, সৃষ্ট সমস্যা এবং সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।

বিশ্বের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের ধারা
(Current Population Status And Changing Pattern)

আমরা জানি এ পৃথিবী হাজার হাজার যুগ পেরিয়ে এসেছে। খ্রিষ্টীয় সালের প্রারম্ভ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পৃথিবীর জনসংখ্যা খুব ধীরে এবং পরবর্তীতে তুলনামূলকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই যে, সময়ের সঙ্গে জনসংখ্যা পরিবর্তনের তারতম্যকে জনসংখ্যা পরিবর্তনের গতিধারা বলে।

প্রতি দশ কিংবা পাঁচ বছর অন্তর বর্তমান বিশ্বে জাতীয় ভিত্তিতে লোক গণনা করার প্রচলন রয়েছে। ১৬৫৫ সালের আগে তা ছিল না। ধীরে ধীরে এই লোক গণনা প্রসার লাভ করে, বর্তমানে সকল দেশেই জাতীয়ভাবে লোক গণনা করা হয়। লোক গণনায় দেখা যায় যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে আসে। তবে পরবর্তী ২০০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। ১৬৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০ মিলিয়ন, ১৮৫০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১.২ বিলিয়ন। ১৮৫০ সালের পর কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়, এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি আরও দ্রুত হয়। মাত্র ১০০ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা আবারও দ্বিগুণ হয়। ১৯৫০ সালে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২.৫৩ বিলিয়ন। যা ২০১৭ সালে ৭.৬০ বিলিয়নে এসে দাঁড়িয়েছে। যদি এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে ২০৩০ সালে অনুমিত জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৮ বিলিয়নের উপরে (চিত্র ৭.১)।

পৃথিবীর জনসংখ্যা পরিবর্তন

সাল	জনসংখ্যা (বিলিয়ন)
১৯৫০	২.৫৩
১৯৬০	৩.০৩
১৯৭০	৩.৬৯
১৯৮০	৪.৪৫
১৯৯০	৫.৩২
২০০০	৬.১৩
২০১০	৬.৯২
২০১৫	৭.৩৫
২০১৭	৭.৬০

উৎস : UN. Dept. of Economic and Social Affairs, Population Division, 2017

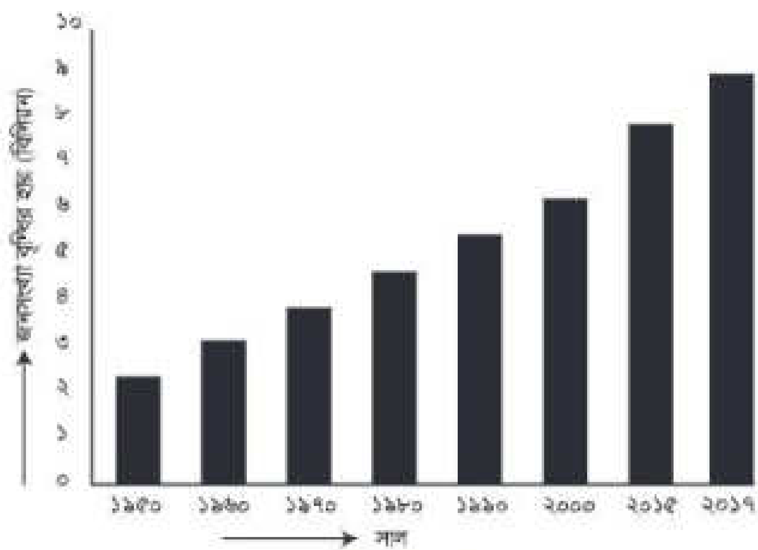

চিত্র ৭.১ : বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা ১৯৫০–২০১৭

উপরের তথ্য ও বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে সাধারণভাবে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

প্রাথমিক পর্যায় (Initial Stage)

সুদূর অতীতকাল থেকে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে প্রাথমিক পর্যায় বলে। এ সময় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির হার উভয়ই ছিল খুব কম। এই পর্যায়ে পৃথিবীর সকল অংশেই জন্ম এবং মৃত্যুর হার উভয়ই খুব বেশি ছিল।

মাধ্যমিক পর্যায় (Middle Stage)

১৬৫০ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মাধ্যমিক পর্যায় ধরা হয়। এই পর্যায়ে প্রথমে ধীরে এবং পরে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে কিছু অঞ্চলে মৃত্যুহার হ্রাসের ফলে এবং কিছু অঞ্চলে অভিগমনের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আফ্রিকা ও এশিয়ায় পূর্বের মতো জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি থাকার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

সাম্প্রতিক পর্যায় (Recent Stage)

১৯৫০ সাল থেকে ২০২১ সময় পর্যন্ত সাম্প্রতিক পর্যায়ভুক্ত। বিগত কয়েক দশকে সমগ্র বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সার্বিকভাবে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বিশ্বের অঞ্চলভেদে দুটি ধারা লক্ষ করা যায়।

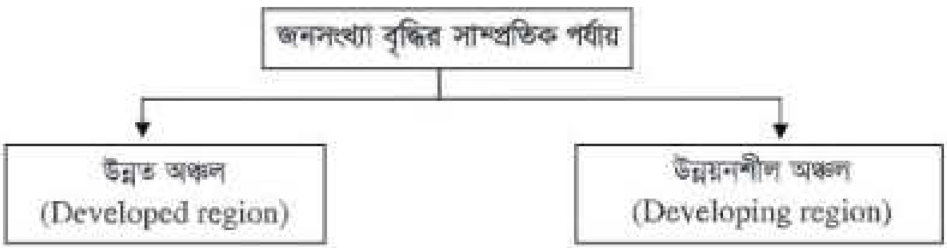

উন্নত অঞ্চল বা উন্নত দেশসমূহ

উন্নত অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে ও জনসংখ্যা স্থিতিশীল। জনসংখ্যা কাঠামো দেখলে বোঝা যাবে এর ভূমি কম প্রশস্ত, উপরের দিকে প্রশস্ততা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্ফীত হয়ে উপরের দিকে গিয়ে আবার সরু হয়েছে (চিত্র ৭.২)। উন্নত দেশসমূহে নারী ও পুরুষের শতকরা বৃদ্ধির হারের খুব বেশি পার্থক্য নেই এবং নির্ভরশীল জনসংখ্যার পরিমাণ কম। কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি, ফলে দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে তারা যথেষ্ট অবদান রাখে।

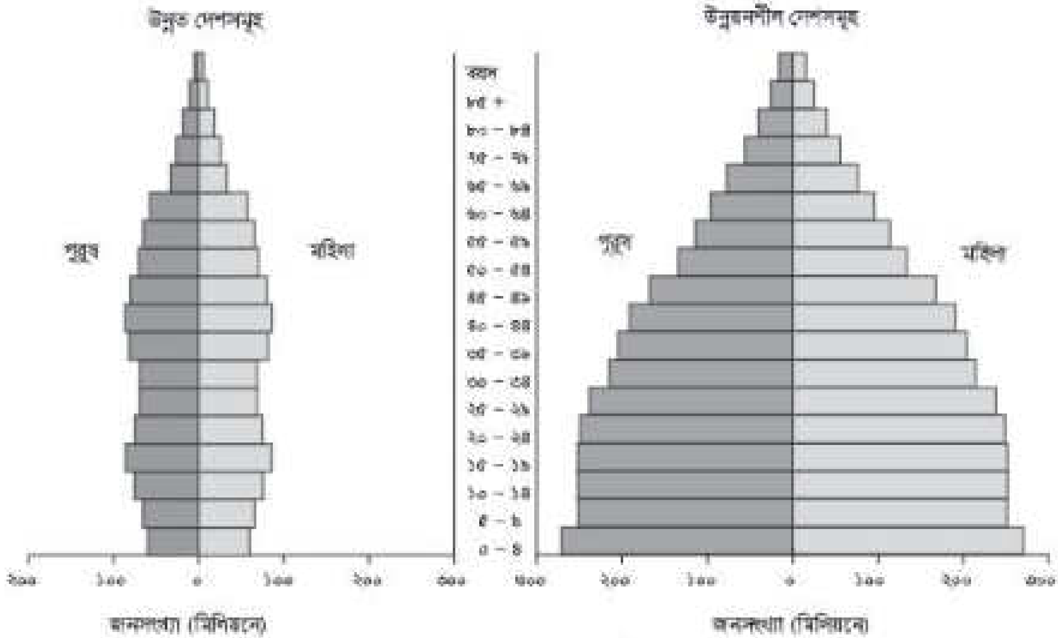

চিত্র ৭.২ : জনসংখ্যা কাঠামো

সাধারণত ০–১৮ বছর বয়সের শিশু এবং ৬৫ উর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যাকে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলে। বাকিদের কর্মক্ষম জনসংখ্যা হিসেবে ধরা হয়।

জনসংখ্যা কাঠামো (**Population Structure**) : নারী-পুরুষের বয়সভিত্তিক বিন্যাস গ্রাফে প্রকাশ করলে ত্রিভূজ বা পিরামিড সদৃশ যে নকশা তৈরি হয় তাকে জনসংখ্যা কাঠামো বলে। উল্লম্ব অক্ষে (Vertical axis) বয়স এবং অনুভূমিক অক্ষে (Horizontal axis) বামে পুরুষ ও ডানে নারীর সংখ্যা বা শতকরা হার ভত্তে স্থাপন করা হয়। উন্নয়নশীল দেশসমূহের এরূপ জনসংখ্যা কাঠামোকে জনসংখ্যা পিরামিড (Population Pyramid) বলে।

উন্নয়নশীল অঞ্চল বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ

বিশ্বের উন্নয়নশীল অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও যথেষ্ট বেশি। উন্নয়নশীল দেশসমূহে বিগত কয়েক দশকে যে হারে মৃত্যুর হার কমেছে, সে হারে জন্মহার কমেনি। এ দেশগুলোর জনসংখ্যা কাঠামোর ভূমি অত্যন্ত প্রশস্ত এবং শীর্ষভাগ সংকীর্ণ (চিত্র ৭.২)। মোট জনসংখ্যায় শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের অনুপাত বেশি। যার ফলে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বেশি। কর্মক্ষম জনসংখ্যা কম থাকায় অর্থনৈতিক দিক থেকে এই সকল দেশ পিছিয়ে আছে।

কাজ : নিচের ছকটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য লেখ।

প্রাথমিক পর্যায়	মাধ্যমিক পর্যায়	সাম্প্রতিক পর্যায়

জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক (Factors of population change)

প্রত্যেকে তার আত্মীয়স্বজন এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি বাড়ির বিগত পাঁচ বছরের জনসংখ্যার পরিবর্তন যদি লক্ষ কর–তাহলে দেখবে যে,এই পাঁচ বছরে দুই-একজন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। আবার কারো কোনো পারিবারিক সদস্য মারা গেছে, কেউবা চাকরি বা বিয়ের কারণে অন্যত্র চলে গেছে। আবার শহরে অস্থায়ী বসতিতে অধিকসংখ্যক শিশু দেখা যায়। নারী-পুরুষও এসব অঞ্চলে অধিক।

এই যে চারপাশের জনসংখ্যার আপাত বৃদ্ধি, কমে যাওয়া এই দুই-এর পার্থক্য থেকে প্রকৃত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বের করা যায়। জনসংখ্যার পরিবর্তন এভাবেই হয়ে চলেছে।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে, জনসংখ্যা একটি সক্রিয় পরিবর্তনশীল উপাদান। জনসংখ্যার এই পরিবর্তন ঘটছে জন্ম, মৃত্যু ও অভিবাসনের কারণে। এগুলোকে আমরা জনসংখ্যার পরিবর্তন প্রক্রিয়ার নিয়ামক বলতে পারি। এই নিয়ামকগুলোর পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে কোনো সমাজ তথা দেশের জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়ে থাকে। যার প্রভাব দেখা যায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও।

জন্মহার (Birth Rate)

স্বাভাবিক জন্মহার নারীদের সন্তান ধারণের সামর্থ্য নির্দেশ করে। তবে কোনো নির্দিষ্ট এক বছরের প্রতি হাজার নারীর সন্তান জন্মদানের মোট সংখ্যাকে সাধারণ জন্মহার বলে। সাধারণত ১৫–৪৫ অথবা ১৫–৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের প্রজনন ক্ষমতা (Fertility) থাকে। কোনো দেশের বিশেষ কোনো বছরের জন্মিত সন্তানের সংখ্যাকে উক্ত বছরের গণনাকৃত প্রজননক্ষম নারীর মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে সাধারণ জন্মহার নির্ণয় করা হয়।

এ বিষয়টিকে নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে।

$$\text{সাধারণ জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মিত সন্তান}}{\text{নির্দিষ্ট বছরের প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা}} \times ১০০০$$

স্থূল জন্মহার (Crude Birth Rate)

সাধারণ জন্মহারের চেয়ে স্থূল জন্মহার বহুল প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হাজারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। কোনো বছরে জন্ম নেওয়া শিশুর মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে স্থূল জন্মহার নির্ণয় করা হয়। একে নিম্নোক্তরূপে দেখানো যেতে পারে।

$$\text{স্থূল জন্মহার} = \frac{\text{কোনো বছরের জন্ম নেওয়া শিশুর মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

কোনো একটি স্থান বা দেশের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্ম নেওয়া শিশুর ও জনসংখ্যা জানা থাকলে স্থূল জন্মহার বের করা সহজ।

পৃথিবীর বিভিন্ন জনসংখ্যার মধ্যে প্রজননশীলতার ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। একেক দেশের জন্মহার একেক রকমের। এর কারণ হিসেবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিন্নতা প্রধান। সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়াবলির প্রভাবেই জন্মহারের ভিন্নতা দেখা যায়।

১। **বৈবাহিক অবস্থাগত বৈশিষ্ট্য :** বিবাহের বয়স, বহুবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি কারণ জন্মহার কম বা বেশির উপর প্রভাব ফেলে।

২। **শিক্ষা :** সাধারণ শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেলে প্রজননশীলতা হ্রাস পায় এবং শিক্ষার মান ও হার কম হলে প্রজননশীলতা বেশি হয়।

৩। **পেশা :** সাধারণভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত কর্মী এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মহার বেশি হতে দেখা যায়। অন্যদিকে শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবী প্রভৃতি পেশাদার শ্রেণি এবং প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ও চাকরিজীবীদের মধ্যে জন্মহার কম দেখা যায়।

৪। **গ্রাম-শহর আবাসিকতা :** গ্রাম এলাকায় সাধারণত জন্মহার বেশি এবং শহর এলাকায় জন্মহার কম দেখা যায়। তবে এই উপাদানটি আবার শিক্ষা ও পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত।

মানব জন্মহারের তারতম্য একটি সামাজিক বিষয়। সমাজ, ব্যক্তি-জীবনের বহুবিধ বিষয়, বিশেষ করে সামাজিক অবস্থান, সামাজিক ভূমিকা, ভৌগোলিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, বৈবাহিক ধারা, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, সমাজবৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয় মানব প্রজনন তথা জন্মহারের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মৃত্যুহার (Death Rate)

মানুষ মরণশীল। মরণশীলতা জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়াকেই শুধু প্রভাবিত করে না, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিমাপ করা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য মৃত্যুহার জানা বিশেষ প্রয়োজন।

স্থূল মৃত্যুহার (Crude Death Rate)

স্থূল মৃত্যুহার মরণশীলতা (Mortality) পরিমাপের বহুল প্রচলিত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। নির্দিষ্ট কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারীদের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয়।

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{\text{কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারী মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times ১০০০$$

কোনো স্থান বা দেশের মৃতের সংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যার তথ্য পাওয়া গেলে স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা যায়। তবে মৃত্যুহার নির্ণয়ের জন্য, বয়স-নির্দিষ্ট মৃত্যুহার (Age-specific death rate) গুরুত্বপূর্ণ। এটি বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যার মৃত্যুহার নির্দেশ করে, ফলে এই হার থেকে বার্ধক্য ও অকালমৃত্যু প্রভৃতি বোঝা যায়।

পরিণত বয়সে সামান্য অসুখবিসুখ বা আঘাতেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। একে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে। আবার অনেক সময় পরিণত বয়সের পূর্বেই মানুষ মারা যায়। একে অকাল বা অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে। মৃত্যুহারের পার্থক্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে।

১। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি অস্বাভাবিক মৃত্যুর অন্যতম কারণ।

২। **যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা :** যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। কুয়েত, আফগানিস্তান, ইরাক যুদ্ধের সময় দেখা যায় ঐ সব দেশে মৃত্যুহার অনেক বেশি ছিল। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক শহিদ হয়।

৩। **রোগ ও দুর্ঘটনা :** সংক্রামক, শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত রোগ, ক্যান্সার, রক্ত সঞ্চালন সংক্রান্ত রোগ, আঘাত বা দুর্ঘটনা প্রভৃতির কারণে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়।

অঞ্চলভেদে মরণশীলতার পার্থক্য রয়েছে। অনুন্নত দেশগুলোতে মৃত্যুহার অনেক বেশি। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মৃত্যুহার কিছুটা কমে এসেছে এবং উন্নত দেশগুলোতে স্বাভাবিক মৃত্যুহার রয়েছে। আবার নারী-পুরুষের মৃত্যুহারের পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রজননকালীন নারীদের মৃত্যুহার বেশি পরিলক্ষিত হয়। আবার অনুন্নত দেশগুলোতে শিশু মৃত্যুহারও বেশি দেখা যায়।

অভিবাসন (Migration)

জীবন ধারণের নানা প্রয়োজনে বহুলোক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে। স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে অন্য শহরে এবং একদেশ থেকে অন্যদেশে অভিগমন করে। ফলে কোথাও জনসংখ্যা কমে আবার কোথাও জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অভিবাসনে বাস্তুত্যাগীদের পরিমাণ বৃদ্ধি, গ্রাম বা শহরের মোট জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। এতে সমগ্র দেশের জনসংখ্যা বণ্টনে পরিবর্তন দেখা দেয়।

সাধারণত কর্মের মজুরি, পণ্যের মূল্য, চাষ পদ্ধতি, বাজার ব্যবস্থা, শহর বা গ্রামীণ উন্নয়ন, শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন প্রভৃতি অভিবাসনকে প্রভাবিত করে। অনেক দেশে জন্মহার বেশি হয়। আবার জন্মহার বেশি এমন দেশের কিছু লোক অভিগমন করলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি নাও থাকতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, কোনো দেশের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি ঐ দেশের জন্মহার, মৃত্যুহার ও অভিবাসন দ্বারা নির্ধারিত হয়। জন্মহার, মৃত্যুহার ও অভিবাসন প্রত্যেকটি বিষয় একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই শুধু জন্মহার বা শুধু মৃত্যুহার বা অভিবাসন দিয়ে কোনো দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা যায় না। জনসংখ্যার সঠিক তথ্য বুঝতে হলে এই তিনটি বিষয়ই সমানভাবে পর্যালোচনা করতে হয়।

প্রকৃতি অনুযায়ী অভিবাসনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা–

১। **অবাধ অভিবাসন (Voluntary migration) :** নিজের ইচ্ছায় বাসস্থান ত্যাগ করে আপন পছন্দমতো স্থানে বসবাস করাকে অবাধ অভিবাসন বলে।

২। **বলপূর্বক অভিবাসন (Forced migration) :** প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপের মুখে কিংবা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টির ফলে মানুষ বাধ্য হয়ে যে অভিগমন করে তাকে বলপূর্বক অভিবাসন বলে। গৃহযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণে বা যুদ্ধের কারণে কেউ যদি অভিগমন করে তবে তাকে বলপূর্বক অভিবাসন বলে। বলপূর্বক অভিবাসনের ফলে যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো স্থানে আগমন করে ও স্থায়ীভাবে আবাস স্থাপন করে তাদেরকে বলে উদ্বাস্তু (Refugee)। আর যারা সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সুযোগমতো স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় থাকে তাদেরকে বলে শরণার্থী (Emigre)।

কাজ : রিনা তৌমিকের পরিবার, সাদিয়ার পরিবার, সোহাগ, রবীন ও আরও অনেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে গমন করে। এর মধ্যে সাদিয়ার পরিবার, সোহাগ ও রবীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে চলে আসে। তাহলে নিচের ছকটি পূরণ কর।

প্রশ্ন এটা কোন ধরনের অভিবাসন?

প্রশ্ন এখানে উদ্বাস্তু কারা?

প্রশ্ন এখানে শরণার্থী কারা?

প্রশ্ন অভিবাসী কে কে?

আবার তোমরা দেখবে দেশের বা রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে গ্রাম (Rural) থেকে শহরে (Urban) অথবা শহর থেকে গ্রামে অভিগমন ঘটে। আবার কাউকে কাউকে দেখবে দেশের বাইরে অন্য কোনো রাষ্ট্রে গমন করেছে। তাই স্থানভেদে অভিগমনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১। রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ (Internal)

২। আন্তর্জাতিক (International)

কাজ : এককভাবে নিচের ছকটি পূরণ কর।

অভিগমনের স্থান			কোন ধরনের অভিগমন
ঢাকা	থেকে	চট্টগ্রাম	
ঢাকা	থেকে	আমেরিকা	
ময়মনসিংহ	থেকে	ঢাকা	
বগুড়া	থেকে	ঢাকা	

অভিবাসনের কারণ (Factors of Migration)

মানুষ প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে অভিগমন করে। বাংলাদেশের বহু মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করেছে। একটু ভেবে দেখ কেন করেছে?

যে সমস্ত কারণ নতুন কোনো স্থানে বসতি স্থাপনের জন্য মানুষকে উৎসাহিত বা প্ররোচিত করে সেগুলোকে গন্তব্যস্থলের টান বা আকর্ষণমূলক কারণ (Pull factors) বলে। যে সমস্ত কারণে মানুষকে পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যস্থানে যেতে বাধ্য করা হয়, সেগুলোকে উৎসস্থলের ধাক্কা বা বিকর্ষণমূলক কারণ (Push factors) বলে। তাহলে, অভিগমনের কারণগুলো হলো :

আকর্ষণমূলক কারণ

(১) আত্মীয়স্বজন ও নিজ গোষ্ঠীভুক্ত জনগণের নৈকট্য লাভ

(২) কর্মস্থান ও অধিকতর আর্থিক সুযোগ সুবিধা

(৩) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ-সংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তাগত সুবিধা

(৪) বিশেষ দক্ষতার চাহিদা ও বাজারের সুবিধা

(৫) বিবাহ ও সম্পত্তি প্রাপ্তিমূলক ব্যক্তিগত সুবিধা

বিকর্ষণমূলক কারণ

(১) প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি

(২) জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

(৩) সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য

(৪) অর্থনৈতিক মন্দা

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমাগত ক্ষয়ক্ষতি

অভিবাসনের সুফল ও কুফল (Merits and Demerits of Migration)

অভিবাসনের স্বাভাবিক ফলাফল হচ্ছে জনসংখ্যা বণ্টন বা অবস্থানিক পরিবর্তন। বস্তুত বিশ্বের জনসংখ্যা বণ্টনের তারতম্য আনয়নের ক্ষেত্রে অভিবাসন গুরুত্বপূর্ণ। অবস্থানগত পরিবর্তন ছাড়াও অভিবাসনের ফলে বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনবৈশিষ্ট্যগত যে পরিবর্তন হতে পারে তা আলোচনা করা হলো :

১। অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic impact) : অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্যই মানুষ অভিবাসনে আগ্রহী হয়। উৎস ও গন্তব্যস্থলে ভূমি ও সম্পত্তির মালিকানা, মজুরির হার, বেকারত্ব, জীবনযাত্রার মান, বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারসাম্য, অর্থনৈতিক উৎপাদন ও উন্নয়ন ধারা প্রভৃতির পরিবর্তন হতে পারে। স্বল্পশিক্ষিত লোক সঠিক পদ্ধতিতে যদি অভিগমন না করে তবে তারা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্তর্জাতিক অভিগমনের ক্ষেত্রে কোথায় গমন করছি, সে স্থানে যেয়ে কী করব তার যথার্থতা যাচাই করে অন্যত্র গমন করতে হবে। লোক মুখে শুনে প্ররোচিত হয়ে গমন করলে অন্যদেশের আইন দ্বারা সে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ফলে নিজের ও

দেশের অর্থনৈতিক কোনো লাভ না হয়ে ক্ষতি হয়। আবার বলপূর্বক অভিবাসন উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক সুবিধার চেয়ে দুর্ভোগই বেশি হয়।

২। সামাজিক ফলাফল (Social impact) : অভিবাসনের ফলে সামাজিক আচার আচরণের আদান-প্রদান হয়। সামাজিক অনেক রীতিনীতি একদেশ থেকে অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন রোগের বিস্তারও ঘটে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের মধ্যে ভাব, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান হয়। ফলে জনগণের গুণগত পরিবর্তন সম্ভব হয়। গ্রাম ও শহর এলাকার মধ্যে পার্থক্য কমে আসে। তবে অধিকভাবে অন্য কালচার রপ্ত করার কারণে নিজের দেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন হয়।

৩। জনবৈশিষ্ট্যগত ফলাফল (Impact on population) : অভিবাসনের ফলে উৎসস্থলে জনসংখ্যা কমে এবং গন্তব্যস্থলের মোট জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়। শিক্ষিত যুবক ও পেশাজীবী অভিবাসন করলে গন্তব্যস্থলে জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। এর ফলে উভয় স্থানের জনসংখ্যায় নারী-পুরুষ অনুপাত ও নির্ভরশীলতার অনুপাত ব্যাপক পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় শিক্ষিত ও মেধাবী শ্রেণির লোক অভিগমন করে আর দেশে ফিরে আসে না এতে দেশ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক দেশে জনসংখ্যা কম থাকায় তারা অন্যদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি নিয়ে জনসংখ্যার ভারসাম্য আনে, এতে তাদের সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। যেমন– অস্ট্রেলিয়া, কুয়েত। উন্নয়নশীল দেশসমূহ যেমন– বাংলাদেশ শ্রম বাজারে জনশক্তি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

সরকারি নীতি (Government Policy) : ২০১২ সালের জনসংখ্যা নীতি রূপরেখায় মা ও শিশুর উন্নত স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। পরিবারের আকার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সার্বিক সামাজিক পুনর্গঠন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে করণীয়

অধিক জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার হ্রাস করার জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করতে হয়। কোনো দেশের জনসংখ্যা সংকোচন প্রধানত দুইভাবে কার্যকর করা যেতে পারে।

১। জন্মহার হ্রাস

২। উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ অথবা বহির্গমন বৃদ্ধি

প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত কোনো দেশের জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব নয়। সামাজিক- অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলে কোনো দেশের জন্মহার স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। এছাড়া জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার ও জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রীসমূহ জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করা প্রয়োজন।

সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিলি-বণ্টনের সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা ছাড়া অন্যান্য আরও কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

১। আইন করে বিবাহের বয়স বৃদ্ধি করা

২। সন্তান সংখ্যা সীমিত রাখার জন্য জনগণের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশে বিভিন্ন প্রকার আইন প্রণয়ন করা

৩। সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা

৪। মহিলাদের জন্য অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা

৫। বৃদ্ধ বয়স, সংকট ও দুর্দশার সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা

অর্থনৈতিক কারণে কোনো দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। সাধারণত বিদেশি লোক নিয়োগ করে কোনো দেশ তার জনশক্তির অভাব সাময়িকভাবে পূরণ করতে পারে। এছাড়া মৃত্যুহার হ্রাস করে এবং জন্মহার বৃদ্ধি করে জনসংখ্যার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়।

জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টন (Population density and distribution)

জনসংখ্যার ঘনত্ব (Population density) : কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা এবং মোট ভূমির পরিমাণ বা আয়তনের যে অনুপাত (Ratio) তা জনবসতির ঘনত্ব। পৃথিবীর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনবসতির ঘনত্ব জানতে হলে মোট জনসংখ্যা ও দেশের আয়তন জানতে হবে।

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট ভূমির আয়তন}}$$

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন এবং এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার

$$\therefore \text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{১৪,৯৭,৭২,৩৬৪}{১,৪৭,৫৭০}$$

$$= \text{১,০১৫ জন (প্রতি বর্গকিলোমিটার)}$$

উপরের তথ্য থেকে আমরা দেখছি যে, দেশের জনসংখ্যার তুলনায় আয়তন বড় হলে তার জনসংখ্যা ঘনত্ব কমে আসে আবার ঘনত্ব বেশি হলে তা ভূমির উপর চাপ সৃষ্টি করে (চিত্র ৭.৩)।

মানুষ-ভূমি অনুপাত (Man-land ratio) : যে সকল ভূমি মানুষের কাজে লাগে এবং সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে, তাকে কার্যকর ভূমি বলে। মানুষ-ভূমি অনুপাত বলতে এই কার্যকর ভূমির অনুপাতকে ধরা হয়।

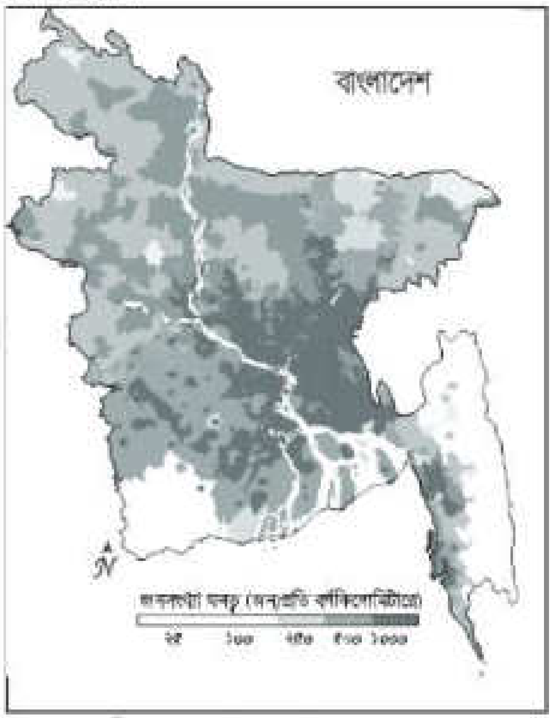

চিত্র ৭.৩ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা ঘনত্ব

$$\text{মানুষ-ভূমি অনুপাত} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট কার্যকর ভূমির আয়তন}}$$

প্রকৃতপক্ষে কোনো দেশের ভূমির উপর জনসংখ্যার চাপ কী রকম তা জানতে হলে সেই দেশের জনসংখ্যা ঘনত্বের পরিবর্তে মানুষ-ভূমি অনুপাত কত তা জানা প্রয়োজন।

কাম্য জনসংখ্যা (Optimum population) : কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির অনুপাতে ভারসাম্য থাকলেই তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। ঐ দেশের উৎপন্ন সম্পদের দ্বারা জনগণের ভোগ-সুখের বন্দোবস্ত যতক্ষণ বজায় রাখা যায়, ততক্ষণই সেই দেশের কাম্য জনসংখ্যা বিদ্যমান। মোট জনসংখ্যা ও কার্যকর ভূমির আদর্শ অনুপাতের ভারসাম্য যখন নষ্ট হয়, তখনই কোথাও অতি-জনাকীর্ণতা আবার কোথাও জনসংখ্যা স্বল্পতা দেখা দেয়।

অতি-জনাকীর্ণতা (Over population) : জনসংখ্যার তুলনায় কার্যকর ভূমির পরিমাণ অল্প থাকলে তাকে অতি- জনাকীর্ণতা বলে। এর ফলে মোট উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ, তথা মাথাপিছু উৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ অল্প হয়। যা মাথাপিছু উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ হ্রাস করে।

জনস্বল্পতা (Under population) : জনসংখ্যার তুলনায় কার্যকর ভূমির পরিমাণ বেশি থাকলেও জনসংখ্যার স্বল্পতার কারণে পর্যাপ্ত সম্পদ এবং ভূমি ব্যবহার না করা গেলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই অবস্থাকে জনস্বল্পতা বলে। যেমন– অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা কম।

জনসংখ্যার বণ্টন (Population distribution) : জনসংখ্যার ঘনত্ব বা আকারগত তারতম্য থেকে তোমরা এটা সহজেই বুঝতে পারছ যে ভূপৃষ্ঠে জনসংখ্যা সমভাবে বিস্তৃত নয়। স্থানভেদে জনসংখ্যার অবস্থানগত বিস্তৃতি বা বিন্যাস হচ্ছে জনসংখ্যা বণ্টন। কোথাও মানুষের বিপুল ঘন সমাবেশ আবার কোথাও জনমানবহীন। ভূপৃষ্ঠের ৫০–৬০ শতাংশের মতো এলাকায় মাত্র শতকরা প্রায় ৫ ভাগ লোকের বসতি। স্থলভাগের মাত্র শতকরা ৫ ভাগ এলাকায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বসবাস।

জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টনের প্রভাবক

তোমার নিজের দেশের কোনো অঞ্চলে জনসংখ্যা বেশি, কোথাও একদম কম। এ বিষয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, কিছু প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় রয়েছে যা জনসংখ্যা ঘনত্ব কম বা বেশি হতে সাহায্য করে। এই বিষয়গুলোকে আমরা জনসংখ্যা ঘনত্ব ও বণ্টনের প্রভাবক বলছি। প্রথমত একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) প্রাকৃতিক প্রভাবক ও (২) অপ্রাকৃতিক প্রভাবক।

১। প্রাকৃতিক প্রভাবক (Physical factors)

ভূপ্রকৃতি : মানুষ স্বভাবতই সমভূমি অঞ্চলে, যেখানে কৃষি ও শিল্প গড়ে তোলা যায় সেখানে বসবাস করতে চায়। তাই পৃথিবীর সমভূমি অঞ্চলে ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। আবার পাহাড়ি জঙ্গলময় অঞ্চলে জীবন ধারণ ১৩৫

অনেক কষ্ট, ফলে ঐ সকল অঞ্চলে জনবসতি কম। আমাদের দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব খুবই কম।

জলবায়ু : জলবায়ুর প্রভাব জনবসতির বন্টন নিয়ন্ত্রণ করে। চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর চেয়ে সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে মানুষ বসবাস করতে পছন্দ করে।

মৃত্তিকা : মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য মানব বসতির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। উর্বর মৃত্তিকা কৃষিকাজের উপযুক্ত হওয়ায় এ সকল অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

পানি : যেখানে সুপেয় পানি পাওয়া যায় সেখানে জনবসতির ঘনত্ব বেশি হয়। এজন্য নদীর উপকূলবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি।

খনিজ : খনিজ প্রাপ্তির উপরও জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ভর করে।

২। অপ্রাকৃতিক প্রভাবক (Non-physical factors)

সামাজিক : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থানের জন্য যেখানে বেশি সুযোগ রয়েছে, সে সকল অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি হয়। অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মতো দেশসমূহে প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা না থাকলেও সামাজিক সুবিধাবলি পাওয়ার জন্য অভিবাসনের মাধ্যমে জনসংখ্যা ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক : শিক্ষা, সংস্কৃতি আজকের যুগে মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের সুযোগ যেসব অঞ্চলে বেশি, সেসব অঞ্চলে জনবসতিও বেশি হয়।

অর্থনৈতিক : শিল্পাঞ্চলে, যেখানে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং যেসব অঞ্চল অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যায়, সেখানে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি। যেমন– জাপানের ওসাকা, ভারতের মুম্বাই প্রভৃতি স্থানে জনসংখ্যা ঘনত্ব বেশি।

প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব (Impact of Exessive Population pressure on natural resources)

জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে সরাসরি প্রভাব পড়ে ভূমির উপর। একটি দেশের ভূমি সীমিত হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বেশি খাদ্য উৎপাদনের জন্য ভূমি অধিক ব্যবহার হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূমির ব্যবহার নিম্নোক্তভাবে দেখানো যায়।

ভূমির অধিক ব্যবহার, খণ্ডিতকরণ প্রভৃতির কারণে দিন দিন উৎপাদনযোগ্য ভূমি কমে যাচ্ছে। বসতি বিস্তারের ফলে উন্মুক্তস্থান, জলাশয় প্রভৃতি কমে যাচ্ছে। মাটিতে যে সকল অণুজীব ও ক্ষুদ্রজীব বাস করে তা বাধাগ্রস্ত হয়। দূষিত মাটিতে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। ফলে ভূমি মরুকরণ হতে থাকে। তাই যে কোনো দেশের ভূমি ব্যবহার সঠিকভাবে করার জন্য জনসংখ্যার ভারসাম্য থাকা দরকার।

ভূমি

- অধিক ফসল চাষ → উর্বরতা হ্রাস → মাটির জৈব উপাদান কমে
- অধিক ফলনের জন্য অধিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার → মাটি দূষিত হয়ে পড়ে
- বন, পাহাড় কেটে আবাসি ভূমিকরণ → ভূমি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ও মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পায়
- কৃষিভূমি খণ্ডিত হয়ে → বসত বাড়ি ও গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত হয়
- ভূমি বিভাজন → নতুন অবকাঠামো স্থাপন এবং বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন
- যোগাযোগের জন্য → ভূমি ব্যবহার বৃদ্ধি, স্কুল, কলেজ ও প্রশাসনকেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভূমি ব্যবহার বৃদ্ধি

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। জনসংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পানির উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ পানি, কিন্তু সকল পানির শতকরা ৯৭ ভাগ লবণাক্ত বা লোনা। তাহলে আমাদের খাবার উপযুক্ত পানি মাত্র শতকরা ৩ ভাগ। পানির ব্যবহার ও ক্ষতিকর দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

পানি

- কৃষিক্ষেত্রে ও সেচ কার্যে ব্যবহার, এতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে।
- পানি বা খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার, ভূনিম্নস্থ পানি অধিক ব্যবহারের ফলে মাটির নিচের পানির স্তর নেমে যাচ্ছে এবং লোনা পানি তলদেশে প্রবেশ করছে যা পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর।
- যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার, এতে তেল ও বর্জ্য সংযুক্ত হচ্ছে।
- শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার, এতে রং, গ্রিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য সংযুক্ত হচ্ছে।

জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেলে উপরিউক্ত কাজগুলো বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়, যা পানির উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করে। জলজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ, প্ল্যাংকটন, কচুরিপানা, শেওলা প্রভৃতি জন্মাতে পারছে না। পর্যায়ক্রমে ছোট মাছ ও বড় মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে জলজ সম্পদ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবাসস্থল নির্মাণ, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি ভূমি হ্রাস প্রভৃতির কারণে বন, পাহাড় প্রভৃতি কাটা হচ্ছে, ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

কাজ : তোমার চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদ (পানি, ভূমি ও বনজ) কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার চার্ট তৈরি কর।

সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য, যে কোনো দেশের সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা ও সম্পদ জাতীয় উন্নয়নের দুই উপাদান। সম্পদের অবস্থান, পরিমাণ ও গুণগত পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে মানুষের অবদান রাখার সুযোগ খুবই সীমিত। তাই জনসংখ্যার যথাযথ সমন্বয় সাধন করার জন্য জনসংখ্যা নীতি (Population policy) গ্রহণ করা হয়। সমস্যা ও সমন্বয় ব্যবস্থার ভিন্নতার জন্য জনসংখ্যা নীতি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। উপযুক্ত নীতির মাধ্যমে জনসংখ্যা ও সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে যে কোনো দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা যায়।

বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা পরিস্থিতি, সমস্যা ও সমাধান (Current Population of Bangladesh, problems and solutions)

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ২০১৯ সালের ১লা জানুয়ারি বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৭০ হাজার জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১,১১৬ জন (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে জনসংখ্যা ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যা ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

- জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে
- আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি
- নারী-পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান
- দেশের অর্ধেক লোক পরনির্ভরশীল
- জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা কম হ্রাস পেয়েছে
- অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে
- উন্নত দেশগুলোর তুলনায় গড় আয়ুষ্কাল অনেক কম

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Population growth rate) : বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%, ২০০১ সালে ১.৪৮% এবং ২০১১ সালে ১.৩৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি কমেছে তার একটি গ্রাফ তৈরি কর।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

সাল	বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতকরা)
১৯৮১	২.৩১
১৯৯১	২.১৭
২০০১	১.৪৮
২০০৯	১.৫
২০১১	১.৩৭

নিজে করি

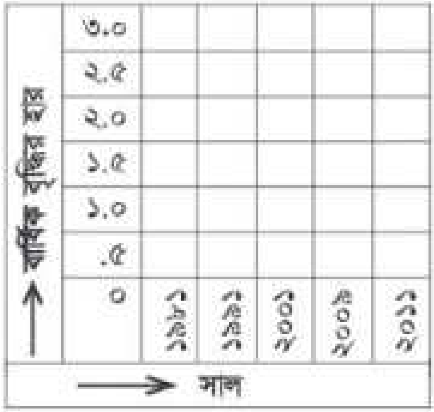

বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যা বণ্টন (Population distribution according to age group)

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তনশীল বয়সের প্রাধান্য। বিভিন্ন সালের গণনা থেকে দেখা যায় দেশের প্রায় অর্ধেক লোক পরনির্ভরশীল শিশু-কিশোর, এছাড়া সামান্য বৃদ্ধ লোকও রয়েছে। ২০০৫ সালের কাঠামো থেকে দেখা যায়, ৬০ থেকে ৯০ বছরের ঊর্ধ্বে জনসংখ্যা ১.৫ মিলিয়নের কম এবং পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি। কাঠামো ব্যবহার করে নিচের কাজটি পূরণ কর।

জনসংখ্যা কাঠামো ২০০৫

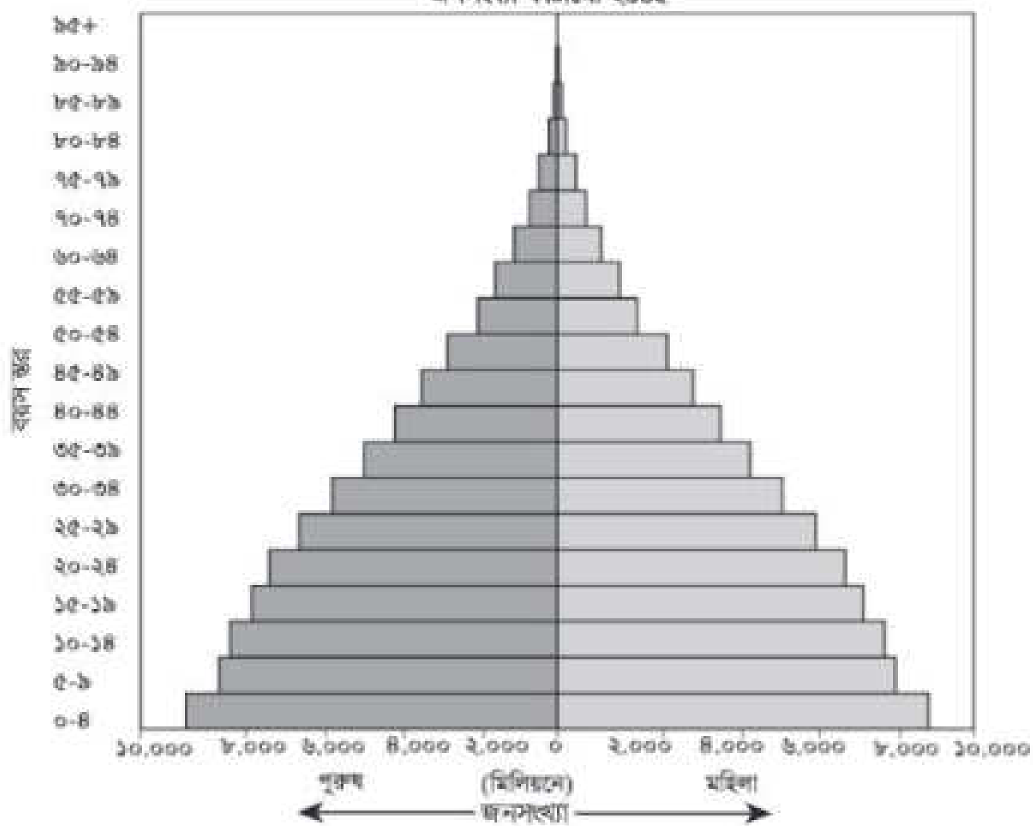

কাজ : ১। সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা কোন বয়সের?
২। কর্মক্ষম জনসংখ্যা কোন বয়স কাঠামোতে?
৩। কর্মক্ষম জনসংখ্যার ও নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত বের কর।

যে কোনো দেশের ভূমি সীমিত এবং প্রাকৃতিক সম্পদ নির্দিষ্ট। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভূমি ও সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবেও কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা (Population problems of Bangladesh)

- জমির খণ্ডবিখণ্ডতা = উৎপাদন হ্রাস
- মাথাপিছু আয় হ্রাস = জীবনযাত্রার মান নিচু
- অত্যাধিক জনসংখ্যা = স্বাস্থ্যসেবার মান কম
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি = স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুল
- মাথাপিছু আয় কম, সঞ্চয় কম এবং বিনিয়োগ কম ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না = বেকারত্ব বৃদ্ধি
- মূল্যবোধের অবক্ষয়, জীবিকার তাগিদে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই প্রভৃতি বৃদ্ধি = সমাজ জীবনে নিরাপত্তার অভাব
- বাসস্থানের চাহিদা বৃদ্ধি এবং জমির ব্যবহার বৃদ্ধি = কৃষি ভূমি হ্রাস
- জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি এবং খাদ্য কম বৃদ্ধি = খাদ্য ঘাটতি
- বন নিধন, পাহাড় কাটা বৃদ্ধি এবং বস্তি বসতি বৃদ্ধি = পরিবেশ দূষণ
- খাদ্য আমদানি বৃদ্ধি = বৈদেশিক মুদ্রা হ্রাস
- অত্যাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট, ভর্তি সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় স্কুল-কলেজের অভাব = শিক্ষার হার কম

বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কৃষি ব্যবস্থা আধুনিকায়ন, দ্রুত শিল্পায়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ স্থান থেকে কম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহে লোক স্থানান্তর করে জনসংখ্যা সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যেতে পারে। এছাড়াও জন্মনিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে।

জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা হলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে এবং জনসংখ্যা সমস্যা হ্রাস পাবে। কর্মদক্ষ জনসম্পদ গড়ে তোলা গেলে সমস্যা হ্রাস পাবে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির মাধ্যমে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান সহজ হয়।

কাজ : উপরের অনুচ্ছেদ থেকে নিচের ছকটি পূরণ কর।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় (Measures to control population in Bangladesh)

জনসংখ্যা সমাধানের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের চেয়ে জনসংখ্যা যেন দ্রুত বৃদ্ধি না পায়, তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা হলো জনসংখ্যা। সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলোও সচেতনতা বৃদ্ধি ও অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল প্রচার করছে। আমাদের সকলের প্রচেষ্টায় এ দেশের জনশক্তি সমস্যা না হয়ে সম্পদে পরিণত হবে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

- জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সফল প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।
- বিলম্ব বিবাহ ব্যবস্থা চালু করা।
- বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা।
- নারী শিক্ষা ও নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- দেশের জনগণের চিত্তবিনোদনের নানাবিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।
- ধর্মান্ধতা, পুত্র সন্তানের উপর নির্ভরশীলতা, বংশ রক্ষা প্রভৃতি কুসংস্কার দূর করা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জনসংখ্যা বণ্টনের কোনটি অপ্রাকৃতিক প্রভাবক?

(ক) অর্থনৈতিক (খ) খনিজ

(গ) মৃত্তিকা (ঘ) পানি

২। কোন সম্পর্কটিকে কাম্য জনসংখ্যা বলা হয়?

(ক) মানুষ ও বনজ সম্পদের ভারসাম্য (খ) মানুষ ও ভূমির ভারসাম্য

(গ) মানুষ ও খনিজ সম্পদের ভারসাম্য (ঘ) মানুষ ও শিল্পের ভারসাম্য

নিচের চিত্র থেকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

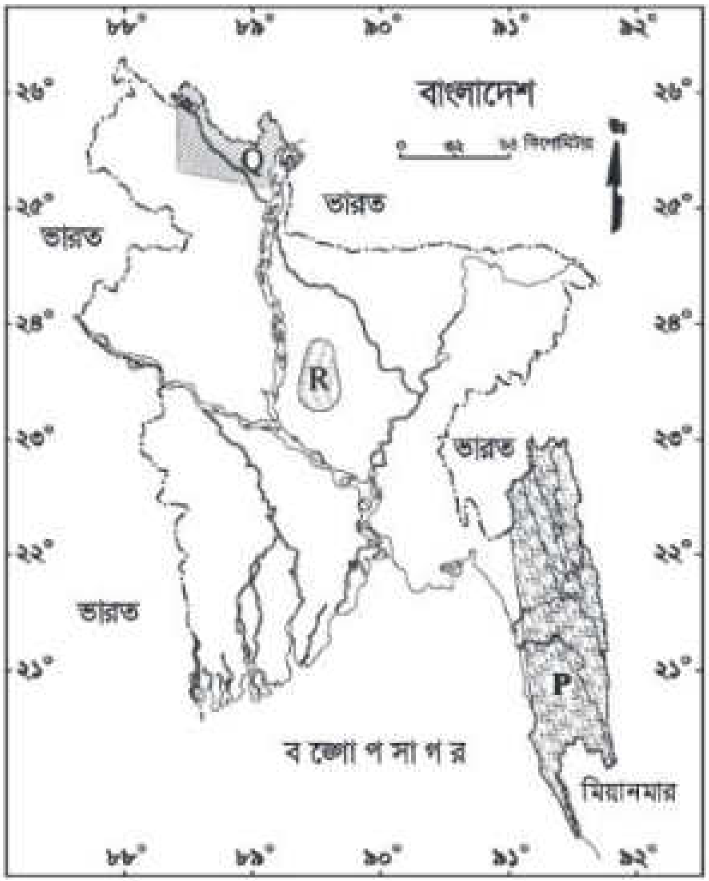

৩। মানচিত্রে '**Q**' চিহ্নিত অঞ্চল থেকে '**R**' চিহ্নিত অঞ্চলে অভিগমনের কারণ–

i. কর্মসংস্থানের অভাব

ii. নদীভাঙন

iii. সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। মানচিত্রে '**P**' চিহ্নিত অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব কম হওয়ার কারণ–

i. ভূমির বন্ধুরতা

ii. অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা

iii. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সম্প্রতি প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গা দেখা দেয়। ফলে নিজেদের জীবন রক্ষার্থে রোহিঙ্গা মুসলমানগণ কক্সবাজারের উখিয়াতে আশ্রয় নেয়।

ক. অভিবাসন কী?

খ. শরণার্থী বলতে কী বোঝায়?

গ. কক্সবাজারের উখিয়াতে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় গ্রহণ কোন ধরনের অভিগমন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রোহিঙ্গাদের অভিগমন ঐ অঞ্চলের সার্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে– বিশ্লেষণ কর।

২।

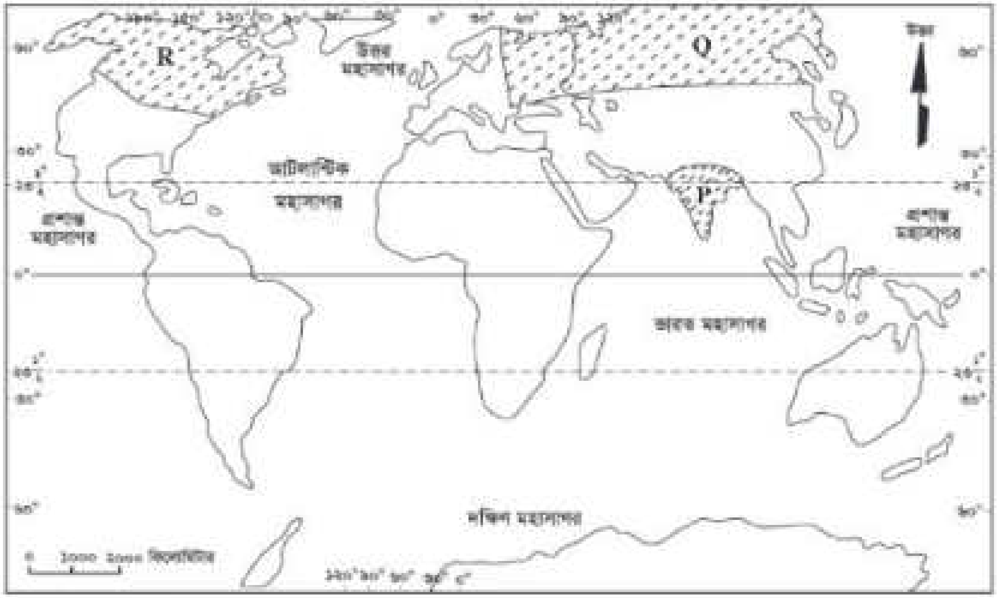

ক. স্থূল জন্মহার কী?

খ. অতি-জনাকীর্ণতা ব্যাখ্যা কর।

গ. মানচিত্রে 'P' চিহ্নিত অঞ্চলে জনসংখ্যা ঘনত্ব অধিক হওয়ার প্রাকৃতিক কারণ বর্ণনা কর।

ঘ. 'Q' ও 'R' চিহ্নিত অঞ্চল দুটির মধ্যে জনসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্য বিশ্লেষণ কর।

২০২৫

অষ্টম অধ্যায়

মানববসতি

Human Settlements

কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানে মানুষ একত্রিত হয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করলে তাকে মানব বসতি বলে। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে উপযোগী করে চলার এটাই প্রথম অবস্থা। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ হলো বসতি স্থাপন। মানুষ প্রাকৃতিক অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানব বসতি গড়ে তোলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক ভিন্নতার জন্য বিভিন্ন ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে, যেমন–মেরু দেশীয় জলবায়ু অঞ্চলের এস্কিমোদের বরফের ঘরে এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামীণ মানুষদের দোচালা ও চৌচালা ঘরে বাস করতে দেখা যায়। আর বিশ্বের বিভিন্ন শহরের বসতিতে আধুনিক নকশা ও নির্মাণসামগ্রী প্রয়োগ করে উচ্চ অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ও শহর উভয় স্থানে বসতি বৃদ্ধির হার বেড়েই চলেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে পরিবেশ দূষণ ব্যাপকভাবে হচ্ছে।

গ্রামীণ বসতি

নগর বসতি

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বসতি স্থাপনের নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- গ্রামীণ বসতি ও নগর বসতির ধরন বর্ণনা করতে পারব;
- গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস বর্ণনা করতে পারব;
- নগরায়ণ কী তা বলতে পারব এবং নগরের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নগরায়ণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজ এলাকার বসতির ধরন ও বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নিজের চারপাশের প্রকৃতি এবং পরিবেশের যত্নের ব্যাপারে সচেতন ও তৎপর থাকব।

বসতি স্থাপনের নিয়ামক (Factors of settlements)

১। **ভূপ্রকৃতি :** জনবসতি গড়ে ওঠার পেছনে ভূপ্রকৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সমতলভূমিতে কৃষিকাজ সহজে করা যায়, কিন্তু পাহাড় এলাকার ভূমি অসমতল হওয়ায় কৃষিকাজ করা কষ্টকর। ফলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কৃষিজমির নিকটে জনবসতি তৈরি হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসতির ঘনত্ব সমতলভূমির তুলনায় কম।

২। **পানীয় জলের সহজলভ্যতা :** জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রথম ও প্রধান চাহিদা হলো বিশুদ্ধ পানীয় জল। এজন্যই নির্দিষ্ট জলপ্রাপ্যতার স্থানে মানুষ বসতি গড়ে তোলে। মরুময় এবং উপমরুময় অঞ্চলে ঝরনা অথবা প্রাকৃতিক কূপের চারদিকে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে বসতি স্থাপন করে। পানীয় জলের প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা এই সমস্ত বসতিকে আর্দ্র অঞ্চলের বসতি বলে।

৩। **মাটি :** মাটির উর্বরা শক্তির উপর নির্ভর করে বসতি স্থাপন করা হয়। উর্বর মাটিতে পুঞ্জীভূত জনবসতি গড়ে ওঠে, কিন্তু মাটি অনুর্বর হলে বিক্ষিপ্ত জনবসতি গড়ে ওঠে।

৪। **প্রতিরক্ষা :** প্রাচীনকালে প্রতিরক্ষার সুবিধার জন্যই মানুষ পুঞ্জীভূত বসতি স্থাপন করে। বহিরাগত শত্রুর আক্রমণ বা বন্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ একত্রে বসবাস করত।

৫। **পশুচারণ :** পশুচারণ এলাকায় সাধারণত বিক্ষিপ্ত বসতি দেখা যায়। পশুচারণের জন্য বড় বড় এলাকার দরকার হয়। ফলে নিজেদের সুবিধার জন্য তারা বিক্ষিপ্তভাবে বসতি স্থাপন করে থাকে।

৬। **যোগাযোগ :** প্রাচীনকাল থেকে যাতায়াত ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে বসতি গড়ে উঠছে। যেমন– নদী তীরবর্তী স্থানে নৌচলাচলের এবং সমতলভূমিতে যাতায়াতের সুবিধা থাকায় এরূপ স্থানগুলোতে পুঞ্জীভূত বসতি গড়ে উঠেছে। যোগাযোগের সুবিধার্থে মিশরের নীলনদের তীরে নীল সভ্যতা এবং সিন্ধু নদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

বসতির ধরন (Types of settlements)

গ্রামীণ বসতি : যে বসতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী জীবিকা অর্জনের জন্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, বিশেষত কৃষির উপর নির্ভরশীল সেই বসতিকে সাধারণভাবে গ্রামীণ বসতি বলে। ভূপ্রকৃতির উপর ভিত্তি করে গ্রামীণ বসতি বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হতে পারে। এর কারণ হলো গ্রামে প্রচুর জমি থাকে। স্বভাবতই, গ্রামবাসীরা খোলামেলা জায়গায় বাড়ি তৈরি করতে পারেন। ঘরবাড়ির কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, নির্মাণ উপকরণ, বাড়ির নকশা ইত্যাদি বিচারে গ্রামীণ বসতি সহজেই চিনে নেওয়া যায় (চিত্র ৮.১)। শহরের ইট-সিমেন্টের নির্মাণ স্থাপনা থেকে গ্রামের মাটির, কাঠের ও পাথরের বাড়িকে সহজেই আলাদা করা যায়। কৃষিপ্রধান গ্রামে গোলাবাড়ি, গোয়ালবাড়ি ও ঘরের ভিতরে উঠান এসবই এক অতি পরিচিত দৃশ্য। গ্রামে উঠানের চারপাশ ঘিরে শোবার ঘর,
১৩২ রান্নাঘর ও গোয়ালঘর তৈরি করা হয়। উঠানে গৃহস্থরা ধান সেদ্ধ করা, শুকানো এবং ধান ভাঙা ছাড়াও

নানান কাজ করে থাকে। গ্রামে শোবার ঘর, রান্নাঘর ও গোয়ালঘর আলাদাভাবে গড়ে ওঠে, যা শহরে হয় না। বসতবাড়িতে অবস্থান আরামদায়ক হওয়া এবং প্রাকৃতিক বায়ুপ্রবাহের সহজ প্রবেশই আলাদাভাবে বসতি গড়ে ওঠার প্রধান কারণ।

চিত্র ৮.১ : গ্রামীণ বসতি

গ্রামীণ বসতিতে পথঘাটের প্রাধান্য থাকে খুব কম। গ্রাম প্রধানত খাদ্য উৎপাদক অঞ্চল। কৃষিকাজের বিভিন্ন অবস্থায় অর্থাৎ বীজতলা তৈরি, চারা রোপণ, ফসল কাটা ও গোলাজাত করা ইত্যাদি ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় বলে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা সহজ ও সরল আন্তরিকতা দেখা যায়। গ্রামীণ বসতি প্রাথমিক উৎপাদন কৃষি ছাড়াও অন্যান্য প্রাথমিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। জীবিকার প্রধান উৎস অনুসারে মৎস্য গ্রাম, মৃৎশিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত কুমারপাড়া, লোহাজাত দ্রব্য তৈরিতে সম্পৃক্ত কামারপাড়া ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় এ ধরনের অনেক গ্রাম রয়েছে।

নগর বসতি : যে বসতি অঞ্চলে অধিকাংশ অধিবাসী শিল্পজাতকরণ, পরিবহণ, ক্রয়-বিক্রয় প্রশাসন, শিক্ষা-সংক্রান্ত কার্য প্রভৃতি ২য় ও ৩য় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে, তাকে নগর বসতি বলে। নগর বসতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি বসতিতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ থাকে এবং যাতায়াতের জন্য পাকা রাস্তা ও যানবাহন থাকে।

চিত্র ৮.২ : নগর বসতি

বাহ্যিক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, শহরে অনেক রাস্তাঘাট ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল আকাশচুম্বী অট্টালিকা (Skyscrapper) রয়েছে (চিত্র ৮.২)। এছাড়া শহরে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্টেডিয়াম, সিনেমা হল, বহুতল দোকানপাট, পার্ক ইত্যাদি থাকে। বড় বড় শহরের বিভিন্ন অংশে নানা ধরনের কর্মকাণ্ড চলে।

কাজ : গ্রামীণ ও নগর বসতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর (একক বা দলে কাজ দেওয়া)।

গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস (Patterns of rural settlements)

অবস্থানের প্রেক্ষিতে ও বাসগৃহসমূহের পরস্পরের ব্যবধানের ভিত্তিতে গ্রামীণ বসতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

১। **গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি (Nucleated settlement) :** এই ধরনের বসতিতে কোনো একস্থানে বেশ কয়েকটি পরিবার একত্রিত হয়ে বসবাস করে (চিত্র ৮.৩)। এই ধরনের বসতি আয়তনে ছোট গ্রাম হতে পারে, আবার পৌরও হতে পারে। এই ধরনের বসতির যে লক্ষণ চোখে পড়ে তা হলো, এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব কম ও বাসগৃহের একত্রে সমাবেশ। সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যই বাসগৃহগুলোর মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যদি স্থানটি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয়, তবে সেখানে আরও বসতি ও রাস্তা গড়ে উঠবে। এভাবে একাধিক রাস্তার সংযোগস্থলে বর্ধিষ্ণু বসতিটি কালক্রমে শহর বা নগরে রূপান্তরিত হবে। সমাজবদ্ধ জীব মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজনে এবং নিরাপত্তার জন্য একত্রে বসবাস করতে চায়। এছাড়া ভূপ্রকৃতি, উর্বর মাটি ও জলের উৎসের উপর নির্ভর করে এ ধরনের বসতি গড়ে ওঠে।

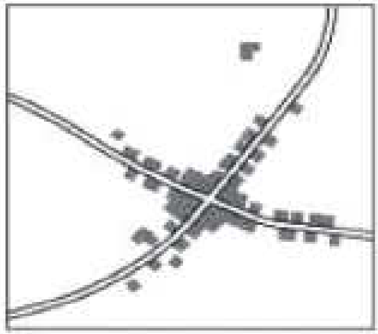

চিত্র ৮.৩ : গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি

২। **বিক্ষিপ্ত বসতি (Dispersed settlement) :** এই ধরনের বসতিতে একটি পরিবার অন্যান্য পরিবার থেকে ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় বসবাস করে (চিত্র ৮.৪)। যেমন বাংলাদেশের বিল অঞ্চলের বসতি।

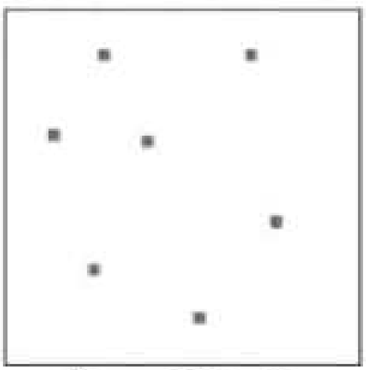

চিত্র ৮.৪ : বিক্ষিপ্ত বসতি

কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের খামার বসতি এবং অস্ট্রেলিয়ার মেষপালন কেন্দ্র এই ধরনের বসতির উদাহরণ। কখনো কখনো দুটি বা তিনটি পরিবার একত্রে বসবাস করে। তবে এক্ষেত্রেও এদের অতি ক্ষুদ্র বসতি অপর ক্ষুদ্র বসতি থেকে দূরে অবস্থান করে। হিমালয়ের বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলে এমন কিছু বসতি আছে, যেখানকার এক অঞ্চলের উপত্যকার অধিবাসীদের সঙ্গে অন্যদিকের উপত্যকাবাসীদের সারা জীবনে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। এই ধরনের বসতিগুলো বিক্ষিপ্ত বসতির পর্যায়ে পড়ে। বিক্ষিপ্ত বসতির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

(ক) দুটি বাসগৃহ বা বসতির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান।

(খ) অতি ক্ষুদ্র পরিবারভুক্ত বসতি।

(গ) অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা।

বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠার পেছনে কতকগুলো প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ কাজ করে। বিক্ষিপ্ত বসতি গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ জলাভাব, জলাভূমি ও বিল অঞ্চল, ক্ষয়িত ভূমিভাগ, বনভূমি এবং অনুর্বর মাটি।

৩। **রৈখিক বসতি (Linear settlement) :** এই ধরনের বসতিতে বাড়িগুলো একই সরলরেখায় গড়ে ওঠে (চিত্র ৮.৫)। প্রধানত প্রাকৃতিক এবং কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক কারণ এই ধরনের বসতি গড়ে উঠতে সাহায্য করে। নদীর প্রাকৃতিক বাঁধ, নদীর কিনারা, রাস্তার কিনারা প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের বসতি গড়ে ওঠে। এই অবস্থায় গড়ে ওঠা পুঞ্জীভূত রৈখিক ধরনের বসতিগুলোর মধ্যে কিছুটা ফাঁকা থাকে। এই ফাঁকা স্থানটুকু ব্যবহৃত হয় খামার হিসেবে। বন্যামুক্ত সমস্ত উচ্চভূমি এই ধরনের বসতির জন্য সুবিধাজনক।

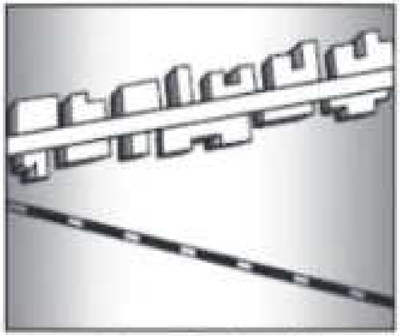

চিত্র ৮.৫ : রৈখিক বসতি

কাজ : গ্রামীণ বসতির ধরন নিচের ছকাকার ঘরে লেখ (দলভিত্তিক কাজ)।		
গোষ্ঠীবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ বসতি	**বিক্ষিপ্ত বসতি**	**রৈখিক বসতি**
• • •	• • •	• • •

নগরায়ণ (Urbanization)

কাজের প্রকৃতি ও বসতির ধরন অনুসারে পৃথিবীর প্রায় সাতশ কোটি মানুষকে গ্রামীণ ও নগর এ দুটো শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। মানুষ যখন তার খাদ্যের জন্য সংগ্রহ এবং শিকারের উপর নির্ভর করত, তখন মানুষ ছিল যাযাবরের মতো। কিন্তু যখন খাদ্য সরবরাহের নিয়ন্ত্রণ খানিকটা তার আয়ত্তে এলো, তখন সে স্থিতিশীল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে আরম্ভ করল। গড়ে উঠল স্থায়ী বসতি বা গ্রাম। অনেকের মতে নগরায়ণ বিকাশের ধারাক্রম হচ্ছে- সংগ্রহ ও শিকার, কৃষি এবং নগরায়ণ।

অনেকের ধারণা নগরের উৎপত্তি লগ্নে অর্থনৈতিক কারণগুলোই প্রাধান্য পেয়েছিল। নীল নদের অববাহিকায় মেমফিস, থেবস (৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব), সিন্ধু অববাহিকায় মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা (২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব) প্রভৃতি নগরের উৎপত্তি ঘটে। এগুলো নগর সভ্যতার সূতিকাগার। প্রাচীনকালে রোম ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নগরী। রোমের পতনের কারণে কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত নগর প্রবৃদ্ধির গতি স্তিমিত ছিল। ইতিহাসে এ সময়টি 'অন্ধকার

যুগ' নামে খ্যাত। অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমানদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত নতুন নতুন শহর ও নগর গড়ে উঠতে থাকে। মুসলমানদের শাসন ইউরোপে স্পেন পর্যন্ত প্রসার লাভ করে এবং টলিডো, কর্ডোভা ও সেভিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাদপীঠে পরিণত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয়গণ বাণিজ্য, বসতি, উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে মোম্বাসা, দারুসসালাম, মালাক্কা, গোয়া, কলকাতা, সায়গন, জাকার্তা, বালটিমোর, ফিলাডেলফিয়া, বোস্টন, কুইবেক, মন্ট্রিয়াল প্রভৃতি শহর ও নগর গড়ে ওঠে। শিল্প বিপ্লবের পর নগরায়ণে নতুন মাত্রা ও গতি পায়। কাঁচামাল হিসেবে কয়লা, লোহা, তামা ও অন্যান্য খনিজসামগ্রী উত্তোলনের কেন্দ্রগুলোতে গড়ে উঠে খনি শহর বা প্রাথমিক উৎপাদন কেন্দ্র। শিল্পকারখানাগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে প্রস্তুতকারী শহর বা দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎপাদন কেন্দ্র। উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দেশে বিক্রি ও রপ্তানি করার জন্য গড়ে উঠে বাজার ও বন্দর বা তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডভিত্তিক কেন্দ্রসমূহ (সেবাকেন্দ্র)। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ নগরায়ণের ফলে নগরে বসবাস করবে। নগরায়ণ দুটি সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত : (১) গ্রামীণ এলাকা থেকে পৌর এলাকায় মানুষের আগমন এবং এর ফলে গ্রামীণ এলাকা অপেক্ষা পৌর এলাকার বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়া; (২) নগরের সঙ্গে জড়িত সংস্কৃতির কতিপয় ধরনসহ গ্রামীণ এলাকায় পৌর প্রভাবের বিস্তার এবং এই প্রভাব প্রসার লাভ করার ফলে অতিমাত্রায় নগরায়িত সমাজে গ্রামীণ ও পৌর জনসংখ্যার মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্য হ্রাস পায়।

কাজ : নগরায়ণ কী? দলে আলোচনা করে পয়েন্টভিত্তিক খাতায়/পোস্টার পেপারে লেখ।

নগরের শ্রেণিবিভাগ (Classification of cities)

ভূগোলবিদরা বিভিন্নভাবে শহর ও নগরের শ্রেণিবিভাগের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন শহর ও নগরের মধ্যে আয়তন, গঠন, জনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য, কার্যকলাপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এসব বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও পৌর বসতির বা নগর বসতির শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের কার্যকলাপের উপর। তাই কার্যকলাপের প্রকৃতিভেদে নগর বসতিগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় :

(১) **সামরিক কার্যকলাপভিত্তিক নগর** : প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে প্রতিটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে সামরিক ও নৌ ঘাঁটির দুর্গসমূহ গড়ে ওঠে। এই সকল স্থানকে আশ্রয় করে কালক্রমে নগর বিকাশ লাভ করে। স্কটল্যান্ডের এডিনবরা, ফ্রান্সের লা-হাভার, রাশিয়ার পিটার্সবার্গ, স্পেনের জিব্রাল্টার, ভারতের আগ্রা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি সামরিক ঘাঁটির নগর।

(২) **প্রশাসনিক নগর :** প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হলো নগর। শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে সাধারণত কোনো কেন্দ্রীয় শহরকে রাজধানীর রূপ দেওয়া হয় এবং সেখানে পৌর বসতির প্রসার ঘটে। বাংলাদেশের ঢাকা, ভারতের নয়াদিল্লি, পাকিস্তানের ইসলামাবাদ, অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা প্রভৃতি প্রশাসনিক নগর।

(৩) **শিল্পভিত্তিক নগর :** নগরায়ণের ক্ষেত্রে শিল্পভিত্তিক কার্যকলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শিল্পকার্য নতুন শহরের জন্ম দিলেও সাধারণত স্থায়ী শহর বা নগরের প্রতি শিল্পের আকর্ষণ অধিক হয়ে থাকে। শিল্পে শক্তি হিসেবে কয়লার ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার পর কয়লা উত্তোলনকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অনেক দেশে কয়লা নগরী গড়ে উঠেছে। যুক্তরাজ্যের নিউ ক্যাসল, ভারতের রানীগঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া ও রাশিয়ার ডোনেৎস অঞ্চলের নগরীসমূহ এইরূপ খনি শহর।

(৪) **বাণিজ্যভিত্তিক নগর :** ক্ষুদ্র বিনিময় কেন্দ্র সম্প্রসারিত হয়ে পৌর বসতিতে রূপান্তরিত হয়। সভ্যতার আদি পর্ব হতে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে দ্রব্য বিনিময়ের প্রথা চালু হয় এবং এই বিনিময়কে কেন্দ্র করে একটি বাজার সৃষ্টি হয়। এই সকল স্থানীয় বাজার বিভিন্ন দিক থেকে আগত পথের মিলনস্থলে গড়ে ওঠে। শহর ও নগর বিকাশের ক্ষেত্রে এর প্রভাব আজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাদেশীয় স্থলপথকে অবলম্বন করে প্রাচীনকালে সিরিয়ার দামেস্ক ও আলেপ্পো, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া এবং মরক্কোর ফেজ শহর গড়ে ওঠে। একইভাবে বাংলাদেশের বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা ও কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম শহর গড়ে উঠেছে।

(৫) **সাংস্কৃতিক কার্যকলাপভিত্তিক নগর :** ধর্মীয় কারণে শহর বা নগরের পত্তন দেখা যায়। কোনো মহাপুরুষের জন্মস্থান বা সমাধি স্থানকে অবলম্বন করে একটি স্থায়ী পৌর বসতির বিকাশ ঘটতে পারে। মক্কা, মদিনা, জেরুজালেম, আজমীর, গয়া, বারানসী প্রভৃতি এরূপ ধর্মীয় কারণ ভিত্তিক শহর। বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি কোনো স্থানে স্থাপিত হলে সেখানে পৌর বসতির বিকাশ ঘটে। প্রাচীন ভারতের নালন্দা, ব্রিটেনের অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ, ইতালির পিসা নগরী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নগর।

অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ যেমন– চিত্রকলা ও চলচ্চিত্র শিল্প ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নগর গড়ে ওঠে। ফ্রান্সের প্যারিস চিত্রকলা, ভারতের মুম্বাই ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হলিউড চলচ্চিত্রের জন্য বিখ্যাত।

(৬) **স্বাস্থ্য নিবাস ও বিনোদনের কেন্দ্র :** কর্মক্লান্ত মানুষের ক্লান্তি দূর ও অবসর বিনোদনের জন্য সাধারণত শহর বা নগরের কোলাহলের বাইরে সমুদ্রসৈকত বা শৈল নিবাসে স্বাস্থ্য ও প্রমোদ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। যেমন– বাংলাদেশের কক্সবাজার, ভারতের পুরী এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামী ও হনলুলু সমুদ্রসৈকত কেন্দ্রিক বিনোদন কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

কাজ : বাংলাদেশের ৫টি নগর উল্লেখ করে গড়ে ওঠার কারণ চিহ্নিত কর।

নগরায়ণের প্রভাব (Impact of urbanization)

নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ :

১। **জনসংখ্যার আকার ও ঘনত্ব :** সাধারণত শহর বৃহৎ জনসংখ্যাবিশিষ্ট এবং ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কোনো বসতিকে শহর হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য কমপক্ষে ৫,০০০ জনসংখ্যা এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,৫০০ জনের বসবাস থাকতে হবে। শহরে জন্ম ও মৃত্যুর বৃদ্ধির হার গ্রামের তুলনায় কম। তবে অভিবাসনের কারণে শহরের জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২। **বসতবাড়ির ধরন :** শহরে সাধারণত ইট, কাঠ, লোহা ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি বহুতলবিশিষ্ট বাড়ির সংখ্যা অধিক। এর ফলে স্বল্প পরিসরে অধিক লোকের সংস্থান হয়। প্রশস্ত রাজপথ, পার্ক, কৃত্রিম লেক প্রভৃতি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা থাকে।

৩। **পরিবহণ ব্যবস্থা :** নগরে যাতায়াতের জন্য অধিকসংখ্যক রাস্তা গড়ে ওঠে। ফলে মানুষ সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবহার করে যাতায়াত করতে পারে।

৪। **পরিবার :** পরিবার হলো মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শহর জীবনে সচরাচর একক পরিবার কাঠামো লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন ধরনের পেশা ও শহরের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে শহরের লোকেরা প্রায় অবসরহীন জীবনযাপন করে। ফলে তারা নিজ নিজ পরিমন্ডলের লোকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না।

৫। **চালচলন :** শহর জীবনে গতিময়তা খুব প্রবল। বিভিন্ন প্রকার পেশা গ্রহণের সুযোগ থাকায় শহরের মানুষ অনেক সময় পেশা পরিবর্তন করে উন্নততর সুযোগ সুবিধা গ্রহণে ব্রতী হয়। এখানে আয় দ্বারা সামাজিক মর্যাদা নির্ধারিত হয়ে থাকে। অপরপক্ষে গ্রামের মানুষ স্বভাবতই রক্ষণশীল। সনাতন সামাজিক রীতির প্রতি গ্রামের মানুষ শ্রদ্ধাশীল থাকে। গ্রামে মানুষের সামাজিক অবস্থা জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়।

৬। **অর্থনীতি :** শহরের মানুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। নগরে মানুষের পেশা বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ। তারা প্রধানত শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, প্রশাসন ও সেবা প্রভৃতি অকৃষি পেশায় নিয়োজিত থাকে।

৭। **সেবা সুবিধা :** নগর জীবনে মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকার সেবা সুবিধা, যেমন– বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও পয়ঃপ্রণালি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি অপরিহার্যভাবে গড়ে ওঠে।

৮। **শিক্ষা ও চিকিৎসা :** নগরে মানুষ শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশিক্ষণপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল প্রভৃতি নগরে গড়ে ওঠে।

৯। **বিনোদন ব্যবস্থা :** নগরে কর্মক্লান্ত মানুষের চিত্তবিনোদনের সুযোগ সুবিধা থাকে। সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধুলা প্রভৃতি বিনোদনমূলক কার্যকলাপ নগর জীবনের মানুষকে প্রভাবিত করে।

১০। **অপরাধ বৃদ্ধি :** নগরে অপরাধের ঘটনা বেশি পরিলক্ষিত হয়, যেমন– চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, প্রতারণা ও মারামারি ইত্যাদি। এসব ঘটনা শহরের নাগরিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১১। **রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন :** নগরে নাগরিক সংগঠনগুলো খুব সক্রিয় থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ড শহর থেকেই পরিচালিত হয়। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো নানা ধরনের সাংস্কৃতিক ও লোক ঐতিহ্যের মেলার আয়োজন করে থাকে, যা নগর জীবনকে আনন্দময় করে তোলে।

কাজ : তোমার দেখা নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সুবিধা ও অসুবিধা লিপিবদ্ধ কর।

অপরিকল্পিত নগরায়ণে সৃষ্ট সমস্যা (Problems of unplanned urbanization)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপরিকল্পিত নগরায়ণ পরিবেশের উপর নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে এবং এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ শিল্পোন্নত নয়। তবে শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। নগরায়ণ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে সব নগরের বৃদ্ধির সমানভাবে হচ্ছে না। বড় নগরের বৃদ্ধির গতি ব্যাপক। কেননা সেখানে শিল্পকারখানা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সরকারি প্রশাসন ও সার্ভিস সেক্টর প্রভৃতি ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়।

বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ শহরে বসবাস করে। তুলনামূলকভাবে যদিও শহরবাসীর সংখ্যা বাংলাদেশে কম কিন্তু বর্তমান সময়ে এ হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিবেশগত সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি কমে যাওয়া, খাবার পানি ও উপযুক্ত পয়ঃনিষ্কাশনের সংকট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা, পরিবহন ও যানজট সংকট, বাসস্থানের অভাব ও বস্তির সৃষ্টি, পানি, বায়ু, মাটি ও শব্দ দূষণ, খোলা জায়গা ও বিনোদন ব্যবস্থার অভাব।

বাংলাদেশে জনপ্রতি কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র ০.০৫ একর। শহরগুলো সাধারণত ভালো উর্বরা শক্তি জমির উপর গড়ে ওঠে এবং ক্রমেই কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে দশ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত এক একটি শহরে প্রতিদিন ১,৩৭,৩৬,২৬৩ গ্যালন পানি প্রয়োজন। একমাত্র ঢাকা মহানগরীতে বর্তমানে প্রতিদিন ২৮.৫ কোটি গ্যালন পানি প্রয়োজন। ওয়াসা কর্তৃক সরবরাহের ক্ষমতা ১৮ কোটি গ্যালন এবং এর মধ্যে অপচয় ও অপব্যবহার সাড়ে তিন কোটি গ্যালন। এর কারণে মোট ঘাটতি প্রায় ১৫ কোটি গ্যালনের উপর। শুষ্ক মৌসুমে শহরে পানি সংকট বেশি থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী বিভিন্ন কাজের জন্য একজন মানুষের গড়ে দৈনিক ৭ গ্যালন পানি প্রয়োজন, কিন্তু দেশের শহরবাসী গড়পড়তা এর অর্ধেকও পানি পায় না।

ঢাকা ওয়াসা বুড়িগঙ্গা নদীর পানি চাদনীঘাট থেকে আহরণ করে পরিশোধন ও বিতরণ করে থাকে। এক্ষেত্রে মেঘনা ও যমুনা নদীর পানির ব্যবহার জরুরি। ঢাকা শহরে দিনে গড়পড়তা ৯০০ টন বর্জ্য শহরের নিচু খোলা জায়গায় ফেলা হয়। এসব বর্জ্যের তীব্র দুর্গন্ধ ও চোয়ানি ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানিকে দূষিত করে থাকে। অনেক বস্তি এলাকার লোকজন এসব পানি ব্যবহার করে থাকে, যার কারণে চর্ম রোগসহ কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোর অবস্থা একই।

ক্রমবর্ধমান যানবাহন প্রতিটি নগরে লক্ষণীয়। যানবাহনের ধোঁয়ার সঙ্গে অবাধে পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন, সীসা, অ্যাসবেস্টস, পারদ, নিকেল, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ ভেসে বেড়ায়। এর কারণে হাঁপানি, সর্দি, কাশি ও অন্যান্য এলার্জিজনিত রোগের মাত্রা বেড়ে যায়।

অপরিকল্পিত নগরায়ণ বাসস্থানের তীব্র সংকট সৃষ্টি করে। গ্রাম থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষের আগমনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বস্তি। এর কারণে সৃষ্টি হয় দূষিত পরিবেশ এবং ক্রমান্বয়ে ব্যাপক এলাকার পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। রাস্তাঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠান, চিত্তবিনোদন ব্যবস্থা, সহজলভ্য জ্বালানি, হাটবাজার ইত্যাদি নগরায়ণের আবশ্যকীয় উপাদান। ক্রমবর্ধমান নগরবাসীর জন্য তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে এসবের ব্যবস্থা করা দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া পরিকল্পনাহীন ব্যবস্থাপনা ও দুর্বল অর্থনীতির কারণে পরিকল্পিত নগরায়ণ গড়ে তোলা আরও কঠিন।

কাজ : অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এর তালিকা তৈরি কর (দলভিত্তিক)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মধুপুর বনে কোন ধরনের বসতি গড়ে উঠেছে?

(ক) পুঞ্জীভূত
(খ) বিক্ষিপ্ত
(গ) সংঘবদ্ধ
(ঘ) রৈখিক

২। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?

(ক) বসতি স্থাপন
(খ) পরিবার গঠন
(গ) পেশা নির্বাচন
(ঘ) শিক্ষা গ্রহণ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সাদিয়া এমন একটি জায়গায় বসবাস করে যেখান থেকে সহজেই বাংলাদেশের সব জায়গায় যাতায়াত করা যায়। বর্তমানে এলাকাটিতে রৈখিক বসতি গড়ে উঠেছে। ফলে এখানে প্রশস্ত সড়ক, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও পয়ঃপ্রণালির ব্যবস্থা আছে।

৩। সাদিয়ার এলাকাটির প্রকৃতি কিরূপ?

(ক) পাহাড়ি (খ) সমভূমি

(গ) নদীর তীর (ঘ) বনাঞ্চল

৪। সাদিয়ার এলাকায় কোন পর্যায়ের সুবিধা রয়েছে?

i. নাগরিক সুবিধা

ii. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধা

iii. কর্মকাণ্ডের সুবিধা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাদল ও শুভ্র দুজনেই শহরে বাস করে। তবে শুভ্রর শহরটি একটি প্রশাসনিক শহর। অন্যদিকে বাদল যে শহরে বাস করে সেটি আগে গ্রাম হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু কয়েক বছর আগে সেখানে একটি ইপিজেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তা এখন শহর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

ক. কোন সভ্যতায় নগরায়ণের প্রসার ঘটে?

খ. মাটি কীভাবে বসতি স্থাপনে সহায়তা করে?

গ. বাদলের শহরটি গড়ে ওঠার পিছনে ইপিজেড-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শুভ্রর শহরটি বাদলের শহর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির–যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

২।

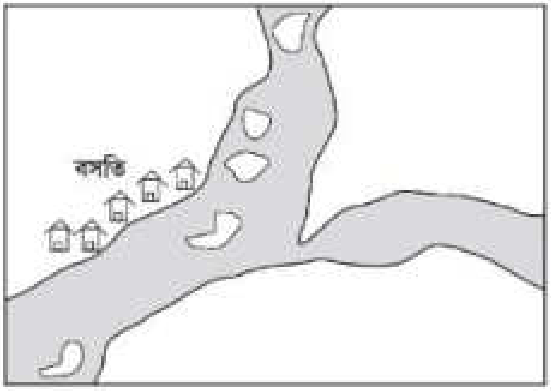

চিত্র ১

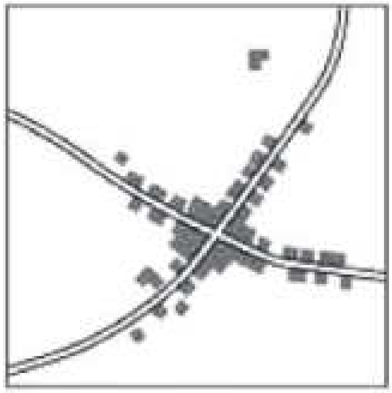

চিত্র ২

ক. গ্রামীণ বসতি কাকে বলে?

খ. বসতি কীভাবে গড়ে ওঠে?

গ. ১ নম্বর চিত্রে বসতি গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ২ নম্বর চিত্রে বসতির গঠন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ কর।

নবম অধ্যায়

সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি

Resources and Economic Activities

মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর জন্য সম্পদ প্রয়োজন এবং এটি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সম্পদের ব্যবহারের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ ভৌগোলিকভাবে কোন কোন ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলির সঙ্গে জড়িত, তা জানা যাবে। আর এ থেকে জানা যাবে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ কী ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছে। আর শিল্প গড়ে ওঠা কোন কোন নিয়ামকের উপর নির্ভর করে এবং বিভিন্ন পণ্যের আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্যহীনতা কেন হয়, তা আমরা জানতে পারব।

অর্থনৈতিক কার্যাবলী

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব এবং সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারব;
- সম্পদ সংরক্ষণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হবো এবং অন্যকেও সম্পদ সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করব;
- অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস ও অবস্থানগত কারণ বিশ্লেষণ করতে পারব;
- আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাণিজ্যিক ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।

সম্পদের ধারণা (Concept of resources)

যা কিছু নির্দিষ্ট প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায় তাই সম্পদ। পেট্রোলিয়াম (খনিজ তেল)-এর ব্যবহার ও উত্তোলন জানার সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে পরিণত হয়েছে। অবস্থানগত কারণে কোনো ভূমির মূল্য কমবেশি হয়। তেমনি ব্যবহার জানার পর অপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রয়োজন হয়। এভাবেই কোনো বস্তু মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়। এক কথায় বস্তুর কার্যকারিতাই সম্পদ।

সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of resources)

সম্পদকে প্রাথমিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়– (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) মানব সম্পদ ও (৩) অর্থনৈতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, অনবায়নযোগ্য সম্পদ খুব ধীর গতিতে সৃষ্টি হয় এবং তাদের সরবরাহের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অনেক সম্পদ আছে যেগুলো সময়ের উত্তরণে কোনোভাবেই প্রভাবিত হয় না, যেমন– কয়লার মজুদ অথবা আকরিক ধাতু। আবার অনেক সম্পদ সময়ের উত্তরণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যেমন– চোয়ানোর মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। নবায়নযোগ্য সম্পদ বলতে বোঝাবে সেই জাতীয় সম্পদ, যা মূলত পুনঃসংগঠনশীল, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তারা বিশেষভাবে পরিবর্তনশীল। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। অন্যদিকে জনসংখ্যাকে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা হয়।

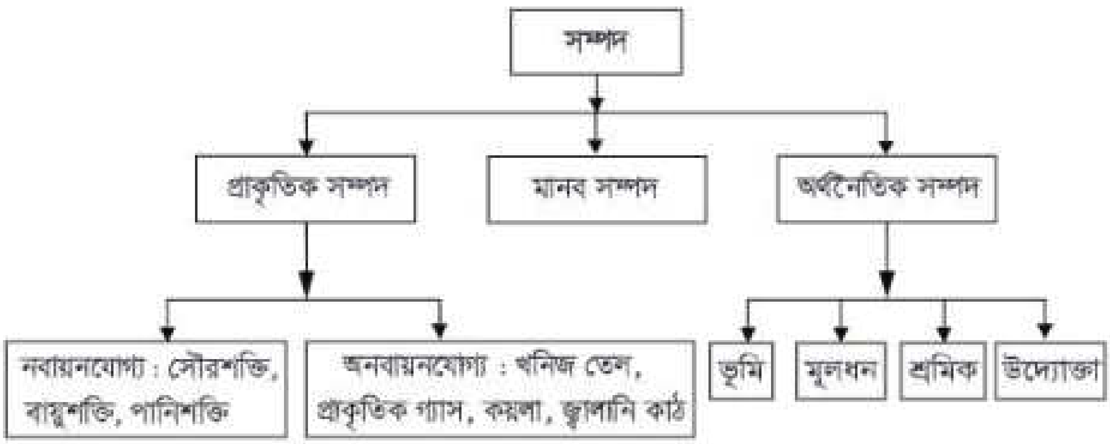

কাজ : বিভিন্ন প্রকার সম্পদের দুটি করে উদাহরণ দাও (একক কাজ)।

সম্পদ সংরক্ষণের উপায় (Conservation of resources)

সম্পদ সংরক্ষণের অর্থ প্রাকৃতিক সম্পদের এমন ব্যবহার, যাতে ঐ সম্পদ যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক লোকের দীর্ঘ সময়ব্যাপী সর্বাধিক মঙ্গল নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়। সংরক্ষণ ধারণার অপর নাম জীবনাচরণ। শিল্প, মানবিক বৃত্তি, সত্যাচরণ, ন্যায়বিধান, সত্যানুসন্ধান, কর্তব্যপরায়ণতা বা প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার অপর নাম সংরক্ষণ। অর্থনীতিবিদদের মতে, সম্পদ অসীম নয়, সসীম। তাই সম্পদ ব্যবহারের উত্তম ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরি। উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নবায়নযোগ্য সম্পদের বৃদ্ধি

সম্ভব। পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনাই উত্তম ব্যবস্থাপনা। অনবায়নযোগ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হতে পারে, যেমন– তেল পোড়ানো। কিন্তু নবায়নযোগ্য সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সৌরবিদ্যুৎ এবং পানিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করলে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবহৃত বস্তুকে রিসাইক্লিং করে পুনরায় সম্পদরূপে ব্যবহার করা যায়, এতে সম্পদের অপচয় কম হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন সম্পদের বাছাইকরণ অর্থাৎ একের পরিবর্তে অন্যটির গুরুত্ব অনুধাবনের মাধ্যমে সম্পদের উপযোগিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অজৈব সারের প্রয়োগে প্রাথমিকভাবে ফলন বাড়লেও, পরবর্তীতে অধিক সারের প্রয়োগে জমির ক্ষতি সাধিত হয়। এরূপক্ষেত্রে জৈবিক সারের বৃদ্ধি সাধনের ব্যাপারটি চিন্তা করা যায়। কৃষি মৃত্তিকা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রকমের মৃত্তিকা সংরক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন– সোপান চাষ ও শস্য আবর্তন। এছাড়া অকৃষি অঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে মৃত্তিকাকে সংরক্ষণ করা যায়। তাই বাংলাদেশের ভূমি, পানি, বিভিন্ন খনিজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় সকলকে সচেতন হওয়া উচিত এবং এগুলোর অপচয় রোধ করা গেলে আমাদের সম্পদের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। এক্ষেত্রে (3R : Reduse, Reuse, Recycle) সম্পদ সংরক্ষণে সম্পদের ব্যবহার হ্রাস, সম্পদের পুনর্ব্যবহার ও সম্পদের পুনঃনবায়ন এই তিন পদ্ধতির ব্যবহার জরুরি।

কাজ : সম্পদের অপচয় কীভাবে রোধ করা যায়? (দলীয় কাজ)

অর্থনৈতিক **কর্মকাণ্ড** (Economic activities)

পণ্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের উৎপাদন, বিনিময় এবং ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো মানবীয় আচরণের প্রকাশই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তিন ভাগে বিভক্ত : প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায়।

প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (Primary economic activities) : প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি কাজ করে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে, প্রকৃতি এই বীজকে অঙ্কুরিত করে শস্যে পরিণত করে। প্রকৃতির এই অবদান মানুষ পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করে। পশু শিকার, মৎস্য শিকার, কাঠ সংগ্রহ, পশুপালন, খনিজ উত্তোলন এবং কৃষিকার্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (Secondary economic activities) : দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কর্মকাণ্ড দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠন করে, আকার পরিবর্তন করে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। খনিজ লৌহ আকরিক উত্তোলন করে তা থেকে লৌহশলাক, পেরেক, টিন, ইস্পাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত করা হয়। রন্ধনকার্য থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ (Manufacturing) সকল প্রকার কার্যই দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (Tertiary economic activities) : তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ড থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। কোনো দেশের উৎপাদিত পণ্যের উদ্বৃত্তাংশ ঘাটতি অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করলে ঐ বস্তুর উপযোগিতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এটা সম্ভবপর হতে পারে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদির মাধ্যমে। পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা, পরিবেশক, ব্যাংকার, শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, আইনজীবী, ধোপা, নাপিত, রিকশাচালক প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার জনসমষ্টির কর্মকাণ্ড তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

কাজ : দোকানদার, কামার, শিক্ষক, কৃষক, ব্যবসায়ী, নার্স-এর অর্থনৈতিক কার্যকে নিচের ছকে উপস্থাপন কর (দলীয় কাজ)।

প্রথম পর্যায়	দ্বিতীয় পর্যায়	তৃতীয় পর্যায়

অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (Eeconomic activities of undeveloped, developing and developed countries)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর বিশ্বকে অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশসমূহের শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, যেমন– বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভুটান, নেপাল, কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, জাম্বিয়া ইত্যাদি দেশ। এসব দেশের লোকজন কৃষিকার্য, মৎস্য শিকার, পশুপালন, কাঠ আহরণ ও কায়িক শ্রমে নিয়োজিত আছে। আর উন্নত বিশ্বের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, চীন, ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের শতকরা ৮০ ভাগের উপরে মানুষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছে। যেমন– কারখানার শ্রমিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, নার্স, ব্যবসা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, রাজনীতি, গবেষণা ও জনসেবায় নিয়োজিত থাকে। এসব দেশে শিক্ষার হার, জীবনযাত্রার মান ও মাথাপিছু আয় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক বেশি।

শিল্প গড়ে ওঠার নিয়ামক (Factors of industrial development)

শিল্প প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো হলো– (১) জলবায়ু, (২) শক্তি সম্পদের সান্নিধ্য, (৩) কাঁচামালের সান্নিধ্য এবং অর্থনৈতিক নিয়ামকগুলো হলো– (৪) মূলধন, (৫) শ্রমিক সরবরাহ, (৬) বাজারের সান্নিধ্য, (৭) সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা, (৮) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, (৯) সরকারি বিনিয়োগ নীতি, (১০) স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ (Natural factors)

(১) **জলবায়ু :** জলবায়ু বলতে এখানে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, জলীয়বাষ্প ও আর্দ্রতা ইত্যাদির প্রভাবকে বোঝানো হয়েছে। অধিক তাপমাত্রার কারণে উষ্ণমণ্ডলীয় দেশগুলোতে কলকারখানা গড়ে তোলা কঠিন, কারণ কারখানার শ্রমিকরা অল্প পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এতে পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। অথচ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় ও শীতপ্রধান দেশগুলোতে কলকারখানার শ্রমিকরা দীর্ঘক্ষণ পরিশ্রম করতে পারে। বস্ত্র শিল্প স্থাপনের জন্য আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন হয়, যদিও কৃত্রিম উপায়ে এখন কারখানার ভিতরে আর্দ্রতার ব্যবস্থা করা যায়। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে শিল্পের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে।

(২) **শক্তি সম্পদের সান্নিধ্য :** শক্তি সম্পদের উপরও শিল্পের অবস্থান নির্ভরশীল। কারণ কারখানা চালানোর জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। বড় বড় কারখানা চালানোর জন্য কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, জলবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি ব্যবহৃত হচ্ছে। সস্তায় শক্তি সম্পদ ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। যে সকল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে, সেখানেই সাধারণত বিভিন্ন প্রকার শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়।

(৩) **কাঁচামালের সান্নিধ্য :** শিল্পকারখানার জন্য কাঁচামালের প্রয়োজন। তাই যে স্থানে কাঁচামাল পাওয়া যায়, সেই স্থানে বা এর নিকটে শিল্প গড়ে ওঠে। যেমন– বাংলাদেশের রাঙামাটির চন্দ্রঘোনায় বাঁশ ও বেত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় বলে সেখানে কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ (Economic factors)

(৪) **মূলধন :** শিল্প স্থাপনে মূলধনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ ভূমি ও কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয়, শ্রমিকের বেতন এবং পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। যে সকল স্থানে মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে সেখানেই শিল্প গড়ে ওঠে। কোনো দেশে মূলধনের অভাব হলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

(৫) **শ্রমিক সরবরাহ :** কারখানায় কাজ করার জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ঘনবসতিপূর্ণ দেশে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় বলে ঐ সকল দেশে অধিক শিল্প গড়ে ওঠে। কোনো কোনো শিল্পের জন্য প্রচুর সুদক্ষ অথচ সস্তায় শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এবং পাট শিল্প এই জাতীয় শিল্প।

(৬) **বাজারের সান্নিধ্য :** শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য উপযুক্ত চাহিদাসম্পন্ন বাজারের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত বাজার পাওয়া না গেলে শিল্পের টিকে থাকা দুরূহ হয়ে পড়ে। এজন্য বাজারের নিকটবর্তী স্থানে সাধারণত শিল্প গড়ে ওঠে। যে অঞ্চলে জনবসতি ঘন, সেই অঞ্চলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বেশি।

(৭) **সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা :** শিল্প স্থাপনের জন্য ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। যে দেশে সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথ যত উন্নত, সেই দেশে অধিকসংখ্যক শিল্প

গড়ে উঠেছে। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো বলেই বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছে।

(৮) আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার : শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতীত কোনো দেশের পণ্য বিশ্বের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। কারণ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী। এজন্য জাপান, চায়না, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের পণ্যের চাহিদা বিশ্বব্যাপী।

(৯) সরকারি বিনিয়োগ নীতি : শিল্পে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে কোনো দেশের সরকারকে প্রণোদনামূলক কিছু নীতি গ্রহণ করতে হয়। কোনো দেশের ঘোষিত বিনিয়োগ নীতি বিনিয়োগকারীদের যত অনুকূল হয়, শিল্প স্থাপনের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পায়।

(১০) স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা : রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হচ্ছে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের অন্যতম নিয়ামক। পৃথিবীর যে দেশসমূহে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়, সেই দেশসমূহে শিল্প স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাতে দেশের অর্থনীতি মজবুত হয়।

শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস (Classification of Industries)

খনিজ, কৃষিজ, প্রাণিজ ও বনজ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গড়ে ওঠে। সাধারণত শিল্পের আকার অনুসারে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) ক্ষুদ্র শিল্প, (২) মাঝারি শিল্প, (৩) বৃহৎ শিল্প।

(১) ক্ষুদ্র শিল্প : যে শিল্পে কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধনের প্রয়োজন হয়। এ শিল্পে শ্রমিক ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও উপকরণের সাহায্যে উৎপাদন সম্পন্ন করে থাকে। কম কাঁচামালে স্বল্প উৎপাদন করা হয়। এই ধরনের শিল্পগুলো গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠে, যেমন– তাঁত শিল্প, বেকারি কারখানা, ডেইরি ফার্ম প্রভৃতি।

(২) মাঝারি শিল্প : যে শিল্প শতাধিক শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত হয়, তাকে মাঝারি শিল্প বলে। যেমন– চামড়া শিল্প ও তৈরি পোশাক শিল্প ইত্যাদি।

(৩) বৃহৎ শিল্প : এই শিল্পে ব্যাপক অবকাঠামো, প্রচুর শ্রমিক ও বিশাল মূলধনের প্রয়োজন হয়, যেমন– লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প, মোটরগাড়ি, জাহাজ ও বিমান শিল্প প্রভৃতি। একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার আয় এবং হাজার হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এই শিল্প সাধারণত শহরের কাছাকাছি স্থানে গড়ে ওঠে।

আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য (Import and export trade)

পৃথিবীর কোনো দেশই সকল সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রটোকল মেনে তাদের জনগণের চাহিদা অনুসারে পণ্য আমদানি এবং উদ্বৃত্ত পণ্য অন্য দেশে রপ্তানি করে থাকে। আর এটাকেই আমরা আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বলে থাকি। যেমন– জাপান লৌহ ও ইস্পাতের তৈরি ভারী যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, মোটরগাড়ি, জাহাজ ও বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য রপ্তানি করে এবং এ দেশ বিভিন্ন দেশ থেকে লোহা ও কয়লা আমদানি করে। বাংলাদেশ চাল, গম, ভোজ্যতেল, সুতা, পেট্রোলিয়াম শিল্পসামগ্রী, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি আমদানি এবং তৈরি পোশাক, কৃষিজাত পণ্য, চা, চামড়া, সিরামিকসামগ্রী, জুতা, হিমায়িত খাদ্য, কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য ইত্যাদি রপ্তানি করে। এভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পরস্পরের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে।

বাণিজ্যিক ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক (Trade balance and development of relationship)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য সমান নয়। অর্থাৎ আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। বিশ্বের যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য এবং সেই সঙ্গে উন্নয়ন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশের সঙ্গে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তবে উন্নয়ন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে অসম বাণিজ্যিক সম্পর্কের ব্যবধান কমতে পারে। চীন ও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ এই সব দেশ থেকে বাংলাদেশ রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি করে থাকে। এটাকে বাণিজ্য ঘাটতি বলে। অন্যদিকে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রপ্তানি বাণিজ্যে এগিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সাথেও বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত অবস্থানে রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানির অনুপাতের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ভারসাম্য বিদ্যমান (সারণি ১)।

সারণি ১ : বাংলাদেশের গত ৬ বছরের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতা

বছর	আমদানি (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	রপ্তানি (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি ব্যয় বেশি (মিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০১৫	৪০৬৮৫.০	৩১২০৮.৯	৯,৪৭৬.১
২০১৬	৩৯৭১৫.০	৩৪২৫৭.২	৫,৪৫৭.৮
২০১৭	৪৩৪৯১.০	৩৪৬৫৫.৯	৮,৮৩৫.১
২০১৮	৫৪৪৬৩.২	৩৬৬৬৮.২	১৭,৭৯৫.০
২০১৯	৫৫৪৩৮.৫	৪০৫৩৫.০	১৪৯০৩.৫
২০২০	৫০৬৯১.০	৩৩৬৭৪.১	১৭০১৬.৯

উৎস : ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, বার্ষিক রিপোর্ট, ২০১৫ থেকে ২০২০ পর্যন্ত

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য কোনটি?

(ক) ভোজ্যতেল (খ) পোশাক

(গ) পেট্রোলিয়াম পদার্থ (ঘ) ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি

২। কীভাবে নবায়নযোগ্য সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়?

(ক) উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে (খ) সংরক্ষণের মাধ্যমে

(গ) কর্তব্যপরায়ণ হয়ে (ঘ) জীবনাচরণের মাধ্যমে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তুহিন যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করে তার বিপুল শ্রমিকের সংখ্যা, বিশাল মূলধন ও ব্যাপক অবকাঠামো রয়েছে।

৩। তুহিন কোন শিল্পকারখানায় কাজ করে?

(ক) সাইকেল (খ) বৃহৎ শিল্প

(গ) টেলিভিশন কারখানা (ঘ) মোটরগাড়ি

৪। এই ধরনের শিল্পের অবস্থান হয়ে থাকে–

i. শহরের পাশে

ii. শহরের কাছাকাছি

iii. শহরের ভিতর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঢাকার অদূরে ডেমরা থেকে নারায়ণগঞ্জ শহর পর্যন্ত শীতলক্ষ্যা নদীর তীর ঘেঁষে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ইপিজেড, জুটমিলস্, কটনমিলস্ উল্লেখযোগ্য।

ক. কৃষিকাজ কোন ধরনের কর্মকাণ্ড?

খ. বাণিজ্য ঘাটতি বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিল্পগুলো কোন শ্রেণির ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক কারণ বিশ্লেষণ কর।

২। আবেদ এবং শাহেদ দুই বন্ধু। আবেদ বেড়িবাঁধ এলাকায় ৮০টি বিদেশি গরু নিয়ে একটি দুগ্ধ খামার তৈরি করেছে। অপরদিকে শাহেদ আশুলিয়ায় একটি পোশাক শিল্পকারখানা তৈরি করে, যার পোশাকের বিদেশে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

ক. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কত প্রকার?

খ. বাণিজ্যিক ভারসাম্যতা বলতে কী বোঝায়?

গ. আবেদের খামারটি কোন ধরনের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শাহেদের শিল্পটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে কিরূপ ভূমিকা পালন করে উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২০২৫

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ

Geographical Description of Bangladesh

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কর্কটক্রান্তি রেখা এ দেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে। এখানকার বিভিন্ন ধরনের ভূপ্রকৃতি, অনেক নদ-নদী, বঙ্গোপসাগরের অবস্থান এবং ঋতুভিত্তিক পরিবর্তিত জলবায়ু নানান বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে।

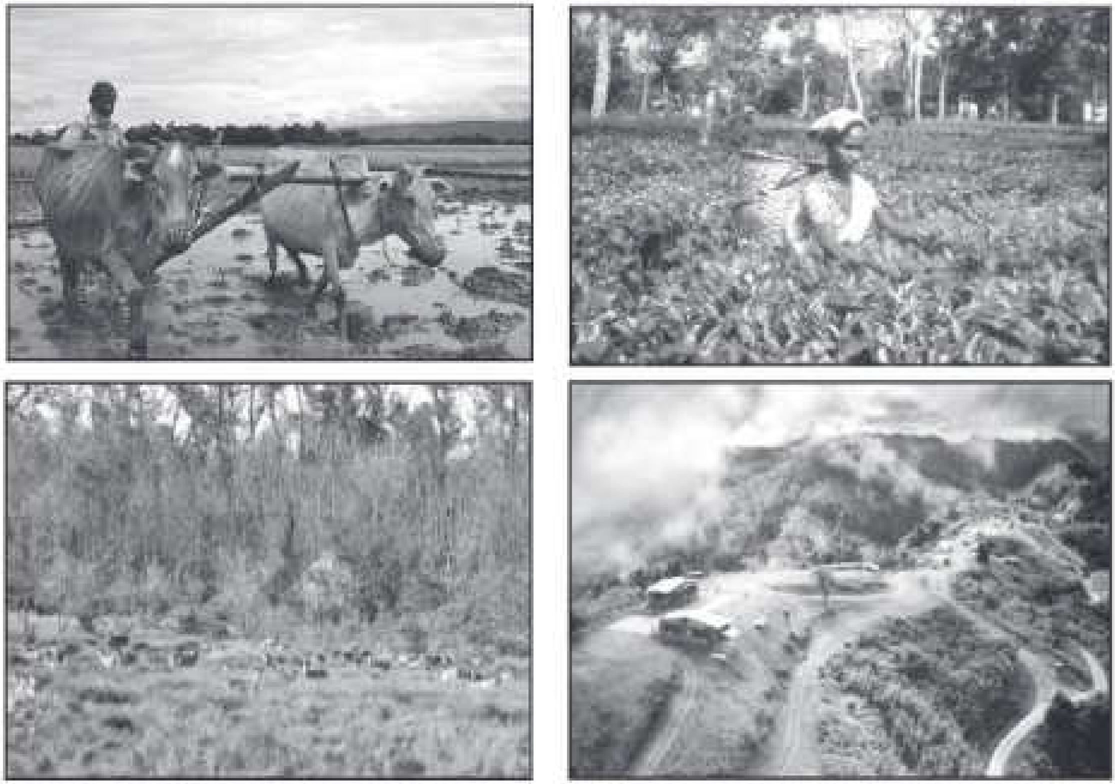

বাংলাদেশের কিছু উল্লেখযোগ্য দৃশ্য

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূপ্রকৃতি বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী, উপনদী এবং শাখানদী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব;
- বাংলাদেশের নদী ও জলাশয় ভরাটের মানবসৃষ্ট কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারব;
- নদী ও জলাশয় ভরাটের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব;
- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব;
- মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং কালবৈশাখী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করব, অন্যকেও এ ব্যাপারে সচেতন করব।

বাংলাদেশের অবস্থান : এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ দেশ ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

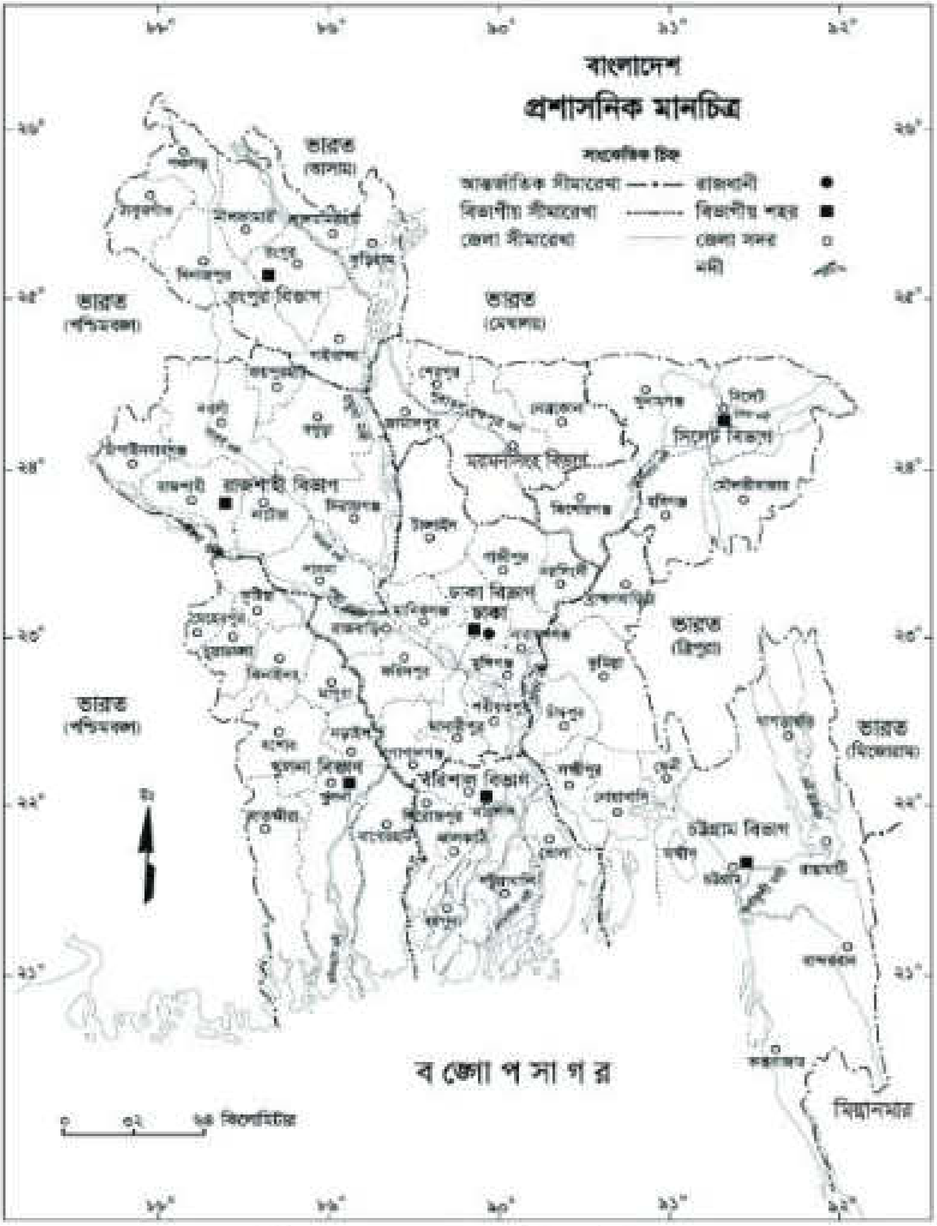

চিত্র ১০.১ : বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র

আয়তন (Area) : বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডে ১০,০৪১.২৫ একর জমি যোগ হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৬–৯৭ সালের তথ্য অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন ৯,৪০৫ বর্গকিলোমিটার। বনাঞ্চলের আয়তন ২১,৬৫৭ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশে উপকূল অঞ্চলে বিশাল এলাকা ক্রমান্বয়ে জেগে উঠেছে। ভবিষ্যতে দক্ষিণ অংশের প্রসার ঘটলে বাংলাদেশের আয়তন আরও বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল, অর্থনৈতিক একান্ত অঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইল এবং সামুদ্রিক মালিকানা মহীসোপানের শেষ সীমানা পর্যন্ত।

মিয়ানমার ও ভারতের দাবিকৃত সমদূরত্ব পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ১৩০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে বাংলাদেশ পেত ৫০,০০০ বর্গকিলোমিটারের কম জলসীমা। বঙ্গোপসাগরের জলসীমা নির্ধারণ ও সমুদ্র সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে মিয়ানমারের বিপক্ষে জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইব্যুনালে এবং ভারতের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত সালিশ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গত ১৪ই মার্চ, ২০১২ সালে বাংলাদেশ-মিয়ানমার মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশের ন্যায্যতাভিত্তিক দাবির পক্ষে ঐতিহাসিক রায় দেয়। এ রায়ের ফলে বাংলাদেশ প্রায় এক লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি জলসীমা পেয়েছে। এ রায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সেন্টমার্টিন দ্বীপকে উপকূলীয় বেজলাইন ধরে ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকা (Territorial sea) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল বা একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive economic zone) পেয়েছে। প্রাপ্ত এই জলরাশি ও তলদেশে এবং তার বাইরে মহীসোপান এলাকার সকল খনিজ সম্পদে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এই হিসেবে উপকূল থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সাগরের তলদেশে বাংলাদেশের মহীসোপান রয়েছে (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার)। অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখণ্ড সমুদ্রে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যার ভৌগোলিক নাম মহীসোপান।

সীমা : বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মিয়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা ৪,৭১১ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার (চিত্র ১০.১)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদী ভারত ও মিয়ানমারের সীমানায় অবস্থিত।

কাজ : নিচের ছকটি জোড়া দলে পূরণ কর।

বাংলাদেশের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাগত অবস্থান কত?	বাংলাদেশের আয়তন কত?	অর্থনৈতিক একান্ত অঞ্চলের ব্যাপ্তি কত?	টেরিটোরিয়াল সমুদ্রসীমার ব্যাপ্তি কত?	বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে বাংলাদেশের তটরেখার দৈর্ঘ্য কত?	সামুদ্রিক মালিকানা মহীসোপানের কোন অংশ পর্যন্ত?

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি (Physiography of Bangladesh)

ভূপ্রকৃতি দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূপ্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ। গঙ্গা নদী পশ্চিম, ব্রহ্মপুত্র নদ উত্তর, সুরমা ও কুশিয়ারা নদী উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে সুবিশাল ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে।

স্থায়ী বসবাসের জন্য সমভূমিই আদর্শ। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশে সামান্য পরিমাণে উচ্চভূমি রয়েছে। ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

নিচে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো (চিত্র ১০.২)।

১। **টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ :** বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো টারশিয়ারি যুগের পাহাড় নামে খ্যাত। পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়। এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– (ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ও (খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

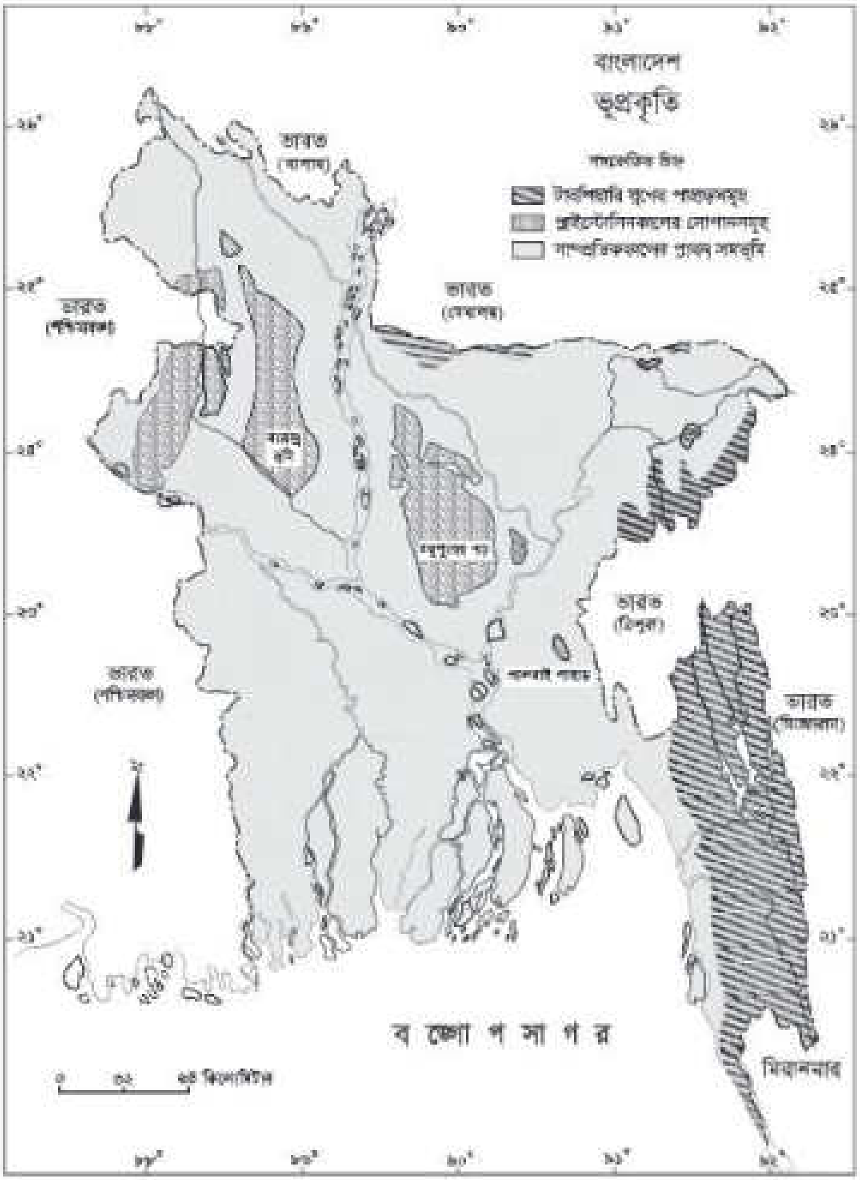

চিত্র ১০.২ : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

(ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ-পূর্বের এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। বান্দরবানের একটি শৃঙ্গের নাম তাজিনডং (বিজয়), যার উচ্চতা ১,২৮০ মিটার। এটিই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।

(খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪

মিটারের বেশি নয়। উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার।

২। **প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ :** আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে। উত্তর-পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। প্লাইস্টোসিনকালে এসব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নিচে এসব উচ্চভূমির বর্ণনা দেওয়া হলো।

(ক) **বরেন্দ্রভূমি :** দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত। প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের।

(খ) **মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় :** টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর।

(গ) **লালমাই পাহাড় :** কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

৩। **সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি :** টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। অসংখ্য ছোট-বড় নদী, বাংলাদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সমতলভূমির উপর দিয়ে এ নদীগুলো প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত মাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার।

এ সমভূমি বাংলাদেশের উত্তর অংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন। সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। সমুদ্র সমতল থেকে বাকি অঞ্চলগুলো যেমন– দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার এবং নারায়ণগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার। এই অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য জলাভূমি ও নিম্নভূমি ছড়িয়ে আছে। এর কিছুসংখ্যক পরিত্যক্ত অশ্বখুরাকৃতি নদীখাত। স্থানীয়ভাবে এগুলোকে বিল, ঝিল ও হাওড় বলে। এদের মধ্যে চলনবিল, মাদারিপুর বিল ও সিলেট অঞ্চলের হাওড়সমূহ বর্ষার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

(ক) রংপুর ও দিনাজপুরের পাদদেশীয় সমভূমি।

(খ) ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেটের অন্তর্গত বন্যা প্লাবন সমভূমি।

(গ) ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে ব-দ্বীপ সমভূমি।

(ঘ) নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি।

(ঙ) খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি।

বাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

কাজ : দলভিত্তিক অ্যাটলাসে বাংলাদেশের মানচিত্র বের করে বিভিন্ন ভূপ্রকৃতি কোন কোন জেলায় পড়েছে? তা চিহ্নিত কর এবং খাতায় লেখ।

বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী (Main Rivers of Bangladesh)

বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০। অধিক সংখ্যক নদী থাকার কারণে বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলে। এজন্য এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির উপর নদীর প্রভাব রয়েছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী। এ নদ-নদীগুলোর উপনদী ও শাখানদী রয়েছে। উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার। নিচে বাংলাদেশের নদীগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো (চিত্র ১০.৩)।

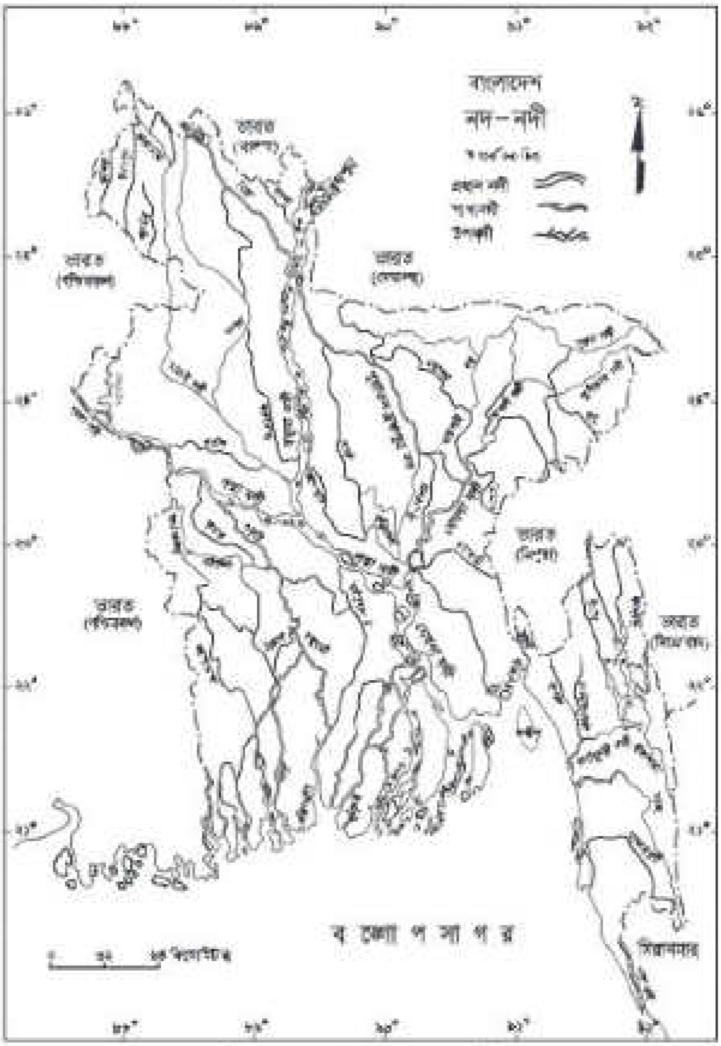

চিত্র ১০.৩ : বাংলাদেশের নদ-নদী

পদ্মা : বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী পদ্মা। ভারতে এই নদীর নাম গঙ্গা। গঙ্গা নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এরপর প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পড়েছে। এরপর ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নামক স্থানে ভাগীরথী (হুগলি নদী) নামে এর একটি শাখা বের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দৌলতদিয়ার নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গঙ্গার মূল ধারা হওয়াতে দৌলতদিয়া পর্যন্ত এই নদীটি গঙ্গা

নদী নামেই পরিচিত। তবে বাংলাদেশে প্রবেশের পর থেকেই স্থানীয়ভাবে অনেকে একে পদ্মা নামে চেনে। গঙ্গা ও যমুনার মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই তিন নদীর মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন হচ্ছে ৩৪,১৮৮ বর্গকিলোমিটার। কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি পদ্মা নদীর প্রধান শাখানদী। পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক ও ট্যাংগন মহানন্দার উপনদী।

ব্রহ্মপুত্র : ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে তিব্বতের উপর দিয়ে পূর্ব দিকে ও পরে আসামের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অতঃপর ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী এবং বংশী ও শীতলক্ষ্যা প্রধান শাখানদী।

যমুনা : ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা নদী নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দৌলতদিয়ার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। করতোয়া ও আত্রাই যমুনার প্রধান উপনদী। ধলেশ্বরী এর শাখানদী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা।

মেঘনা : আসামের বরাক নদী নাগা-মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। উত্তরের শাখা সুরমা পশ্চিম দিকে সিলেট, ছাতক, সুনামগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আজমিরীগঞ্জের কাছে উত্তর সিলেটের সুরমা, দক্ষিণ সিলেটের কুশিয়ারা নদী এবং হবিগঞ্জের কালনী নদী একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে কালনী, সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। মেঘনা ভৈরববাজারের দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে মেঘনা বিধৌত অঞ্চল হচ্ছে ২৯,৭৮৫ বর্গকিলোমিটার। মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী মেঘনার উপনদী।

কর্ণফুলী : আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কর্ণফুলী নদী রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির প্রধান নদী। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী কাসালং, হালদা এবং বোয়ালখালী। কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে 'কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত।

কাজ : দলভিত্তিক ছকটি পূরণ কর (সময়–১৫ মিনিট)।					
প্রধান নদ-নদী	উৎস	পতিত স্থান	গতিপথ	উপনদী	শাখানদী
পদ্মা					
ব্রহ্মপুত্র					
যমুনা					
মেঘনা					

নদী ও জলাশয় ভরাটের কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধ (Causes of river and wetlands filling its impact and prevention)

বাংলাদেশে নদী ও জলাশয় ভরাটের পিছনে বহুবিধ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণ জড়িত রয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র ভূপৃষ্ঠ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। পলিমাটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পানির সংস্পর্শে এটি সহজে দ্রবণে পরিণত হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে এবং এর উজানে প্রতিবেশী দেশ চীন, নেপাল, ভারতের আসাম ও মেঘালয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষাকালে উজান থেকে আসা খরস্রোতা নদীগুলো পাহাড়ি পলি বয়ে নিয়ে আসে এবং নদীতীরে ভাঙনের সৃষ্টি করে। তাটিতে নদীগুলোর স্রোতের গতি কমে যায় তখন নদীগুলোর তলদেশে পলি সঞ্চিত হয়ে ভরাট হয় ও ক্রমে নাব্যতা হ্রাস পায়। দেশের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নদী ও জলাশয়গুলোর দু'ধারে অপরিকল্পিত বাঁধ, সড়ক, কলকারখানা, আবাসিক স্থাপনা নির্মাণ ও পয়ঃনিষ্কাশনের নির্গমন স্থান হিসেবে ব্যবহার এবং নদী-জলাশয়গুলোর অপদখল ও ভরাটকরণের ফলে দ্রুত নদী ও জলাশয়গুলো মরে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নদীগুলো নিয়ে বিরোধ ও ঐগুলো থেকে পানি প্রত্যাহারের ফলে পানির খরস্রোতধারা কমে যাওয়ায় নদীর মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে চর জেগে উঠছে।

নদী ও জলাশয়গুলো ভরাটের কারণে বর্ষাকালে পানির প্রবাহধারা বাধাগ্রস্ত এবং দুকূল উপচিয়ে বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। আর শুষ্ক মৌসুমে ঐগুলোতে পর্যাপ্ত পানি না থাকায় নৌচলাচল, সেচ ব্যবস্থা ও মাছচাষ ব্যাহত হচ্ছে। প্রাকৃতিক পানির জলাধারের সংরক্ষণ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হওয়ায় শহরগুলোতে পানির সরবরাহ কমে যাচ্ছে ও পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। বর্ষা ও শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত নদী ও জলাশয়গুলো ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করে এদের নাব্যতা রক্ষা করা, পরিকল্পিত ও পরিবেশ উপযোগীভাবে বাঁধ এবং অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন অপদখলীয় নদী ও জলাশয় উদ্ধার, পাহাড়কাটা রোধ, কলকারখানার সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে বর্জ্য পরিশোধন ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ভারত, নেপাল ও চীনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক নদী গঙ্গা, তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও ফেনীসহ অন্যান্য নদীগুলোর ন্যায্যতার ভিত্তিতে পানির হিস্যা নিশ্চিত করতে হবে। সামগ্রিক পরিবেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বিদ্যমান পরিবেশ আইন যুগোপযোগী ও কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস করে নদীর পানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।

কাজ : নদী ও জলাশয় ভরাট কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়? দলীয়ভাবে আলোচনা করে খাতায়/পোস্টার পেপারে লেখ।

জলবায়ু (Climate)

বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন। দেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। কিন্তু মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর এত বেশি যে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। এ বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য হয়। কিন্তু কোনো সময়ই শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো চরমভাবাপন্ন হয় না। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬.০১° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় (চিত্র ১০.৪)। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। যথা– (ক) গ্রীষ্মকাল, (খ) বর্ষাকাল ও (গ) শীতকাল।

(ক) **গ্রীষ্মকাল** : বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ ঋতুতে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিচে এ ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের বর্ণনা দেওয়া হলো।

তাপমাত্রা : বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণ ঋতু হলো গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১° সেলসিয়াস। গড় হিসেবে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮° সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। এপ্রিল উষ্ণতম মাস, এ সময় সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বৃষ্টিপাত : কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ঝড় বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবলবেগে মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ গ্রীষ্মকালে হয়। এ সময় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সেন্টিমিটার (চিত্র ১০.৫)।

বায়ুপ্রবাহ : গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধে সূর্যের উত্তরায়ণের জন্য বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বাংলাদেশে দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ অধিক উত্তাপের প্রভাবে উপরে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষে বজ্রসহ ঝড় বৃষ্টি হয়।

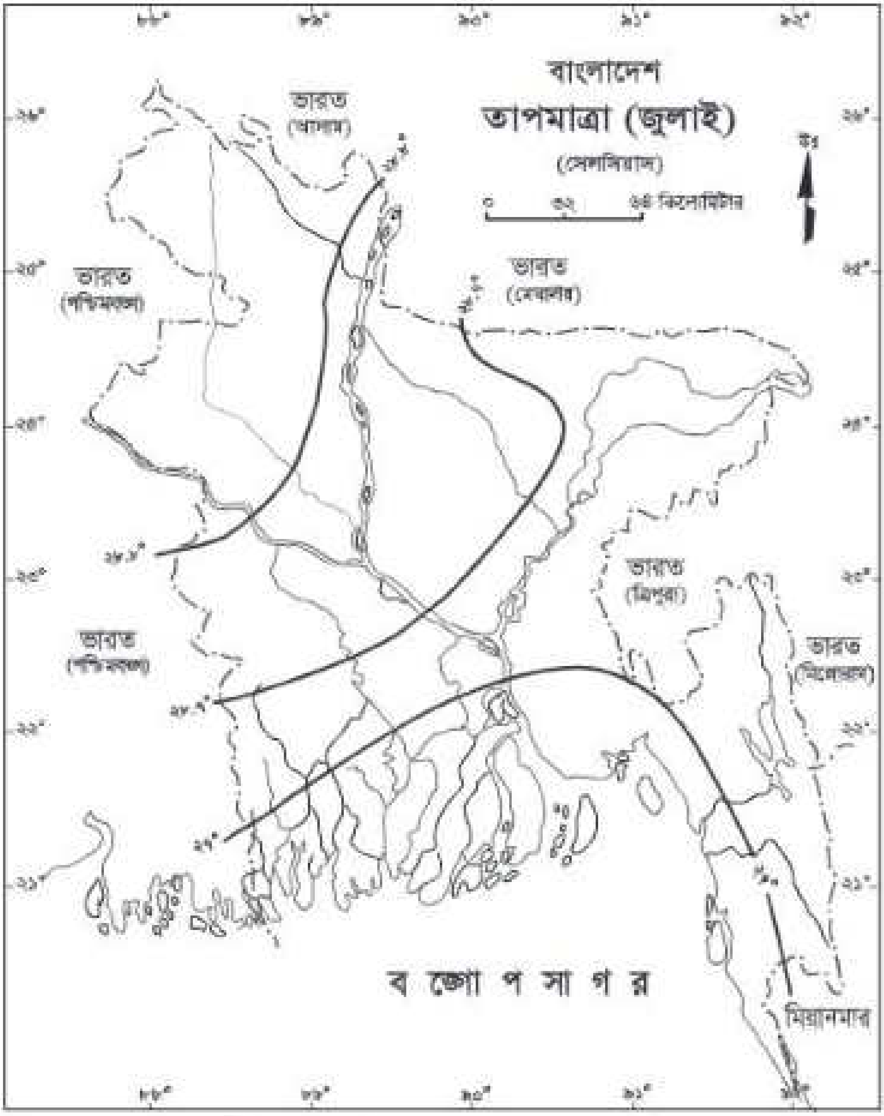

চিত্র ১০.৪ : বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)

(খ) বর্ষাকাল : বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝামাঝি বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল বা বর্ষা ঋতু বলে। জুন মাসের প্রথম দিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায়। নিচে বর্ষা ঋতুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

তাপমাত্রা : বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আকাশে মেঘ থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে এ সময় অধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয় না। গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস।

বৃষ্টিপাত : বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প সমৃদ্ধ থাকে। এ জলীয়বাষ্প শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বছরের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এ সময়ে হয়।

বায়ুপ্রবাহ : জুন মাসে বাংলাদেশের উপর সূর্যের অবস্থানের কারণে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম অয়ন বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করলে বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে পরিণত হয়। বর্ষা শেষে বাংলাদেশে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। জলীয়বাষ্পপূর্ণ এই বায়ু হিমালয় পর্বতে (বাংলাদেশের উত্তরে) বাঁধা পেয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। শুরু হয় বর্ষাকাল।

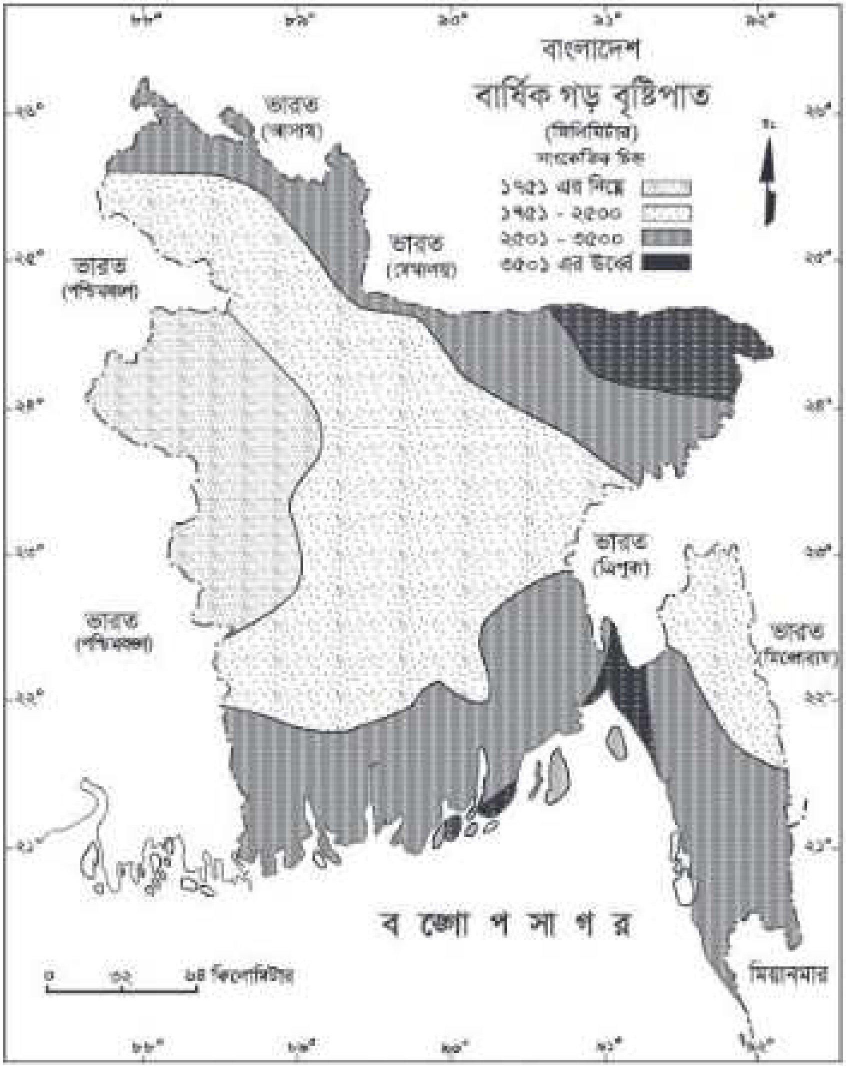

চিত্র ১০.৫ : বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

(গ) শীতকাল : সাধারণত এ দেশে নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাস (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময়কে শীতকাল বলে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের পর তাপমাত্রা কমতে থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে (চিত্র ১০.৬)।

তাপমাত্রা : আমাদের দেশে শীতকালে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস। জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস।

শীতকালে দেশের উপকূল ভাগ থেকে উত্তর দিকে তাপমাত্রা কম থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুরে সর্বনিম্ন ১° সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল।

বৃষ্টিপাত : শীতকালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে। উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু এ সময় বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। শীতকালে সাধারণত উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ সময়ে ১০ সেন্টিমিটারের অধিক নয়।

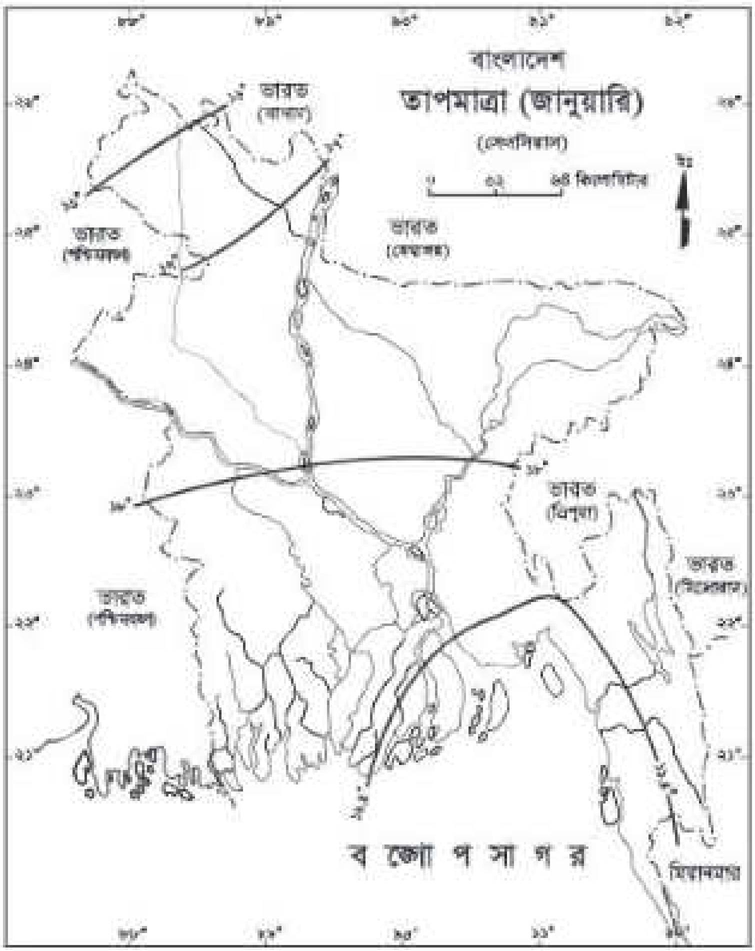

চিত্র ১০.৬ : বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

বায়ুপ্রবাহ : উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। এ সময় বাতাসের সর্বনিম্ন আর্দ্রতা শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ। দেশের উত্তরাঞ্চলের উপর দিয়ে কখনো কখনো তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে বেশ শীত অনুভূত হয়। উত্তরের হিমালয় পেরিয়ে আসা এই বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে।

মৌসুমি বায়ু : মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জুন মাসের প্রারম্ভে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হলে বৃষ্টিপাত হয়। জুন থেকে অক্টোবর

পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বত্র মৌসুমি বায়ু দ্বারা বৃষ্টিপাত ঘটে এবং তখনই এখানে বর্ষাকাল। বর্ষাকালীন সময়ে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে প্রায়ই নিম্নচাপ (Depression) বা ঘূর্ণিবাতের (Cyclone) সংযোগ থাকে। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের চার-পঞ্চমাংশ বর্ষাকালে হয়ে থাকে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য বর্ষাকালে তাপমাত্রা গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা কম থাকে। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এপ্রিল উষ্ণতম মাস। কিন্তু সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রার বিশেষ কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। উষ্ণতা অপেক্ষা আর্দ্রতার উপর নির্ভর করেই এই দুই কালের প্রভেদ করা যায়। গ্রীষ্মকালে বায়ুর উষ্ণতা সাগর থেকে দেশের অভ্যন্তর দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ঝড় বিদ্যুৎ এবং বজ্রসহ প্রবলবেগে মার্চ-এপ্রিল মাসে সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। তীব্র গতি সম্পন্ন কালবৈশাখী ঝড় দেশের প্রচুর ক্ষতি করে। বাংলাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাত কালবৈশাখীর দ্বারা সংঘটিত হয়। গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত ধান, পাট ও আখ চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। অন্যদিকে শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু আমাদের দেশে শৈত্যপ্রবাহের আগমন ঘটায়। এই সময় গম ও রবিশস্য চাষ উপযোগী। প্রকৃতি প্রভাবিত কৃষিকাজই পরিবেশসম্মত ও কৃষকের জন্য লাভজনক।

কাজ : ঋতুভিত্তিক ও পরিবেশসম্মত ফসল চাষ উল্লেখ কর।

গ্রীষ্মকাল	বর্ষাকাল	শীতকাল
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•

কাজ : কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
•	•
•	•
•	•
•	•

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। লালমাই পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?

(ক) গাজীপুর (খ) টাঙ্গাইল

(গ) ময়মনসিংহ (ঘ) কুমিল্লা

২। বাংলাদেশে নদী ভরাটের কারণ–

i. পানিতে মিশ্রিত মাটির অবক্ষেপণ

ii. নদীর উজানে বনভূমি ধ্বংস

iii. নদীর ধারে পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের সারণি অবলম্বনে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অঞ্চল	গড় উচ্চতা (মিটার)	উদ্ভিদ
P	২৪৪	তেলসুর, বাঁশ
Q	৩০	গজারি, কড়াই
R	২১	শাল, হিজল

৩। সারণিতে প্রদর্শিত 'P' অঞ্চলটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

(ক) টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহে (খ) মৌলভীবাজার-হবিগঞ্জে

(গ) রংপুর-দিনাজপুরে (ঘ) নোয়াখালী-কুমিল্লায়

৪। সারণিতে প্রদর্শিত 'Q' ও 'R' অঞ্চলের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে–

i. মৃত্তিকায়

ii. উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের

iii. অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। বাংলাদেশে পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী একত্রে কোথায় মিলিত হয়েছে?

(ক) দৌলতদিয়া (খ) চাঁদপুর

(গ) যশোর (ঘ) কুষ্টিয়া

৬। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস?

(ক) ২৬.০১° (খ) ২৬.০৯°

(গ) ২৭.০১° (ঘ) ২৮.০৯°

৭। বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস কোনটি?

(ক) জুলাই (খ) জুন

(গ) এপ্রিল (ঘ) মার্চ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

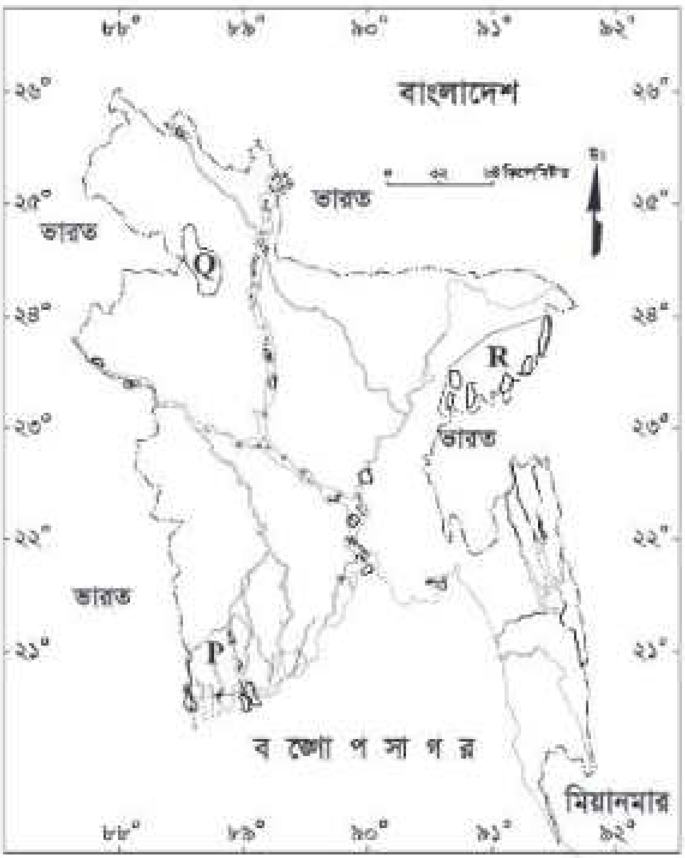

২০১৫

ক. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কী?

খ. প্লাইস্টোসিন কালের সোপান বলতে কী বোঝায়?

গ. মানচিত্রে 'P' চিহ্নিত স্থানের ভূপ্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'Q' ও 'R' চিহ্নিত স্থান দুটির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

২। একদল শিক্ষার্থী দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা ভ্রমণে যায়। সেখানে তারা দেখতে পায় একটি নদীর স্রোতকে কাজে লাগিয়ে এক ধরনের শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে।

ক. ধলেশ্বরী কোন নদীর শাখানদী?

খ. কালবৈশাখী ঝড় কীভাবে সংঘটিত হয়?

গ. শিক্ষার্থীদের দেখা নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উক্ত নদীটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প

Resources and Industries of Bangladesh

একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে সম্পদ ও শিল্পের উপর। প্রাকৃতিক সম্পদকে সরাসরি অথবা অন্যান্য সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে ব্যবহার করা হয়। কৃষিজ ও বনজ সম্পদ, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এ দেশে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের কয়েকটি শিল্প সংক্রান্ত আলোকচিত্র

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য ও তাদের বণ্টন বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বনজ সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হবো এবং সর্বত্র সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারব;
- বাংলাদেশের খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলার অবস্থান মানচিত্রে প্রদর্শনপূর্বক বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রধান শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব এবং মানচিত্রে উপস্থাপন করতে পারব;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রের বর্ণনা করতে পারব এবং মানচিত্রে প্রদর্শন করতে পারব;
- বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- পর্যটক হিসেবে পর্যটন কেন্দ্রের সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিক দায়িত্ব পালন করব।

কৃষিপণ্য (Agricultural Products)

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮ অনুযায়ী, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জিডিপিতে সার্বিক কৃষিখাতের অবদান ১৪.১০ শতাংশ। এ দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪০.৬০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষিখাতে প্রধান রপ্তানি পণ্য হচ্ছে হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা প্রভৃতি।

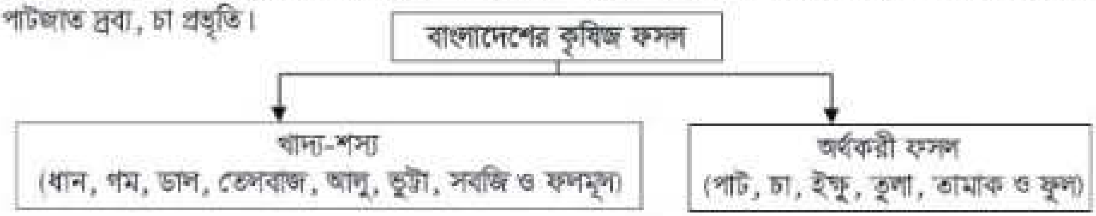

খাদ্য-শস্য (Food Crops)

ধান (Rice)

বাংলাদেশের খাদ্য-শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। এ দেশে আউশ, আমন, বোরো প্রভৃতি ধরনের ধান চাষ হয়। বাংলাদেশের সকল জেলায় ধান উৎপাদিত হয়। রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, ঢাকা, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে ধান চাষ বেশি হয় (চিত্র ১১.১)। তবে রংপুরে আমন ধান ও সিলেটে বোরো ধান ভালো হয়।

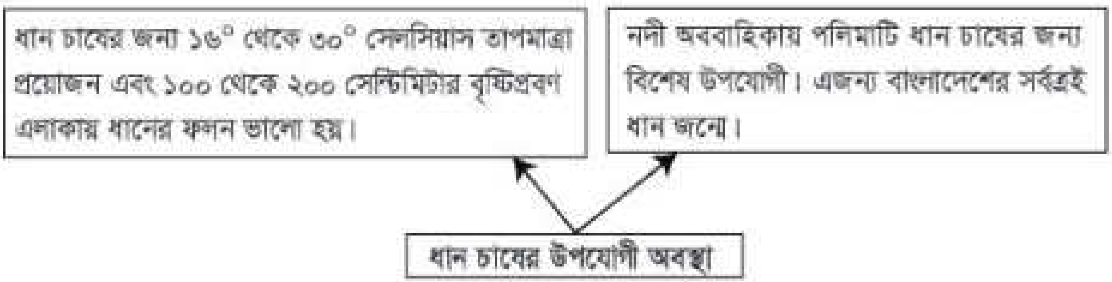

গম (Wheat)

বর্তমানে খাদ্য-শস্যের প্রয়োজনীয়তায় বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই গম চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। দিনাজপুর, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে গম চাষ ভালো হয় (চিত্র ১১.১)।

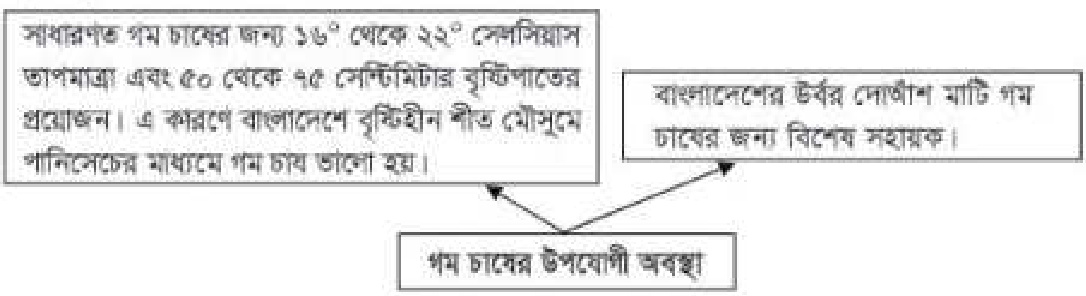

অন্যান্য খাদ্য-শস্যের মধ্যে তেলবীজ (তিল, সরিষা, বাদাম, তিসি) এবং ডাল (মসুর, মুগ, মটর, মাসকলাই, খেসারি) এবং ভুট্টা, যব, আলু, সবজি ও ফলমূল প্রধান। বাংলাদেশে শীতকালে এসব খাদ্য-শস্য কম খরচে চাষ করা যায়। পানিসেচের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। বিদ্যুৎ খরচ কম হয়। ফলে কৃষকের কৃষিপণ্য বিক্রয়ে অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে।

চিত্র ১১.১ : বাংলাদেশের ধান ও গম উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

অর্থকরী ফসল (Cash or Commercial Crops)

যে সকল ফসল সরাসরি বিক্রির জন্য চাষ করা হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে।

পাট (Jute)

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে সাধারণত দুই প্রকার পাট চাষ হয়, দেশি এবং তোষা পাট। রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পাট চাষ ভালো হয় (চিত্র ১১.২)।

পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। পাট চাষের জন্য অধিক তাপমাত্রা (২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস) এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের (১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার) প্রয়োজন হয়।

নদীর অববাহিকায় পলিযুক্ত দোআঁশ মাটি পাট চাষের জন্য বিশেষ সহায়ক।

পাট চাষের উপযোগী অবস্থা

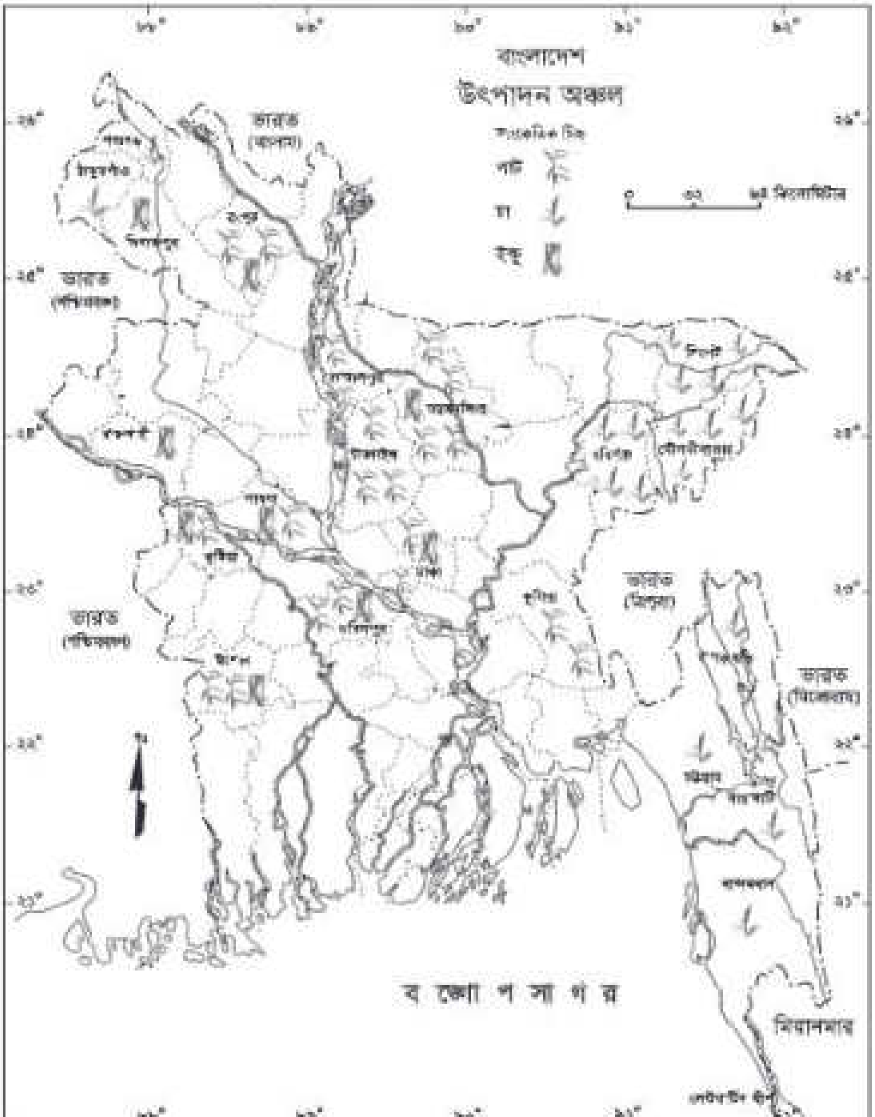

চিত্র ১১.২ : বাংলাদেশের পাট, চা ও ইক্ষু উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ

ইক্ষু (Sugarcane)

চিনি ও গুড় উৎপাদনের জন্য ইক্ষু বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ইক্ষু চাষের জন্য সমতলভূমি প্রয়োজন। রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর ও ময়মনসিংহ ইক্ষু চাষের প্রধান অঞ্চল (চিত্র ১১.২)।

ইক্ষু উৎপাদনের জন্য ১৯° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং কমপক্ষে ১৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন।

বেলে দোআঁশ ও কর্দমময় দোআঁশ মাটিতে ইক্ষু চাষ ভালো হয়।

ইক্ষু চাষের উপযোগী অবস্থা

চা (Tea)

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে চা অন্যতম। দেশে উৎপাদিত চা-এর প্রায় বেশিরভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। পানি নিষ্কাশনবিশিষ্ট ঢালু জমিতে চা ভালো হয়। মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেটে সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে চা চাষ হচ্ছে (চিত্র ১১.২)।

চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। ১৬° থেকে ১৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ মাটিতে চা চাষ ভালো হয়।

চা চাষের উপযোগী অবস্থা

কৃষি ফসলের প্রাকৃতিক নিয়ামক ছাড়াও মূলধন, শ্রমিক, পরিবহন, বাজার প্রভৃতি নিয়ামক-এর সম্প্রসারণ ও উৎপাদনের উপর প্রভাব ফেলে। সরকারি সহযোগিতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয়ে কৃষির সম্প্রসারণ সম্ভব।

শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)

বাংলাদেশে শীতকাল প্রধানত রবিশস্য চাষের জন্য উপযোগী। এক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একই ধরনের শস্য চাষ করা হয়। এর ফলে যেমন কৃষক শস্যের মূল্য কম পায়, তেমনি জমিতে একই শস্য চাষ মাটির পুষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পাশাপাশি বহু ধরনের শস্য চাষ উচ্চ মূল্য প্রাপ্তিতে কৃষককে উপকৃত করে। বিভিন্ন শস্য গাছের অংশ নানা ধরনের জৈব মাটিতে যোগ করে মাটির পুষ্টির ঘাটতি রোধ হয়। ফলে অত্যধিক সার ব্যবহার করতে হয় না।

এভাবে কৃষক বহুমুখী শস্য চাষ করে নিজে এবং পরিবেশকে উপকৃত করতে পারে।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forest of Bangladesh)

বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় বা পাওয়া যায় তাকে বনজ সম্পদ বলে। কোনো দেশের পারস্পরিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট ভূমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭.৪৭৯১ ভাগ। জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বনভূমিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় (চিত্র ১১.৩)।

ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা গাছের বনভূমি : বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের প্রায় সব অংশে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের কিছু অংশে এ বনভূমি বিস্তৃত। পাহাড়ের অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং কম বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে পাতাঝরা গাছের বনভূমি দেখা যায়।

ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি : বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে এ বনভূমি রয়েছে। এ বনভূমিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে– (ক) ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি; (খ) দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় বরেন্দ্র বনভূমি অবস্থিত। শীতকালে এ বনভূমির বৃক্ষের পাতা ঝরে যায়। গ্রীষ্মকালে আবার নতুন পাতা গজায়।

বাংলাদেশের বনভূমি

স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : উত্তরে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা এবং পশ্চিমে রাইমঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আংশিক প্রান্ত সীমা পর্যন্ত এ বনভূমি বিস্তৃত। এটি খুলনা বিভাগের ৬,০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা ও লোনা পানি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য এ অঞ্চল বৃক্ষ সমৃদ্ধ।

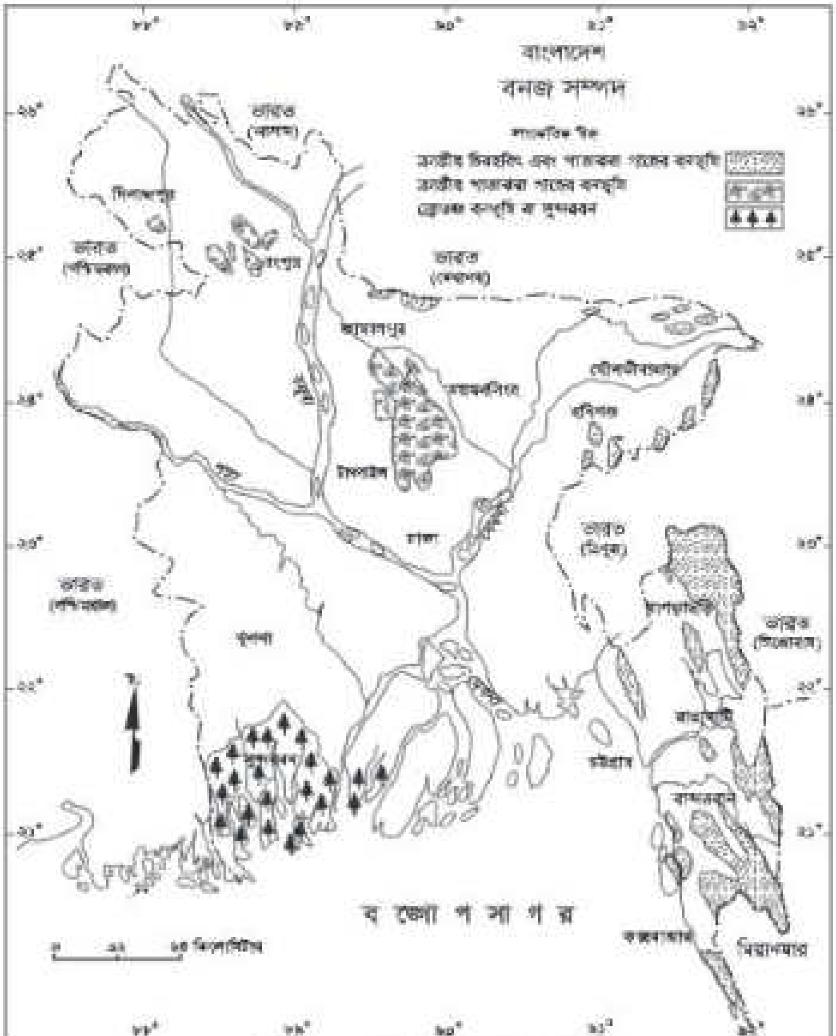

চিত্র ১১.৩ : বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

কাজ : বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য ও নাম দেওয়া হলো। এগুলো কোন বনভূমিতে অবস্থিত তা লেখ।	
উদ্ভিদ ও বৈশিষ্ট্য	**বনভূমির নাম**
১। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, ধুন্দল, কেওড়া ও গোলপাতা সাধারণত স্রোতময় মিঠা ও লোনা পানির সংযোগস্থলে জন্মে। ২। শাল, গজারি, কড়ই, হিজল প্রভৃতি গাছের পাতা একবারে ঝরে যায়। ৩। চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, বাঁশ প্রভৃতি গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না।	

বনাঞ্চলের গুরুত্ব (Importance of forest) : বনজ সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের পরিমাণ সীমিত এবং দিন দিন কমে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম।

১। **প্রাকৃতিক গুরুত্ব :** জীববৈচিত্র্য রক্ষা, মাটি বা ভূমিক্ষয় রোধ, ভূমিধস রক্ষা, বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি, আবহাওয়া আর্দ্র রাখা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

২। **পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা :** সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাময় স্থান। এর জীববৈচিত্র্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। **পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ :** মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম প্রভৃতি বন থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়াও জীবজন্তুর চামড়া ও ভেষজ দ্রব্য বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

৪। **নির্মাণের উপকরণ :** মানুষ বনভূমি থেকে তার ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে।

৫। **শিল্পের উন্নতি :** কাগজ, রেয়ন, দিয়াশলাই, ফাইবার বোর্ড, খেলনার সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। কর্ণফুলী কাগজকল, খুলনার নিউজপ্রিন্ট কারখানা বনজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৬। **দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস :** উপকূলীয় অঞ্চলের বনভূমি সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৭। **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :** বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেললাইনের স্লিপার, মোটরগাড়ি, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদির কাঠামো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রাস্তার পুল প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়।

৮। **সরকারের আয়ের উৎস :** বনজ সম্পদ সরকারের আয়ের একটি উৎস। যেমন– বনজ সম্পদ বিক্রি ও এর উপর কর ধার্য করে সরকার রাজস্ব আয় বাড়িয়ে থাকে।

৯। **কৃষি উন্নয়ন :** বনভূমি দেশের আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক।

১০। **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন :** বনের বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, দাঁত, শিং, পশম এবং কিছু জীবন্ত বন্য জন্তু রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

বনজ সম্পদ ব্যবহারে আমরা যত্নশীল হবো। আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে বনজ জীববৈচিত্র্যের প্রতি যত্নশীল ও রক্ষণশীল হতে হবে।

বাংলাদেশের খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ হিসেবে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ও কঠিন শিলা গুরুত্বপূর্ণ (চিত্র ১১.৪)। দেশের এই খনিজ সম্পদসমূহের অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণের মধ্যে সমন্বয় আনয়ন করলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

খনিজ তেল (Petroleum)

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে খনিজ তেল আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে। এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল তোলা হচ্ছে। অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে পরিশোধন করা হয়। পরিশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, বিটুমিন ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত। এ ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১,২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়।

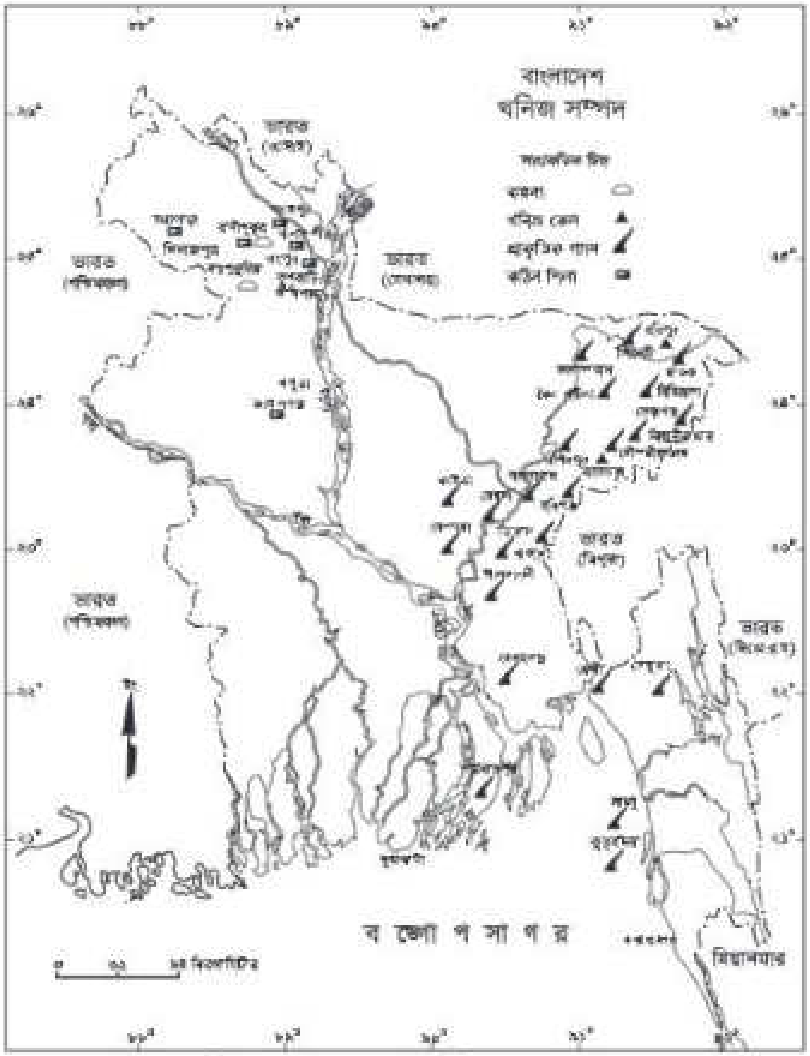

চিত্র ১১.৪ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে। এ যাবৎ আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি। এই গ্যাসক্ষেত্রগুলোর উত্তোলনযোগ্য সম্ভাব্য ও প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ ২৭.৮১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ১৯৬০ থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ১৫.৯৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে এবং ১১.৯২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রমাণিত মজুদ গ্যাস অবশিষ্ট রয়েছে। বর্তমানে ২১টি গ্যাসক্ষেত্রের ১১২টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৯৬৮.৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে। (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৯)।

গ্যাসক্ষেত্র			
উৎপাদনরত	উৎপাদনে যায়নি	উৎপাদন স্থগিত	নতুন আবিষ্কৃত
বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, সিলেট, কৈলাশটিলা, রশিদপুর, তিতাস, নরসিংদী, মেঘনা, সালদানদী, জালালাবাদ, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বিবিয়ানা, বাঙ্গুরা, শাহবাজপুর, সেমুতাং, সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, বেগমগঞ্জ, রূপগঞ্জ।	কুতুবদিয়া	ছাতক, কামতা সাঙ্গু, ফেনী	ভোলা

কয়লা (Coal)

শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসেবেও কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ তত উন্নত নয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আবিষ্কৃত মোট ৫টি কয়লাক্ষেত্রের মোট মজুদ প্রায় ৭,৯৬২ মিলিয়ন টন। কয়লাক্ষেত্রের কয়লা উত্তোলন শুরুর পর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ১০.৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হয়। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়। এছাড়া রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জে কয়লাক্ষেত্র রয়েছে (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৯)।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলা বিল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় নিম্নমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়ার কয়লাক্ষেত্র থেকে উৎকৃষ্টমানের লিগনাইট কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।

কঠিন শিলা (Hard Rock)

রেলপথ, রাস্তাঘাট, গৃহ, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে কঠিন শিলা ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এখান থেকে বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টন শিলা উত্তোলন করা যাবে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়া খনি হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৩৪.২৫ মেট্রিক টন কঠিন শিলা উত্তোলিত হয়েছে। (উৎস : জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৭-২০১৮)।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব

আধুনিক সভ্য জগতে খনিজ তেল একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শক্তি, আলো, তাপ উৎপাদনের জন্য তেল প্রয়োজনীয়। খনিজ তেল পরিশোধিত করে গ্যাসোলিন, ডিজেল গ্যাস, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারক তেল (Lubricant), প্যারাফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি চালাতে পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের তেলক্ষেত্রগুলো হতে তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে উত্তোলিত হলে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব। এছাড়া এককভাবে জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যাবে।

শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ফেঞ্চুগঞ্জের সার কারখানায় ও ছাতকের সিমেন্ট কারখানায় হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াশালের সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কীটনাশক, ঔষধ, রাবার, প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। চা বাগানগুলো রশিদপুরের প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীল। কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফার্নেস তেলের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার হয়। যেমন– সিদ্ধিরগঞ্জ, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক কাজে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

কাজ : এককভাবে নিচের ছকটি পূরণ কর।

শিল্প	ব্যবহৃত গ্যাসক্ষেত্রের নাম
ফেঞ্চুগঞ্জের সার কারখানায়	
ছাতকের সিমেন্ট কারখানায়	
ঘোড়াশালের সার কারখানায়	
সিদ্ধিরগঞ্জের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে	
আশুগঞ্জের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে	

কয়লা জ্বালানি হিসেবে গ্যাসের ও লাকড়ির পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে বড়পুকুরিয়া থেকে উত্তোলিত কয়লার ৬৫ শতাংশ বড়পুকুরিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৩৫ শতাংশ কয়লা ব্যবহৃত হচ্ছে ইটভাটা ও কলকারখানাসহ অন্যান্য খাতে। বনজ সম্পদ রক্ষায় কয়লা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরাসরি কাঠ বা লাকড়ি পোড়ালে পরিবেশের যে দূষণ হয় কয়লা ব্যবহার করলে সেই দূষণ হয় না। বনজ সম্পদ রক্ষা ও দূষণ রোধে কয়লা প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে।

কৃষির উন্নতি, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস, সরকারি আয়ের উৎস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই খনিজ দ্রব্যগুলো যথেষ্ট অবদান রাখে। এগুলো ব্যবহারের প্রতি আমাদের সচেতন ও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আমরা এই মূল্যবান সম্পদগুলোর অপচয় করব না।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্প (Major Industries of Bangladesh)

কোনো দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে শিল্পখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯

অর্থবছরে জি.ডি.পি তে শিল্পখাতের অবদান হলো শতকরা ৩৫.১৪ ভাগ। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হলো–

পাট শিল্প (Jute industry) : বাংলাদেশে কৃষিনির্ভর শিল্পগুলোর মধ্যে পাট শিল্প অন্যতম। এ দেশের পর্যাপ্ত ও উৎকৃষ্ট পাট চাষ হওয়ায় কাঁচামালের সহজলভ্যতা পাট শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করছে। এ দেশে পাটের দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক রয়েছে। সর্বোপরি পাট শিল্পের প্রতি সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে।

বাংলাদেশে বেসরকারিভাবে অনেক পাটকল গড়ে উঠেছে। সরকারি ও বেসরকারি মোট পাটকলের সংখ্যা ২০৫টি (চিত্র ১১.৫)। গড় বার্ষিক উৎপাদন ৬,৬৩,০০০ মেট্রিক টন। আমরা সহজে পাট শিল্পকে নিম্নোক্তভাবে দেখতে পারি।

পাট শিল্প কেন্দ্র অঞ্চল	পাট শিল্পজাত দ্রব্য	রপ্তানির দেশসমূহ
নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, চট্টগ্রাম, ডেমরা, ঘোড়াশাল, নরসিংদী, ভৈরববাজার, গৌরীপুর, মাদারিপুর, চাঁদপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ।	চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি, ব্যাগ, স্যান্ডেল, ম্যাট, পুতুল, শোপিস ও জুটন।	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মিসর, রাশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ইতালি, জার্মানি, জাপান ও ফ্রান্স।

বস্ত্র শিল্প (Cotton Textile Industry)

কার্পাস বয়নশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। মানুষের খাদ্যের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই বস্ত্র শিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এ দেশের আবহাওয়া বস্ত্র শিল্পের অনুকূল। আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের কার্পাস বয়নশিল্পকে কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় (চিত্র ১১.৫)। যেমন–

ঢাকা অঞ্চল	চট্টগ্রাম অঞ্চল	কুমিল্লা ও নোয়াখালি অঞ্চল	রাজশাহী ও খুলনা অঞ্চল
ঢাকার মিরেরবাগ, পোস্তগোলা, শ্যামপুর, ডেমরা, সাভার; নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ, মুড়াপাড়া, কাঁচপুর, ধমগড়, লক্ষণখোলা, ফতুল্লা; গাজীপুর জেলার টঙ্গী, জয়দেবপুর, কালিগঞ্জ; নরসিংদী জেলার নরসিংদী, মাধবদী, বাবুরহাট ও ঘোড়াশাল।	ফৌজদারহাট, উত্তর কাট্টলি, ষোলশহর, পাঁচলাইশ, জুবলী রোড, হালিশহর ও কালুরঘাট।	কুমিল্লার দুর্গাপুর, দৌলতপুর, হালিমানগর, আরিগোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বাঞ্ছারামপুর; নোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী ও রায়পুর।	রাজশাহী বিভাগে রাজশাহী, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা; রংপুর বিভাগে দিনাজপুর এবং খুলনা বিভাগে কুষ্টিয়া, মাগুরা ও যশোর জেলার নোয়াপাড়া।

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে বাংলাদেশের সুতা ও বস্ত্রকলগুলো পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ প্রতি বছর জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে।

কাগজ শিল্প (Paper Industries)

কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের চন্দ্রঘোনায় প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬টি কাগজকল, ৪টি বোর্ড মিলস ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে (চিত্র ১১.৫)।

কাগজকলসমূহ	উৎপাদনের কাঁচামাল	উৎপন্ন কাগজ
চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজকল, পাবনায় পাকশীর উত্তরবঙ্গ কাগজকল, ছাতকের সিলেট মন্ড ও কাগজকল, নারায়ণগঞ্জের বসুন্ধরা কাগজকল, মাগুড়া ও শাহজালাল কাগজকল, খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা, বাংলাদেশ হার্ডবোর্ড মিলস, আলমজী পার্টিক্যাল বোর্ড মিলস, কাপ্তাই ও টঙ্গী বোর্ড মিলস।	বাঁশ, নরম কাঠ, নলখাগড়া, আখের ছোবড়া, পাটকাঠি ও কাঁচা পাট।	লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট।

সার শিল্প (Fertilizer Industry)

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসল। আর এজন্য প্রয়োজন সার। ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৭টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে। এর মধ্যে প্রধান সার কারখানাগুলো হলো– ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা, জামালপুর জেলার তারাকান্দিতে যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্চুগঞ্জ অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা (চিত্র ১১.৫)।

বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সার রপ্তানি করতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে।

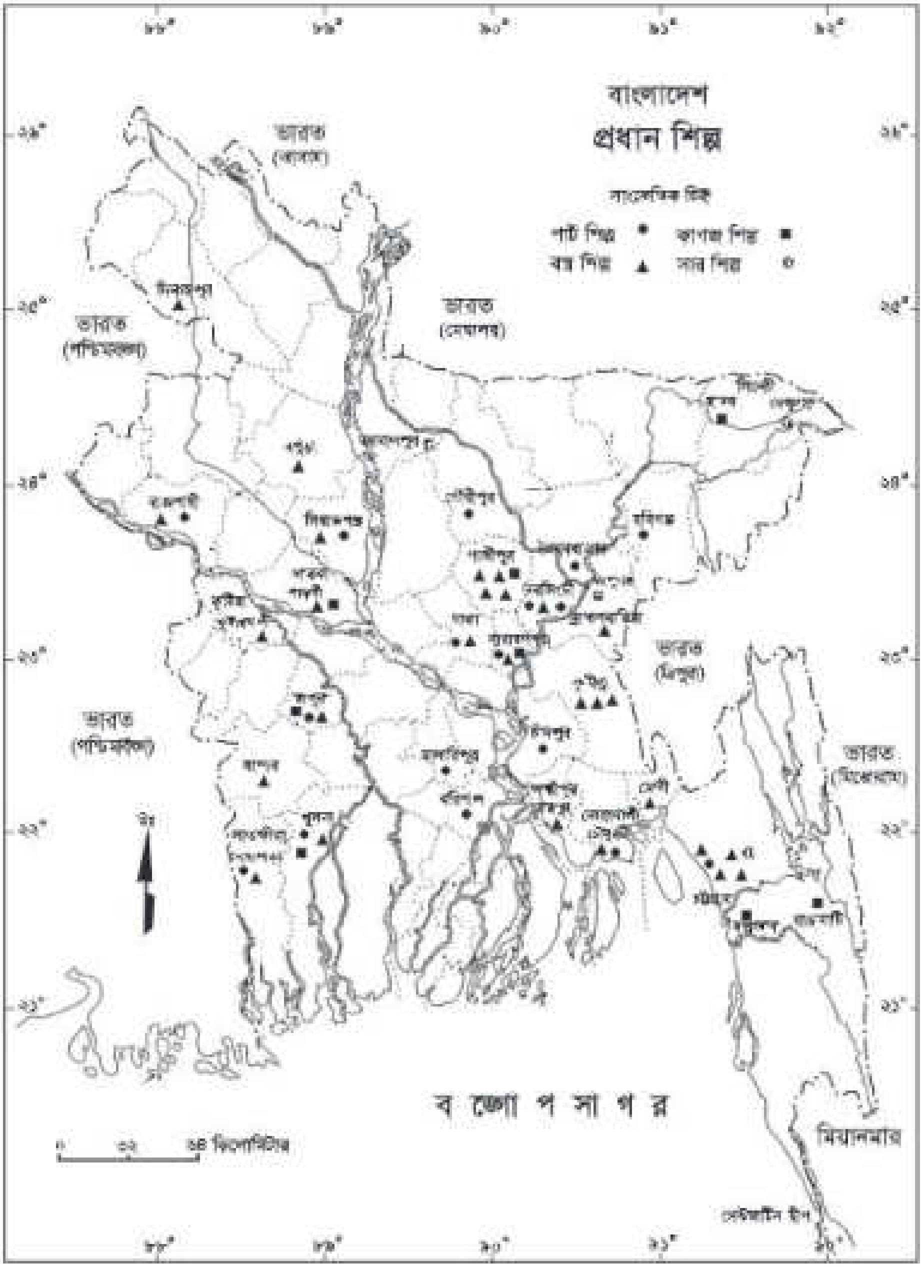

চিত্র ১১.৫ : বাংলাদেশের প্রধান শিল্প

২০২৫

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান (The contribution of garment industries to the economy of Bangladesh)

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এরপর এ শিল্প অতিদ্রুত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে নিজের স্থান করে নেয়। বর্তমানে দেশে অনেকগুলো রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এগুলোর প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ ঢাকা অঞ্চলে অবস্থিত। অবশিষ্টগুলো প্রায় সবই চট্টগ্রাম বন্দর নগরীতে এবং কিছু খুলনা এলাকায় রয়েছে। ২০১৭-১৮* সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ ১৫,৪২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে, যা মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৪২.০৭ ভাগ (উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮* সাময়িক)।

উৎপাদিত পোশাক	রপ্তানিকৃত দেশসমূহ
ট্রাউজার, জিন্স প্যান্ট, স্কার্ট, টপস, সোয়েটার, জ্যাকেট, মেয়েদের পুলওভার, কার্ডিগান, ব্লাউজ, টি-শার্ট, শার্ট ও প্যান্ট ইত্যাদি।	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন ও যুক্তরাজ্য।

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যান্য নিয়ামকের মধ্যে স্বল্প মজুরিতে শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা অন্যতম। এ দেশে এ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ ও অদক্ষ বিপুল শ্রমশক্তির, বিশেষ করে সমাজের নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়-রোজগারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও সুফল বয়ে আনছে। পোশাক শিল্পকে এখন বলে 'বিলিয়ন ডলার' শিল্প।

EPZ : Export Processing Zone (রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল)

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প (Tourism Industry of Bangladesh)

প্রাকৃতিক ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং এই দেশে এসে উচ্ছ্বসিতভাবে উল্লেখ করেছেন, 'A sleeping beauty emerging from mists and water.' তিনি তখন এই জনপদের সুপ্ত সৌন্দর্যটিকে কুয়াশা ও পানির অন্তরাল থেকে ক্রমশ উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন। তার সেই উপলব্ধি আজও এই বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য। পর্যটনের জন্য সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমুদ্রসৈকত, ঘন অরণ্য ও পাহাড়ি এলাকা প্রকৃতিগতভাবেই এখানে বিদ্যমান। বাংলাদেশের পর্যটকদের ভ্রমণ কেন্দ্রগুলোর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য এ দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। এ দেশে পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সমুদ্রসৈকত, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, দ্বীপ, হ্রদ, নদী ও পালতোলা নৌকার

অনুপম দৃশ্যাবলি, সবুজ-শ্যামলিকা ঘেরা পাহাড়ি ভূমি রয়েছে, যা দেখলে মন ভরে যায়। এখানে রয়েছে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও মঠসহ প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন। সিলেটের পাহাড়, হাওড় ও চা বাগানের নয়নাভিরাম নৈসর্গিক দৃশ্য, কুয়াকাটায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য। এছাড়াও এ দেশে বহু প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং সমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতি রয়েছে, যা আকর্ষণীয় পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে দেশি-বিদেশি পর্যটককে আকর্ষণ করতে সক্ষম।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব (Importance of Tourism Industry of Bangladesh)

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, এই শিল্পের উন্নয়নের বদৌলতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিশীলতা, আঞ্চলিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়ন ও পরিবেশগত উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখতে পারে। এই শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসহ বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পথ সুগম হয়। বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং স্থাপত্যের নিদর্শনসমূহ বিশ্বদরবারে পর্যটনের মাধ্যমেই তুলে ধরার মুখ্য পন্থা হিসেবে গণ্য করা যায়।

বাংলাদেশ পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতিতে একে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে আয়, কর্মসংস্থান ও জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায়। পর্যটন শিল্প বিকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিকট উপস্থাপন করা যায়। এমন একটি ঝুঁকিহীন শিল্পে বাংলাদেশ আজও প্রাথমিক স্তরে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে ২০১৮ সালে বিদেশি পর্যটক এসেছে প্রায় ২,৯২,৮৮২ জন। এতে বিদেশি পর্যটক ভ্রমণে আয় হয়েছে ২০১৮ সালে ১০৫৬.৭৪০ মার্কিন ডলার।

(উৎস : বাংলাদেশ পর্যটন মন্ত্রণালয়- বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-২০১৯)।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রসমূহ (Importance of Tourism Centres of Bangladesh)

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত, প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশ। তাই বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানেই পর্যটনের আকর্ষণীয় উপাদান রয়েছে। বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানের নাম উল্লেখ করা হলো (চিত্র ১১.৬)।

বৃহত্তর ঢাকার পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Places of Greater Dhaka)

ঐতিহাসিকভাবে ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী ও প্রধান শহর। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত সাত গম্বুজ মসজিদ, অষ্টাদশ শতাব্দীর তারা মসজিদ এবং সাম্প্রতিককালের নির্মিত বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ। একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির। মোগল সম্রাটদের বুড়িগঙ্গার নির্মিত লালবাগ দুর্গ, ১৮৫৭ সালের স্মৃতিসৌধ বাহাদুর শাহ পার্ক, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্যসমূহ, জাতীয় কবির সমাধি, জাতীয় সংসদ ভবন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মীরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, ধানমন্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি ও মিউজিয়াম, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের জাতির জনক কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণস্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইত্যাদি পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ। গাজীপুরের ভাওয়াল গড় ও জমিদারবাড়ি, নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনারগাঁও এবং পানাম নগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Places of the Eastern Bengal)

টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদ, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মাজার ও বঙ্গবন্ধু সেতু, মধুপুরের গড় ও ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর স্মৃতি বিজড়িত দরিরামপুর। সিলেটে হযরত শাহজালাল (রা) ও শাহপরান (রা) মাজার, কিন ব্রিজ, জাফলং-এ জয়ন্তিয়া পাহাড়, মৌলভীবাজারে মাধবকুন্ড জলপ্রপাত, লাউয়াছড়া ইকোপার্ক ইত্যাদি। কুমিল্লার ময়নামতি বৌদ্ধ ও শালবন বিহার এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, নোয়াখালীর বজরা শাহী মসজিদ, গান্ধী আশ্রম, হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Places of the Northern Bengal)

রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘর ও শাহ মখদুম (রা) মাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সোনা মসজিদ, নাটোরের রানি ভবানীর বাড়ি ও দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন), নওগাঁয় পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড় ও শাহ সুলতান বলখী (রা) মাজার, দিনাজপুরে কান্তজিউ মন্দির ইত্যাদি।

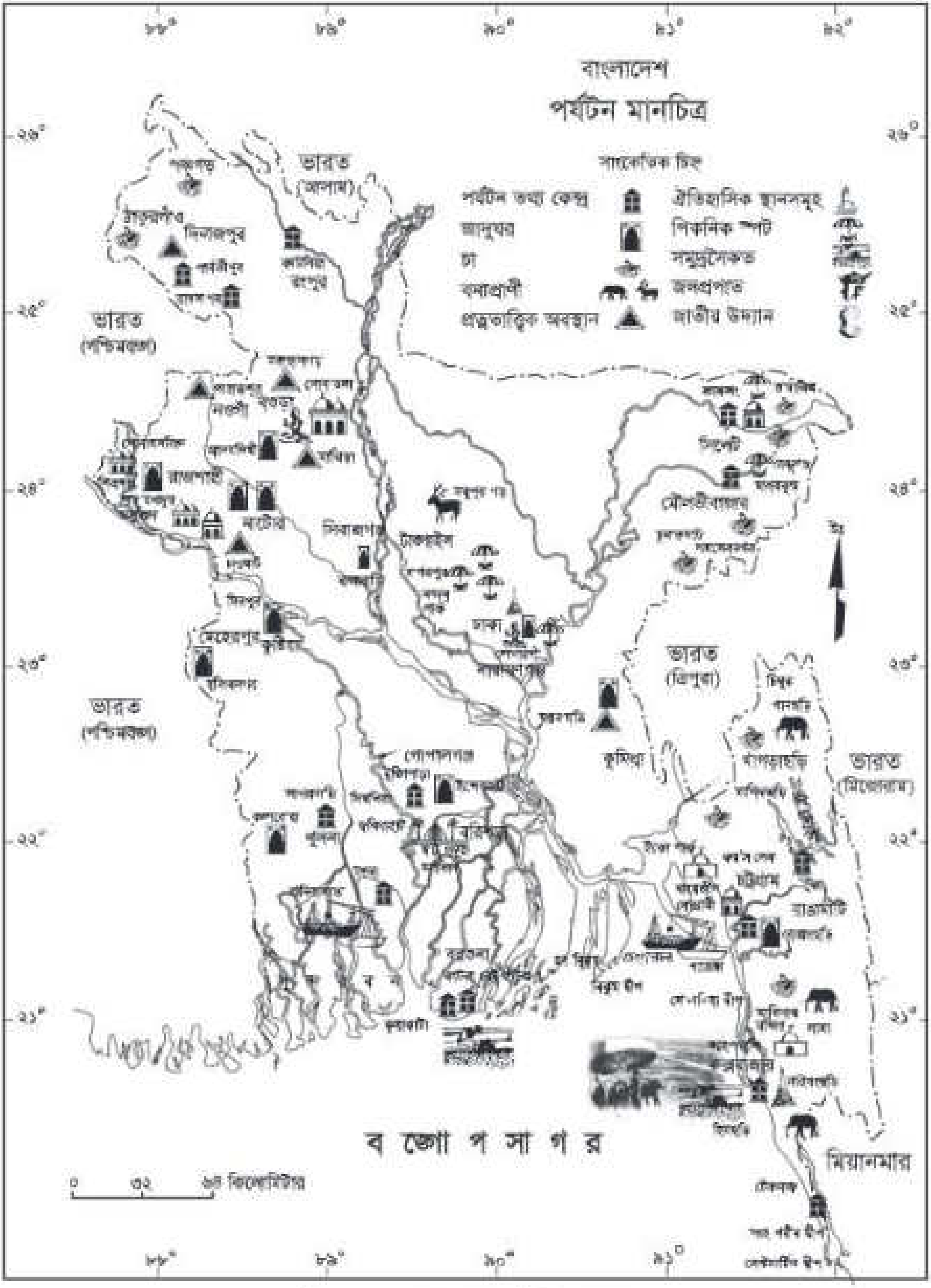

চিত্র ১১.৬ : বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্রসমূহ

২০২৫

দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Places of the Southern Bengal)

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সমাধি, মরমী কবি লালনশাহের মাজার ও শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, যশোরের সাগরদাঁড়িতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান, নড়াইলে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান 'শিশু স্বর্গ ও আর্ট গ্যালারী' চিত্রা নদীর তীরে, মেহেরপুরে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বাগেরহাটে ষাট গম্বুজ মসজিদ, পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, বৃহত্তর খুলনায় অবস্থিত প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ইত্যাদি।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Places of Chittagong Hill Tracts)

রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ এখানকার প্রধান আকর্ষণ (চিত্র ১১.৭)। এই হ্রদের চারদিকে সবুজ ঘেরা পাহাড়, নীলাভ পানি এবং হ্রদের ধারে ছোট ছোট টিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের কাছে অনাবিল আনন্দ উপভোগের এক মোহনীয় স্থানে রূপান্তরিত করেছে। এখানে বৌদ্ধ বিহার ও চাকমা রাজার রাজবাড়ি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। খাগড়াছড়ির বনভূমি, পাহাড় ও প্রাকৃতিক ঝরনা। বান্দরবানের মেঘলা, শৈলপ্রপাত, নীলগিরি ও নীলাচল (চিত্র ১১.৮) ইত্যাদি পর্যটন স্পট অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

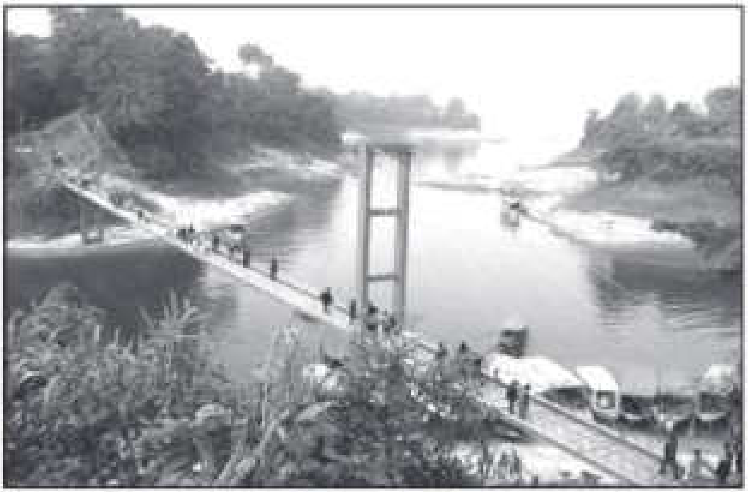

চিত্র ১১.৭ : কাপ্তাই হ্রদ

চিত্র ১১.৮ : নীলাচল

চট্টগ্রামের পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Places of Chittagong)

চট্টগ্রামের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলো হচ্ছে হযরত শাহ আমানত (রা) মাজার, ফয়'স লেক, ডিসি হিল, কোর্ট বিল্ডিং, পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত, সীতাকুণ্ড ইত্যাদি।

কক্সবাজার এলাকার পর্যটন স্থানসমূহ (Tourist Places of Cox's Bazar)

পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত ও বনভূমির নয়নাভিরাম দৃশ্য কক্সবাজারকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছে। কক্সবাজারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান হলো হিমছড়ি, ইনানি বিচ, কলাতলি বিচ, রামু বৌদ্ধ মন্দির, সোনাদিয়া দ্বীপ, মহেশখালী দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ (চিত্র ১১.৯)।

চিত্র ১১.৯ : সেন্টমার্টিন দ্বীপ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের জেলাগুলোতে গম চাষ বেশি প্রসার লাভ করেছে?

(ক) পূর্বাঞ্চলের (খ) পশ্চিমাঞ্চলের
(গ) দক্ষিণাঞ্চলের (ঘ) উত্তরাঞ্চলের

২। ইক্ষু উৎপাদনের জন্য কোন ধরনের মৃত্তিকার প্রয়োজন–

i. বেলে দোআঁশ
ii. কর্দমাক্ত দোআঁশ
iii. জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের মানচিত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

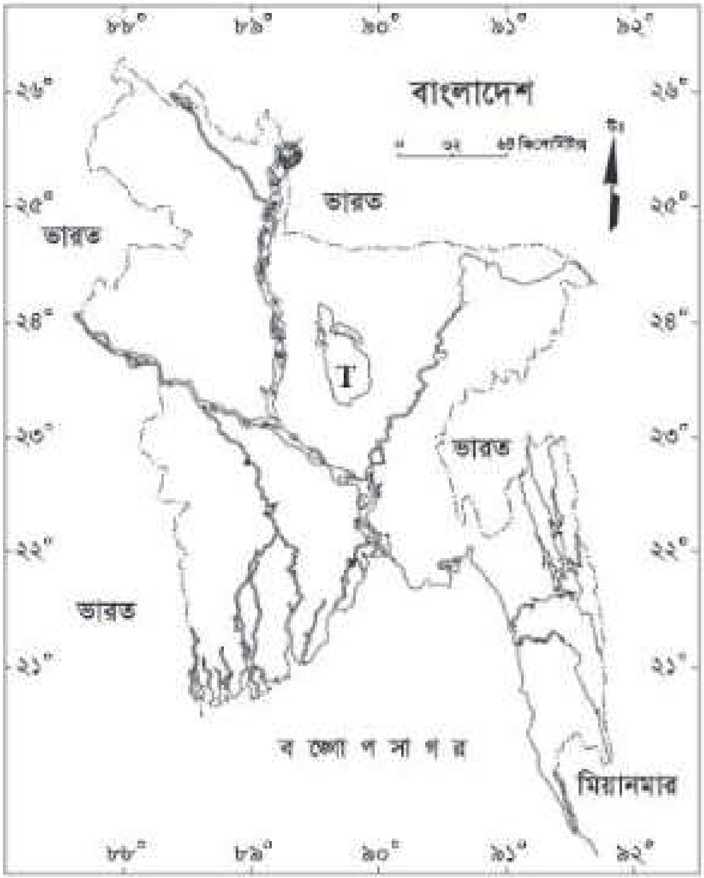

৩। ‘T’ চিহ্নিত অঞ্চলে কোন ধরনের বনভূমি গড়ে উঠেছে?

(ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ (খ) ক্রান্তীয় পাতাঝরা

(গ) স্রোতজ (ঘ) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা

৪। উক্ত বনভূমিতে কোন ধরনের বৃক্ষ জন্মায়?

i. চাপালিশ

ii. শাল

iii. হিজল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

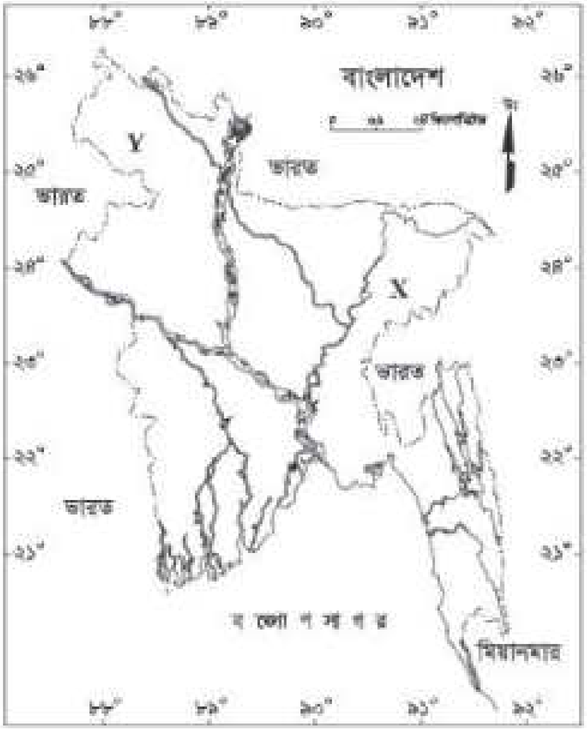

ক. বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্র কোন জেলায় অবস্থিত?

খ. গম চাষের উপযোগী জলবায়ু ব্যাখ্যা কর।

গ. 'X' অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ফসলটি উৎপন্নের কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'X' এবং 'Y' অঞ্চলের প্রাপ্ত প্রধান খনিজ সম্পদের মধ্যে কোনটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি সে সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

২। সিমার বাড়ি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যার কাঁচামাল বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়। অপরদিকে পল্লির বাড়ি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেখানে একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ক. শিল্প কী?

খ. বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. সিমার অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্পটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পল্লির অঞ্চলের শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্কে মতামত দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য

Transport System and Trade of Bangladesh

যোগাযোগ ব্যবস্থা যাত্রী-পণ্য পরিবহন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে অর্থনীতিতে কার্যকরী অবদান রাখে। দেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে কাঁচামাল ও লোকজনের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত দ্রব্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণসমূহের গতিশীলতা বৃদ্ধি, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভাবিত করে বাণিজ্যকে। বাণিজ্য দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা কৃষি, শিল্প প্রভৃতির ভারসাম্য আনে।

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- বাংলাদেশের সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের বর্ণনা করতে পারব;
- যোগাযোগ ও পরিবহনে সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ ও আকাশপথের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়াতে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করব এবং অন্যকে সাবধান করব;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাণিজ্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব।

পরিবহণ ব্যবস্থা (Transport System)

পরিবহণ ব্যবস্থা বলতে আমরা বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের মাধ্যমে এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে বুঝি।

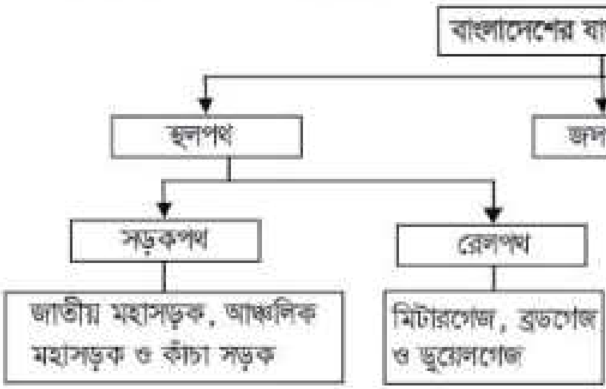

সড়কপথ (Roads)

উৎপাদিত কৃষিপণ্য বণ্টন, দ্রুত যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সড়কপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথের মাধ্যমে যোগাযোগ সব স্থানে সম্ভব না তাই সড়কপথ থাকা প্রয়োজন। সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য নিম্নোক্ত ভৌগোলিক অবস্থা প্রভাব ফেলে।

সড়কপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা

সমতলভূমি	মৃত্তিকার গঠন	সমুদ্রের অবস্থান ও শিল্পক্ষেত্রের অবস্থান
সমতলভূমি সড়কপথ গড়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এজন্য ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে অনেক সড়কপথ গড়ে উঠেছে।	মৃত্তিকার বুনন যদি স্থায়ী বা মজবুত হয় তবে বৃষ্টিতে কম ক্ষয় হয়। শক্ত মৃত্তিকার উপর সড়কপথ গড়ে উঠলে তা স্থায়ী হয়।	সমুদ্র উপকূলে বন্দর গড়ে ওঠে। বন্দর ও শিল্পক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেও অনেক সড়কপথ গড়ে ওঠে। এজন্য মংলা এবং চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শিল্প অঞ্চলে সড়কপথ গড়ে উঠেছে।

সড়কপথ গড়ে ওঠার প্রতিকূল অবস্থা

বন্ধুর ভূপ্রকৃতি	ভূমির ঢাল	নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ অঞ্চল
উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় সড়কপথ নির্মাণ করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়কপথ আছে, কিন্তু কম।	ঢালযুক্ত স্থানে সড়কপথ তৈরি করা কষ্টকর ও ব্যয়বহুল। এতে গাড়ির জ্বালানি খরচ বেশি হয়। অর্থাৎ বেশি ঢাল সড়কপথ তৈরির ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ। এজন্য বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সড়কপথের ঘনত্ব কম।	নিম্নভূমি ও নদীপূর্ণ অঞ্চলে বেশি কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণে খরচ বেশি হয়। এজন্য এ সকল অঞ্চলে সড়কপথ কম গড়ে ওঠে। তাই বাংলাদেশের সিলেটের হাওড় অঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলে সড়কপথ কম। নৌপথ এ অঞ্চলে অগ্রাধিকার পায়।

বাংলাদেশের সড়কপথগুলো বসতির বিন্যাসের উপর নির্ভর করে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ সড়ক স্থানীয় যোগাযোগ রক্ষার জন্য রেলপথ ও নৌপথের পরিপূরক হিসেবে নির্মিত হয়েছে। সাধারণত কাঁচা সড়কগুলোকেই উন্নত করে পাকা সড়ক করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, বিভিন্ন শ্রেণির সড়কপথের পরিমাণ নিম্নে সারণিতে দেখানো হলো :

সারণি ১ : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন শ্রেণির সড়কপথ

সাল	২০১৪	২০১৮	২০১৯
জাতীয় মহাসড়ক (কিলোমিটার)	৩,৫৪৪	৩,৮১৩	৩,৯০৬
আঞ্চলিক মহাসড়ক (কিলোমিটার)	৪,২৭৮	৪,২৪৭	৪,৪৮৩
জেলা সড়ক (কিলোমিটার)	১৩,৬৫৯	১৩,২৪২	১৩,২০৭
মোট	২১,৪৮১	২১,৩০২	২১,৫৯৬

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৯* (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)।

কাজ : উপরের পরিসংখ্যান থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছক পূরণ কর।

সড়কপথের নাম	বেড়েছে	কমেছে	কারণ
জাতীয় মহাসড়ক			
আঞ্চলিক মহাসড়ক			
জেলা সড়ক			

আমাদের দেশের সড়কপথগুলো বৃষ্টি, বর্ষা প্রভৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়, ফলে কাঁচা সড়ক ও আঞ্চলিক সড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার ফলে সারাবছরই সড়ক মেরামত করতে হয়। এছাড়া নদীবিধৌত হওয়ায় কালভার্ট নির্মাণ ও মেরামত করতে হয়, যা সড়কপথের বাধা হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগে সড়কপথ ঢাকা কেন্দ্রিক। রুটসমূহ নিম্নরূপ :

ঢাকা ⟷ আরিচা নগরবাড়ি হয়ে পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও তেঁতুলিয়া।

ঢাকা ⟷ দৌলতদিয়া হয়ে ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও বরিশাল।

ঢাকা ⟷ টাঙ্গাইল, জামালপুর, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ।

ঢাকা ⟷ কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও টেকনাফ।

ঢাকা ⟷ বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে উত্তরবঙ্গ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সড়কপথের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বর্তমানে সড়কপথের উন্নয়নের জন্য যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সড়কপথ সারা দেশে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। তাই এ দেশের সকল স্থানেই সড়কপথে যাওয়া যায়। বাজার ব্যবস্থায় উন্নতি, সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও বণ্টন, শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে সড়কপথ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

রেলপথ (Railways)

বাংলাদেশ রেলপথের পরিমাণ অল্প হলেও ভারী দ্রব্য পরিবহন, শিল্প ও কৃষিজ দ্রব্য, শ্রমিক পরিবহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটা দেশের প্রধান বন্দর, শহর, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে (চিত্র ১২.১)।

বাংলাদেশের রেলপথ

- ব্রডগেজ রেলপথ যমুনা নদীর পশ্চিমাংশে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে ৬৫৯ কিলোমিটার।
- ডুয়েলগেজ রেলপথ জামতৈল থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ৩৭৫ কিলোমিটার।
- মিটারগেজ রেলপথ যমুনা নদীর পূর্বাংশে, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে ১,৮৪৩ কিলোমিটার।

রেলপথ সব স্থানেই কি গড়ে উঠতে পারে? ভৌগোলিক কিছু উপাদান রেলপথ গড়ে উঠাকে প্রভাবিত করে।

রেলপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা	
সমতলভূমি	**সমুদ্রের অবস্থান**
সমতলভূমি রেলপথ নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক। এতে খরচ কম হয় ও সহজে নির্মাণ করা যায়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চল সমতল। এজন্য পাহাড়ি, বনাঞ্চল ও জলাভূমি ছাড়া প্রায় সব স্থানেই রেলপথ গড়ে উঠেছে।	সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বন্দর গড়ে ওঠে। এই বন্দরের কারণে অন্যান্য সমস্যা থাকলেও রেলপথ গড়ে ওঠে। এজন্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিয়ে বন্দরকে কেন্দ্র করে সমতলভূমিতে রেলপথ গড়ে উঠেছে।

রেলপথ গড়ে ওঠার প্রতিকূল অবস্থা	
বন্ধুর ভূপ্রকৃতি	**নিম্নভূমি ও মৃত্তিকা**
উঁচুনিচু ও বন্ধুর প্রকৃতির ভূমিরূপের জন্য পার্বত্য এলাকায় রেলপথ নির্মাণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য। তাই বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে রেলপথ নেই।	মৃত্তিকার বুনন যথেষ্ট মজবুত না হলে রেলপথ গড়ে ওঠে না। এছাড়া নদী বেশি থাকলে রেলপথ গড়ে ওঠাও কঠিন। তাই বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলপথ কম।

১ মিটার প্রস্থ রেলপথ মিটারগেজ এবং ১.৬৮ মিটার প্রস্থ রেলপথ ব্রডগেজ নামে পরিচিত।

বর্তমানে তিস্তামুখঘাট ও বাহাদুরাবাদঘাট এবং সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জের মধ্যে ২টি রেলওয়ে ফেরি চালু রয়েছে।

ঢাকার কমলাপুর দেশের বৃহত্তম রেল স্টেশন। ঢাকা থেকে দেশের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে রেলযোগে যাতায়াত করা যায়। বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৭৪টি রেল স্টেশন আছে (উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক ২০১৭, সারণি ৮.০৪)। কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ, কাঁচামাল ও জনসাধারণের নিয়মিত চলাচল, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, শ্রমিক স্থানান্তর, কর্মসংস্থান তথা বাংলাদেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পুনর্গঠনে রেল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিণত হবে।

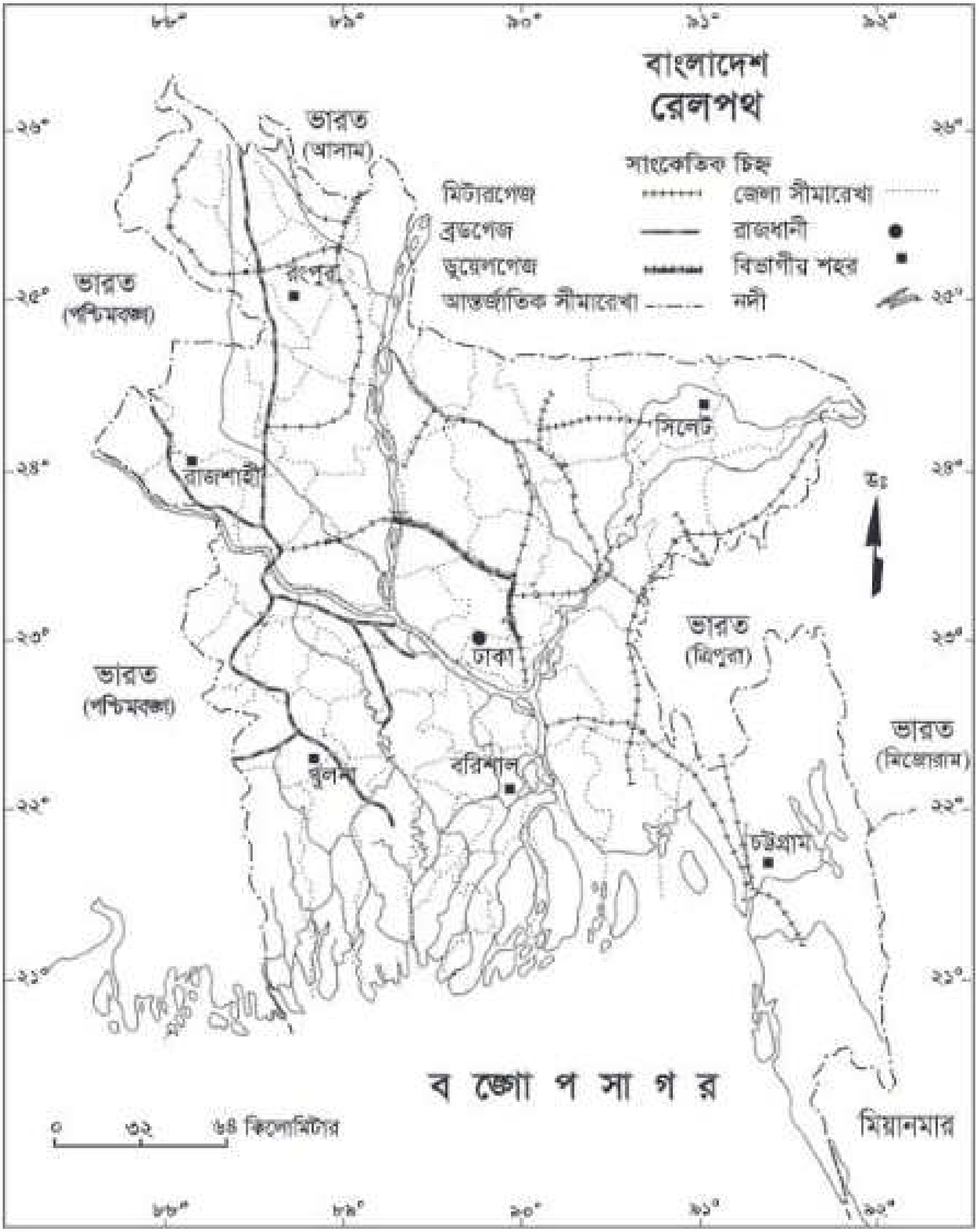

চিত্র ১২.১ : বাংলাদেশের রেলপথ

কাজ : খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, বরিশাল, পটুয়াখালী, মাদারিপুর, শরীয়তপুর, মেহেরপুর, কক্সবাজার ও লক্ষীপুর অঞ্চলে কোনো রেলপথ নেই।
উক্ত অঞ্চলগুলোতে রেল যোগাযোগ নেই কেন ভৌগোলিক কারণসমূহ বের কর। দলগতভাবে কারণগুলো মিলিয়ে ব্যাখ্যা করে শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

জলপথ : জলপথকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়।

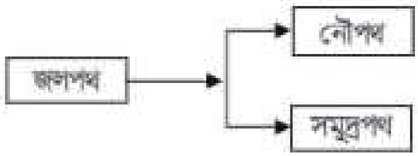

নৌপথ (River transport)

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র নৌপথ জালের মতো ছড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক গঠন নৌপথের অনুকূলে। যে কারণে নৌপথ বিস্তার করেছে তা বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে তা সহজে বোঝা যায়।

নৌপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা	
নিম্নভূমি	নদীবহুল অঞ্চল
নিম্নভূমি সহজে বন্যা কবলিত হয়, ফলে সড়কপথ ও রেলপথ গড়ে উঠতে পারে না। এজন্য সিলেট অঞ্চলের হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলের ফরিদপুর, ভোলা, মাদারিপুর ও বরিশাল অঞ্চলে নৌপথ প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা।	স্বাভাবিকভাবেই নদীবহুল অঞ্চলে সড়ক ও রেল যোগাযোগ সহজে গড়ে ওঠে না। ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে নৌপথই বেশি ব্যবহৃত হয়।

নৌপথ বাংলাদেশের সুলভ পরিবহণ ও যাতায়াত ব্যবস্থা। অসংখ্য নদী ও খালবিলের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারাবছর নৌচলাচলের উপযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়। দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ- চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। বর্তমানে বাংলাদেশের নৌ পরিবহণের সামগ্রিক অবস্থা নিম্নরূপ :

সামগ্রিক অবস্থা	
লঞ্চঘাট	৩৮০টি
ফেরিঘাট	৫৩টি

সাল	অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহনের আয় (কোটি টাকায়)
২০১৩-১৪	৩২০.০৪
২০১৪-১৫	৩৫৪.৫৮
২০১৫-১৬	৫০৬.৬৪
২০১৬-১৭	৬০৩.৪০
২০১৭-১৮*	৪৭৭.৫০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮* সাময়িক, (BIWTA, Ministry of Shipping)

কাজ : 'নৌপথ সাশ্রয়ী পথ' ব্যাখ্যা কর।

নদীবন্দর (River ports) : নদীবন্দরের মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গোয়ালন্দ, বরিশাল, খুলনা, ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, চাঁদপুর, ঝালকাঠি, আরিচা, আজমিরীগঞ্জ ও মাদারীপুর উল্লেখযোগ্য (চিত্র ১২.২)।

বাণিজ্য, পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ করে বাংলাদেশ নৌপথ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

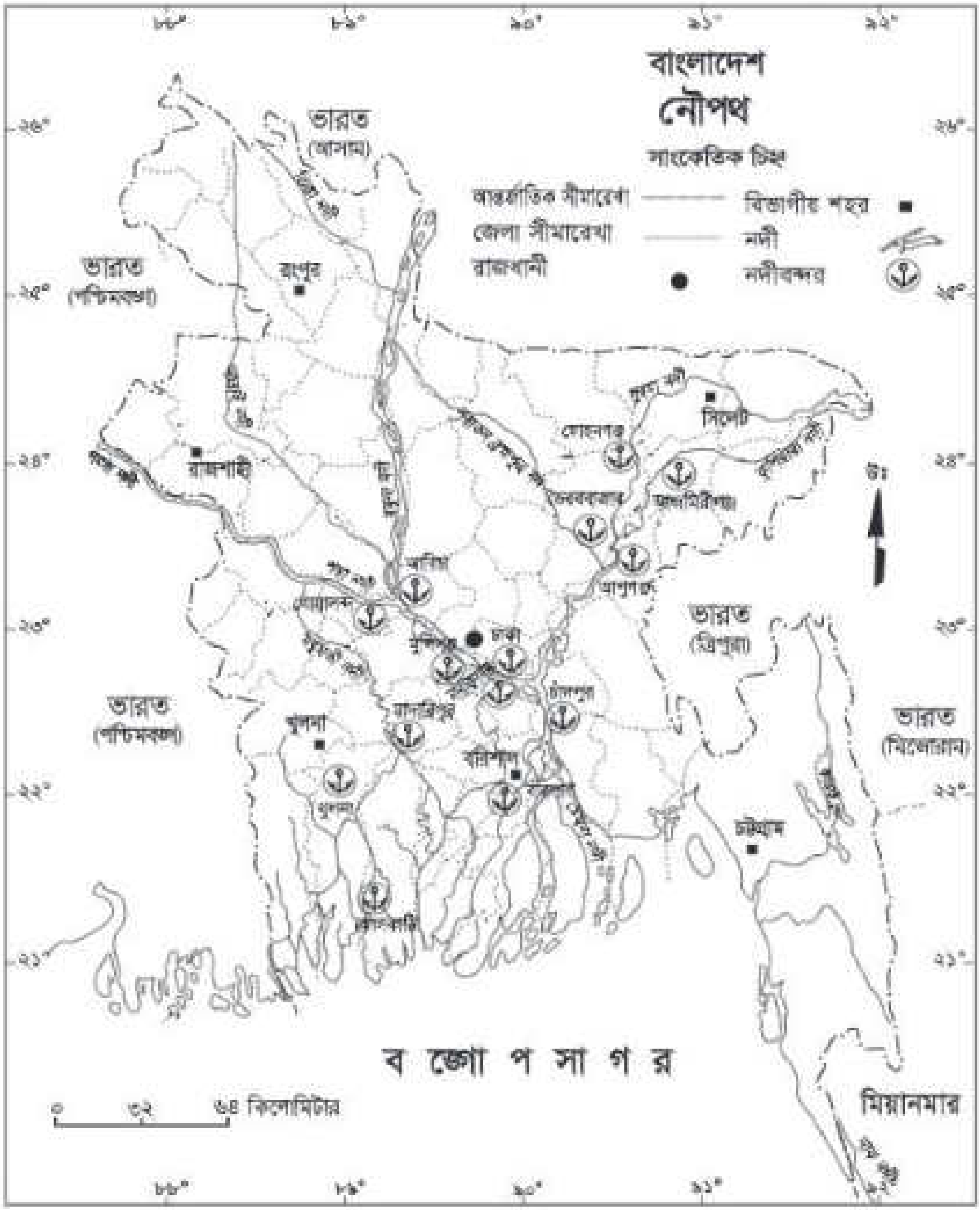

চিত্র ১২.২ : বাংলাদেশের নৌপথ

কাজ : বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দরগুলো মানচিত্রে চিহ্নিত কর এবং শিক্ষকের কাছে জমা দাও।

সমুদ্রপথ (Ocean Shipping)

সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার জন্য দেশের অবস্থান অবশ্যই সমুদ্রের তীরে হওয়া প্রয়োজন। শুধু সমুদ্র থাকলেই হবে না, তার ভৌগোলিক কিছু বৈশিষ্ট্যও দরকার যা থাকলে সমুদ্রবন্দর গড়ে তোলা যাবে। বন্দর গড়ে উঠলে তবেই সমুদ্রপথ উন্নতি লাভ করবে।

সমুদ্রপথ গড়ে ওঠার ভৌগোলিক কারণ			
পোতাশ্রয়	উপকূলের গভীরতা	সুবিস্তৃত সমভূমি	জলবায়ু
পোতাশ্রয় থাকলে ঝড়-ঝাপটা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতির কবল থেকে জাহাজ রক্ষা পায়।	বন্দরের উপকূলস্থ সমুদ্র বেশ গভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে সব ধরনের আধুনিক জাহাজ বন্দরে যাতায়াত করতে পারে।	বন্দরের জাহাজ মেরামত ও জেটি নির্মাণের জন্য সুবিস্তৃত সমভূমি থাকা প্রয়োজন।	বরফ, কুয়াশা প্রভৃতি সমুদ্র যোগাযোগের বাধাস্বরূপ, যা বাংলাদেশের উপকূলে অনুপস্থিত। আর এ কারণে সমুদ্র যোগাযোগ প্রসার লাভ করেছে।

দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে জলপথ তথা নৌপথ ও সমুদ্রপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের তিনটি সমুদ্রবন্দর আছে– চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ এবং আমদানির প্রায় ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থার চেয়ে নৌপথ ও সমুদ্রপথের অবদান উল্লেখযোগ্য।

আকাশপথ (Airways)

যাত্রী চলাচল এবং পচনশীল দ্রব্য প্রেরণেও আকাশপথের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি জাতীয় দুর্যোগের সময় আকাশপথ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে আকাশপথকে বাদ দিয়ে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ কল্পনাও করা যায় না। শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে আকাশপথের গুরুত্ব অপরিসীম।

আকাশপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা	
সমতলভূমি	কুয়াশামুক্ত ও ঝড়ঝঞ্ঝার স্বল্পতা
বিমান অবতরণ এবং উড্ডয়নের জন্য পর্যাপ্ত সমতলভূমি প্রয়োজন।	আকাশপথের জন্য কুয়াশামুক্ত ও ঝড়ঝঞ্ঝামুক্ত বন্দর প্রয়োজন।

বিমানের অভ্যন্তরীণ সার্ভিসে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করা যায় (চিত্র ১২.৩)। অভ্যন্তরীণ রুটে বেসরকারি বিমান সার্ভিসও চালু রয়েছে। ঢাকার 'হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর' বাংলাদেশের প্রধান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এছাড়াও আরও দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে, তা হলো–চট্টগ্রাম শাহ আমানত ও সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

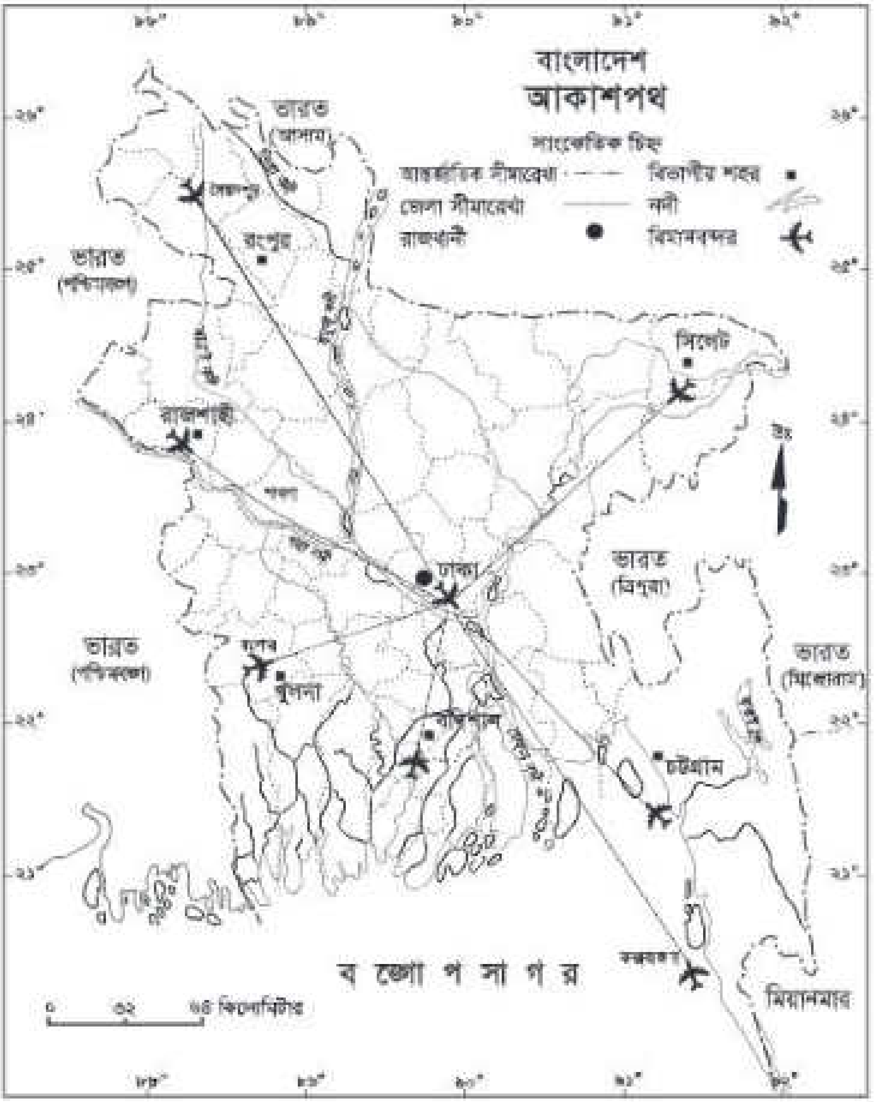

চিত্র ১২.৩ : বাংলাদেশের আকাশপথ

বাণিজ্য (Trade)

মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলি হচ্ছে বাণিজ্য। আমাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো একই স্থানে উৎপাদন বা তৈরি হয় না যার ফলে পণ্যগুলো

বণ্টনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়। বাণিজ্য নিম্নরূপ :

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Internal Trade)

আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সাধারণত গ্রাম বা হাট থেকে কাঁচামাল, খাদ্য-শস্য সংগ্রহ করা হয় এবং উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য জেলা, সদর, গঞ্জ ও হাটে বণ্টন করা হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশের চাহিদা ও ভোগের সমন্বয় ঘটে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাংলাদেশে যাতায়াত ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ। এই পথগুলো বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ করে।

কাজ : তোমার এলাকায় বিভিন্ন দোকানে কী কী পণ্য অন্য অঞ্চল থেকে আসে এবং কোন দ্রব্য বা পণ্য অন্য অঞ্চলে বিক্রি হচ্ছে তার তালিকা তৈরি কর।

কাজ : তোমার এলাকায় বাণিজ্যের সঙ্গে যাতায়াতের সম্পর্ক দেখাও।

পণ্যদ্রব্য তোমার অঞ্চল থেকে যাচ্ছে	যাতায়াত ব্যবস্থা	পণ্যদ্রব্য তোমার অঞ্চলে আসছে

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)

এক সময় বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল বেশিরভাগ কাঁচামাল রপ্তানি। বর্তমানে আমাদের রপ্তানির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আয় হচ্ছে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে এবং দিন দিন কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ কমে আমদানি বাড়ছে। বর্তমানে খাদ্য-শস্য ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করতে হয় এবং দেখা যায় রপ্তানির চেয়ে আমদানি দ্রব্য বেশি। আর এ সকল বৈদেশিক বাণিজ্য চলে সমুদ্রপথে। তবে জরুরিভিত্তিতেও পচনশীল দ্রব্য আকাশপথে আনা নেওয়া করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, পরিবহণ ব্যবস্থার

উন্নয়ন, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি অপরিহার্য।

বাংলাদেশ চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, হংকং, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ থেকে পণ্য আমদানি করে। বাংলাদেশের পণ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, ইতালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়।

আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, কিন্তু মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না, ফলে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না।

আমদানি ও রপ্তানি পণ্য (Import and Export Products)

বাংলাদেশে বর্তমানে শ্রমনির্ভর শিল্পের রপ্তানি উপযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তালিকার শীর্ষে রয়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহ

১। **প্রাথমিক পণ্য :** হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, কাঁচা পাট, চা ও অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য ।

২। **শিল্পজাত পণ্য :** তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিকসামগ্রী, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প,পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাদুকা, সিরামিকসামগ্রী ও প্রকৌশল দ্রব্যাদি।

অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০১৫-২০১৬	৩৪,২৫৭.১৮	৪৩,১২২.০
২০১৬-২০১৭	৩৪,৬৫৫.৯০	৪৭,০০৫.০
২০১৭-২০১৮	৩৬,৬৬৮.১৭	৫৮,৮৬৫.০
২০১৮-২০১৯*	২৭,৬৫২.৮০	৪০,৮৯৫.০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯* (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

বাংলাদেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীন-এর অবস্থান শীর্ষে। ২০১৮-২০১৯ (ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে দেশের মোট আমদানির শতকরা ২৯.৪৩ ভাগ চীন থেকে আসে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত ও সিঙ্গাপুর।

প্রধান আমদানি পণ্যসমূহ

১। **প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ :** চাল, গম, তেলবীজ, অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম ও তুলা।

২। **প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ :** ভোজ্যতেল, সার, ক্লিংকার, স্টেপল ফাইবার ও সুতা।

৩। মূলধনী দ্রব্যসমূহ।

৪। অন্যান্য পণ্য (ইপিজেড-এর সহায়ক পণ্য)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোন জেলায় রেলপথ নেই?

(ক) টাঙ্গাইল
(খ) মাদারিপুর
(গ) হবিগঞ্জ
(ঘ) ভৈরববাজার

২। বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে–

i. উৎপন্ন দ্রব্যের খরচ কমাতে হবে
ii. উৎপন্ন দ্রব্যের শুল্ক বৃদ্ধি করতে হবে
iii. দ্রব্যসামগ্রীর মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব রাইয়ান একজন কম্পিউটার ব্যবসায়ী। মুম্বাই থেকে প্রতি বছর তিনি কম্পিউটার আমদানি করেন।

৩। জনাব রাইয়ান কোন পথে কম্পিউটার আমদানি করেন?

(ক) সড়কপথ
(খ) রেলপথ
(গ) আকাশপথ
(ঘ) সমুদ্রপথ

৪। উক্ত পথে পণ্যটি আনার সুবিধা–

i. সময়ের সাশ্রয়
ii. পরিবহন খরচ কম
iii. যন্ত্রাংশের ক্ষতির সম্ভাবনা কম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সায়হান গত শীতের ছুটিতে রাজশাহী থেকে তার ফুফুর বাড়ি সিলেট বেড়াতে যায়। সে কম খরচে এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য একটি পথ বেছে নিয়েছিল। কয়েকদিন পর সেখান থেকে চট্টগ্রাম হয়ে সে খাগড়াছড়ির আলুটিলা সুড়ঙ্গপথ দেখতে যায়।

ক. স্বল্প খরচের যোগাযোগ পথের নাম কী?

খ. দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে নৌপথ উন্নতি লাভ করার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. সায়হানের রাজশাহী থেকে ফুফুর বাড়ি যাওয়ার পথটি মানচিত্রে নির্দেশ কর।

ঘ. সায়হানের 'সিলেট থেকে চট্টগ্রাম' এবং 'চট্টগ্রাম থেকে আলুটিলা' পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২।

অর্থবছর	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)	আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন ইউএস ডলার)
২০১৫-২০১৬	৩৪,২৫৭.১৮	৪৩,১২২.০
২০১৬-২০১৭	৩৪,৬৫৫.৯০	৪৭,০০৫.০
২০১৭-২০১৮	৩৬,৬৬৮.১৭	৫৮,৮৬৫.০
২০১৮-২০১৯*	২৭,৬৫২.৮০	৪০,৮৯৫.০

ক. আমদানি বাণিজ্য কী?

খ. বৈদেশিক বাণিজ্যে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির সুবিধাজনক পথ কোনটি এবং কেন?

গ. উপরের সারণিতে কোন বছর রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ভারসাম্য সবচেয়ে কম? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উল্লিখিত সারণি বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য

Development Activities and Environment in Bangladesh

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিটি উপাদান একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ, ক্ষুদ্রজীব, প্রাণী ও মানুষ প্রত্যেকে পরিবেশের একটি সহনশীল অবস্থায় বসবাস করে। তাই পরিবেশের সহনশীল অবস্থার পরিবর্তন হলে এই নির্ভরশীলতা ব্যাহত হয়। যে কোনো দেশের জন্য উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন নির্ভর করে অর্থনৈতিক কার্যাবলির উপর। যা আমাদের দেশে এখনও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সবকিছুই করতে হবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। টেকসই ও উন্নয়ন পরিবেশ সমন্বিত করে গড়ে তুলতে হবে।

কিছু উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পরিবেশের ভারসাম্য এবং ভারসাম্যহীনতা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যাসহ বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় কীভাবে পরিবেশ দূষণ ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পরিবেশ ভারসাম্যহীনতার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হবো এবং অন্যকে সচেতন করব।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য (Development activities & environmental balance)

একটি দেশের জন্য উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মানুষ ও দেশ চায় উন্নয়ন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে। এজন্য দেশের অভ্যন্তরীণ কিছু উন্নয়ন সাধন করতে হয়। পরিবেশের সমন্বয় করে এ সকল উন্নয়ন করা উচিত। আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এমনভাবে পরিচালনা করব যেন তা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট না করে।

তোমার বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার রাস্তা যদি কাঁচা বা ভাঙা থাকে দেখবে কিছুদিন পর তা নতুন করে তৈরি বা মেরামত করে ব্যবহারের উপযোগী করা হচ্ছে। আবার তোমার চারপাশে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে পাবে যে, টিন বা কাঠের বাড়িগুলো পরিবর্তিত হয়ে ইটের দালান হচ্ছে। এই যে চাহিদার সঙ্গে কোনো কিছুর উপযোগিতা বৃদ্ধিকরণ, এটাই উন্নয়ন।

এরূপ সেতু, বাঁধ, শিল্পকারখানা, সড়কপথ, রেলপথ এমনভাবে তৈরি করা যা পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের স্বাভাবিকতা বাধাগ্রস্ত না করে। বাংলাদেশ উত্তর থেকে দক্ষিণে ক্রমশ ঢালু। ফলে পূর্ব-পশ্চিমগামী স্থল যোগাযোগে অধিক সেতু নির্মাণ জরুরি। শিল্প বর্জ্য বিভিন্ন নদীকে দূষিত করে ফেলেছে। নদী ভরাট করে শিল্প গড়ে উঠছে। জলাধার ভরাট করে বসতি তৈরি করে শিল্পকারখানা সৃষ্টি হচ্ছে, যা পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এমনভাবে করা উচিত যা পরিবেশ ও সম্পদকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে।

একটি পুকুরের চারপাশের গাছপালা ধ্বংস করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করলে, পুকুরের প্রথমে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং পরে মৎস্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এভাবে পুকুরটি মজা পুকুরে পরিণত হবে ও দীর্ঘমেয়াদে সম্পদ আহরণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অবশেষে পুকুরটির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের কয়েকটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড (Some development activities of Bangladesh)

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার চাহিদা অনুযায়ী কোনো কিছুর উপযোগিতা বৃদ্ধিকরণ হচ্ছে উন্নয়ন। আমাদের আলোকশক্তি ব্যবহারের দিকে তাকালে সহজে তা বুঝতে পারব। আমরা তেল সরাসরি ব্যবহার করে প্রদীপ জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করতাম। এখন তেল, গ্যাস বা কয়লা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, যা দ্বারা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়। এর আলোকশক্তি অনেক বেশি। এই পরিবর্তন হচ্ছে উন্নয়ন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি আলোচনা করা হলো :

কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development in agriculture sector)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৃষিখাতের উন্নয়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কৃষির অগ্রগতি প্রয়োজন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই জমিতে বছরের সকল সময়ই চাষ হচ্ছে। কৃষির উন্নয়নের জন্য আমরা যা করছি তা নিম্নরূপ :

শিল্পক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development in industrial sector)

সামাজিক অগ্রগতির জন্য দ্রুত শিল্প উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পখাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নোক্তভাবে শিল্পখাতে উন্নয়ন করা হয়।

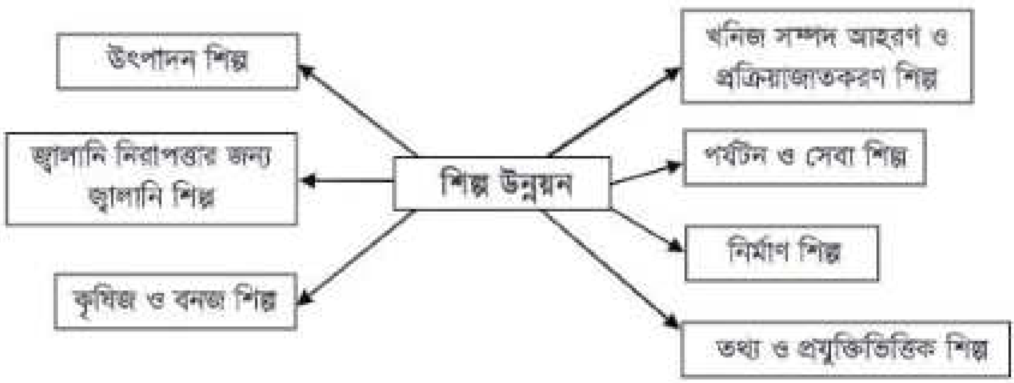

যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development in transport and communication sector)

কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে যোগাযোগ। তাই যোগাযোগের উন্নয়নের উপর দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে। যুগোপযোগী, সুসংগঠিত এবং আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আজ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন, টিভি, রেডিও ও প্রযুক্তির বিকাশ দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এছাড়া মহাসড়ক, সেতু, ফেরিঘাট নির্মাণ ও ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

বাসস্থানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন (Development in housing sector)

বাসস্থানের ক্ষেত্রে উন্নয়ন দেশের অন্যান্য উন্নয়নের উপর কিছুটা নির্ভর করে। এটা অবকাঠামোগত উন্নয়ন (চিত্র ১৩.১)। বাসস্থানের উন্নয়নের জন্য খাওয়ার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও বর্জ্যের জন্য উন্নত ড্রেনেজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের সমন্বিত রূপ হচ্ছে বাসস্থানের উন্নয়ন।

চিত্র ১৩.১ : অবকাঠামোগত উন্নয়ন

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশ দূষণ (Development activities in Bangladesh and environment pollution)

উন্নয়ন সকল দেশের কাম্য। টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন হলে তা দেশের জন্য মঙ্গল। স্বল্প শিক্ষা, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অধিক লাভের আশায় আমরা পরিবেশকে দূষিত করি। পরিবেশের প্রধান উপাদান হচ্ছে জমি বা ভূমি, পানি, বায়ু এবং বনজ সম্পদ। পূর্বালোচিত উন্নয়নসমূহ পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলোকে কীভাবে দূষিত করে তা আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি।

ভূমি
- → অধিক ফসল উৎপাদন → উর্বরতা হ্রাস → মাটির জৈব উপাদান কমে যায়।
- → অধিক সার প্রয়োগ → কীটনাশক ব্যবহার → মাটি দূষিত হয়ে যায়।
- → বন, পাহাড় কেটে আবাদি জমি → জমি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে → মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

ফলাফল : মাটিতে যেসব অণুজীব, ক্ষুদ্রজীব বাস করে তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্য ক্ষুদ্র প্রাণীগুলোর আবাসস্থল নষ্ট হয়। দূষিত মাটিতে উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না, ফলে ভূমি মরুকরণ হয়।

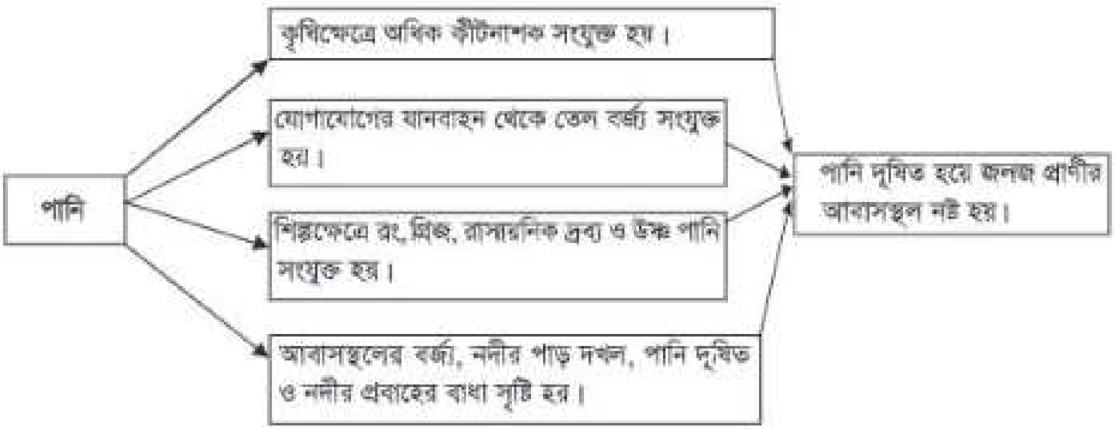

ফলাফল : জলজ ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্ল্যাংকটন, কচুরিপানা, শেওলা জন্মাতে পারে না। এদের ভক্ষণ করে যেসব ক্ষুদ্র মাছ, তাদের খাদ্যের অভাব হয় এবং বড় মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফলাফল : এগুলো বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ও ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাস-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এর ফলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। স্বাভাবিক তাপমাত্রাকে বৃদ্ধি করছে। পরোক্ষ ফল হিসেবে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে। মাটি অধিক তাপমাত্রা গ্রহণ করছে। ফলে অনেক স্থান উদ্ভিদহীন হয়ে পড়ছে।

বনজ সম্পদ (Forest resources)

বনজ সম্পদ কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সবচেয়ে বড় উপাদান। আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। তারপরও আমরা এই বনজ ঝোপঝাড়, কাঠ প্রভৃতি আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ, শিল্প ও জ্বালানির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি। ফলাফল হিসেবে বনজ পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। বন উজাড় হচ্ছে, মাটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে মৃত্তিকা ক্ষয়ে যাচ্ছে দ্রুত, সাথে মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে।

পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি (Result of Environmental Imbalance)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সম্পদের অধিক ব্যবহারের ফলে আমাদের যে তিন ধরনের বাস্তুসংস্থান বিদ্যমান, (জলজ, বনজ ও স্থলজ) প্রত্যেকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। জলজ বাস্তুসংস্থান নষ্ট হওয়ার ফলে অনেক জলজ প্রাণী ও মাছ বিলুপ্ত। বনজ সম্পদের অনেক বৃক্ষ বিলুপ্ত ও কিছু বৃক্ষ বিলুপ্তির মুখে। অনেক বনজ প্রাণী ধ্বংস হয়েছে। বনজঙ্গল বেশি কেটে ফেলার ফলে শৃগাল, খরগোশ, বনবিড়াল প্রভৃতির বাসস্থান নষ্ট হয়েছে, যা খাদ্য শৃঙ্খলকে ভেঙে দিয়েছে। এর প্রভাব স্থলজ প্রাণীর বাস্তুসংস্থানের উপর তথা মানব সমাজের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আমরা দেখতে পাই অতিরিক্ত মাত্রায় সম্পদ ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর ফলে উত্তরাঞ্চলে উত্তপ্ততা এবং শৈত্যপ্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে অতিরিক্ত শিল্পায়নের কারণে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আমাদের দেশের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সাতক্ষীরা,

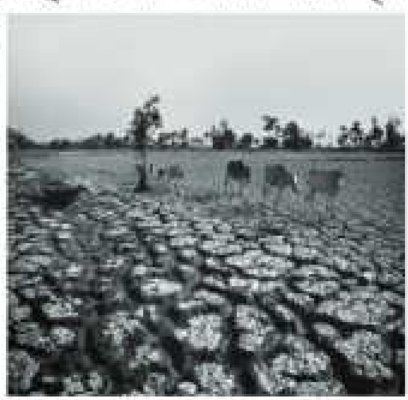

চিত্র ১৩.২ : উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি

বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার অনেক অংশ সমুদ্রের জলমগ্ন হয়ে পড়বে। এছাড়া ভূনিম্নস্থ পানিতে লোনা পানি প্রবেশ করছে। ফলে স্বাভাবিক উদ্ভিদ জন্মানোর পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে (চিত্র ১৩.২)। পাহাড় ও ভূমিধস বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। পরোক্ষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের বিভিন্ন সংক্রমণ রোগ, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ ও পেটের পীড়া। এভাবে চলতে থাকলে পুরো পরিবেশ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। দেখা দেবে নানা বিপর্যয়। তাই সহনশীল টেকসই পরিবেশ আমাদের কাম্য। আমরাই আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় (Techniques of keeping the balance of environment)

আমরা পরিবেশ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করি। এই প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার যথাযথ হলে পরিবেশ টিকে থাকবে। তাই সম্পদের সংরক্ষণ তথা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় তৎপর হতে হবে।

পরিবেশ দিনে দিনে নষ্ট হচ্ছে কিন্তু তাকে কে রক্ষা করবে? এর দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের উচিত পরিবেশের উপাদানের প্রতি যত্নশীল হওয়া, সতর্কতার সঙ্গে সম্পদ ব্যবহার করা। তাহলে পরিবেশ সংরক্ষণ করা যাবে।

বনজ সম্পদ জাতীয় অর্থনীতিতে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বিশেষ অবদান রাখছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনাঞ্চলে অবৈধ প্রবেশ ও জ্বালানির উদ্দেশে ব্যাপক গাছপালা নিধন ইত্যাদি কারণে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া মাটি দূষণ, বায়ু দূষণ প্রভৃতি রোধ করলে তবে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্ভব।

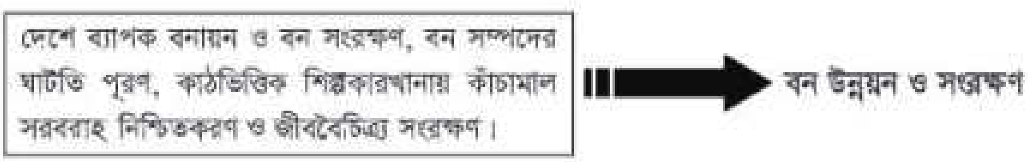

বন সংরক্ষণে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

১। নিঃশেষিত পাহাড় এবং খাস জমিতে বনের বিস্তার ঘটানো।

২। গ্রামীণ এলাকায় পতিত ও প্রান্তিক জমিতে বৃক্ষরোপণ।

৩। সড়কপথ, রেলপথ ও সকল প্রকার বাঁধের পাশে বনায়ন।

৪। বনায়ন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি।

৫। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

জ্বালানি ব্যবস্থাকে অধিকতর দক্ষ করে তুলতে হবে। সৌর, বায়ু, পানি, বায়োগ্যাস, সমুদ্র, পশু এবং মানব শক্তিকে ব্যবহার করে নতুন ও পুর্নব্যবহারযোগ্য জ্বালানি উদ্ভাবন করতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরূপ :

১। পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার রোধ

২। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

৩। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

৪। সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলা

৫। বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ

৬। নদী বাঁচাও কর্মসূচি

৭। ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (ইউনিসেফ) ও দক্ষিণ এশিয়া পরিবেশ সহযোগিতা সংস্থা (সাকেপ-এর একটি সদস্য দেশ)

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস যেমন– বিশ্ব পরিবেশ দিবস, বিশ্ব মরুময়তা দিবস, আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ইত্যাদি পালনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাতে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশগত অবক্ষয় রোধের জন্য প্রয়োজন সমন্বিত নীতি, সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন, পরিবেশসম্মত টেকসই পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কর্মসূচি। এ লক্ষ্যে সরকার ও জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব।

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

একই পরিবেশে বহু ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্বাভাবিক অবস্থানকে জীববৈচিত্র্য বলে। পরিবেশ ভারসাম্য পূর্ণ হয় এই ধরনের জীবের একত্রে অবস্থানের কারণে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Conservation of Biodiversity)

জীববৈচিত্র্য পরিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মূল উপাদান। মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবার উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান, ঔষধ, বিনোদন ইত্যাদির জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। এ সকল সম্পদ বনাঞ্চল, নদী-নালা, অন্যান্য জলাশয় ও সমুদ্র থেকে আহরণ করা হয়।

মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অবাধে চলতে থাকলে ২০২৫ সালের মধ্যে ২০-২৫ শতাংশ প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য প্রচুর এবং তার সম্ভাবনাও অনেক। তবে তা আজ হুমকির সম্মুখীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সংকুচিত হচ্ছে অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থল। তারা হারিয়েছে তাদের শিকারের ক্ষেত্র। এককালে বাংলাদেশের অনেক এলাকা জুড়ে রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা ডোরাকাটা বাঘ দেখা যেত। এখন তাদের কেবল সুন্দরবনেই খুঁজে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শুরুতে ভাওয়াল ও মধুপুরের গড় অঞ্চলে হাতির দেখা মিলেছে। এখন কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট এবং ময়মনসিংহের পাহাড়েই হাতি দেখা যায়।

বাংলাদেশে ১১৯ জাতের স্তন্যপায়ী, ৫৭৮ জাতের পাখি, ১২৪ জাতের সরীসৃপ ও ১৯ জাতের উভচরকে শনাক্ত করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার কর্তৃক প্রকাশিত রেড ডাটা বুক-এ বাংলাদেশের ২৩টি প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, হাতি, অজগর, কুমির ও ঘড়িয়াল ইত্যাদি। কারো মতে বাংলাদেশে ২৭টি বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন। আরও ৩৯টি প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন। উনিশ শতকেই ১৯টি প্রজাতি বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এর মধ্যে আছে তিন ধরনের গরু, বুনো মহিষ, এক ধরনের কালো হাঁস, নীল গাই, কয়েক ধরনের হরিণ, রাজশকুন ও মিঠা পানির কুমির ইত্যাদি।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন জরুরিভিত্তিতে দৃঢ় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা, এনজিও, বেসরকারি খাত ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার এবং নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- জীববৈচিত্র্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সমীক্ষা গ্রহণ
- জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করে জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে তা সম্পৃক্তকরণ
- ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য পরিবেশগত সুবিধা প্রদানকারী প্রতিবেশ-ব্যবস্থায় জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ
- জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য জনগণকে উৎসাহিত ও সম্পৃক্তকরণ

- সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিত করার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বাস্তব (Natural habitat) সংরক্ষণ নিশ্চিত করা

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে–

- সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ইকো-সিস্টেম-এর উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ
- আন্তঃদেশীয় সীমানায় অবৈধ বন্যপ্রাণী ব্যবসা বন্ধ এবং বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্প গ্রহণ

বনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে অতিসম্প্রতি সোনারচর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, দুলমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং তাংমোরী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশের কোন জেলা জলমগ্ন হবে?

(ক) নোয়াখালী (খ) দিনাজপুর

(গ) রংপুর (ঘ) বগুড়া

২। পরিবেশের অবক্ষয় রোধের জন্য প্রয়োজন–

i. সমন্বিত নীতি

ii. সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নয়ন

iii. পরিবেশসম্মত টেকসই পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুমি শীতের ছুটিতে খুলনায় মামার বাসায় বেড়াতে যায়। একদিন মামার সঙ্গে সুন্দরবন দেখতে গেলে সে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু ও বৃক্ষাদি দেখতে পায়। সে মামার কাছে জানতে পারে অতীতে এ বনে আরও বেশি জীবজন্তু ও গাছপালা ছিল।

৩। সুমির দেখা বনভূমিতে পাওয়া যায়–

(ক) কড়ই, গজারি
(খ) গরান, গোলপাতা
(গ) চাপালিশ, তেলসুর
(ঘ) শাল, সেগুন

৪। উক্ত বনভূমি ধ্বংস হলে–

i. ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা বাড়বে
ii. উদ্ভিদ জন্মানোর পরিবেশ নষ্ট হবে
iii. জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) i ও iii
(গ) ii ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। একদল শিক্ষার্থী শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌভ্রমণে যায়। সেখানে তারা নদীর পানির স্বাভাবিক রং না দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়।

ক. জলজ ক্ষুদ্র প্রাণীর নাম কী?
খ. মাটি দূষিত হয় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর।
গ. শিক্ষার্থীদের দেখা নদীটির পানির রং স্বাভাবিক নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উক্ত নদীর পানির রং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন? তোমার মতামত দাও।

২। কনক ও কাকন সাভার যাওয়ার পথে আমিন বাজার পার হওয়ার পরেই চোখে জ্বালাপোড়া অনুভব করে। তারা দেখতে পায় রাস্তার উভয় পাশে অনেক ইটের ভাটা।

ক. বায়ু দূষণ কী?
খ. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।
গ. কনক ও কাকনের চোখ জ্বালাপোড়া করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবেশ উদ্ভিদকুলের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলবে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

Natural Disaster of Bangladesh

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতি বছরই আমাদের জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এসব দুর্যোগের অন্যতম কারণ।

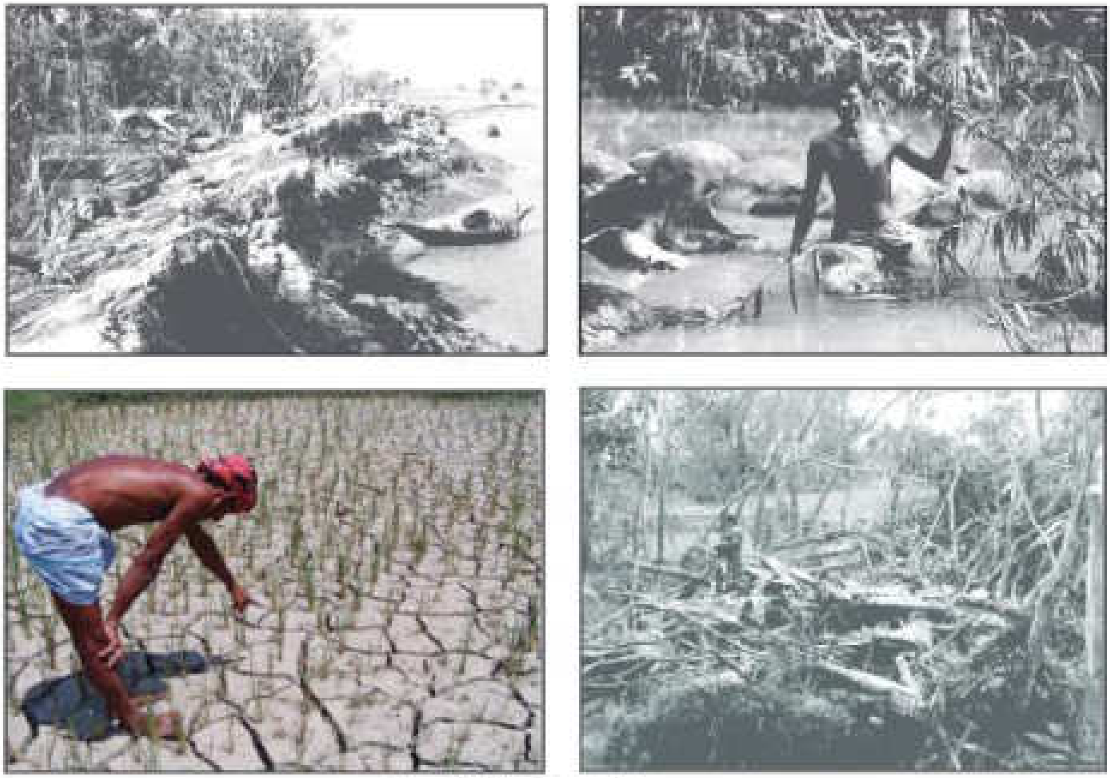

কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- দুর্যোগ ও বিপর্যয় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্ণনা করতে পারব;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ভূমিকম্পের মাত্রা ও সুনামির পূর্বাভাস প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারব;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবো এবং অন্যকে সচেতন করব।

দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Disaster and Hazard)

আমাদের মতো দুর্যোগপ্রবণ দেশের প্রতিটি নাগরিকের বিপর্যয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। দুর্যোগ হচ্ছে এরূপ ঘটনা, যা সমাজের স্বাভাবিক কাজকর্মে প্রচণ্ডভাবে বিঘ্ন ঘটায় এবং জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এই ক্ষতি মোকাবিলা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। দুর্যোগ কোনো স্থানের জনবসতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়, যার ফলে ঐ জনবসতি পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। এর জন্য বাইরের সাহায্য বা হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বিপর্যয় বলতে বোঝানো হয়েছে কোনো এক আকস্মিক ও চরম প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট ঘটনাকে। এই ঘটনা জীবন, সম্পদ ইত্যাদির উপর প্রতিকূলভাবে আঘাত করে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বন্যা (Flood)

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা অন্যতম। এ দেশের মানুষের কাছে বন্যা যেমন ভয়াবহ তেমনি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর অপরিসীম প্রভাব ফেলে।

প্রকৃতপক্ষে এ দেশের প্রেক্ষিতে কোনো এলাকা প্লাবিত হয়ে যদি মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতিসাধন হয় তাহলেই বন্যা হয়েছে বলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও বৃষ্টিবহুল দেশ। এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৩০০ মিলিমিটার। ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীসহ ৭০০টি নদী এ দেশে জালের মতো বিস্তার করে আছে। এর মধ্যে ৫৪টি নদীর উৎসস্থল ভারতে অবস্থিত।

বন্যার কারণ (Causes of Flood)

প্রাকৃতিক কারণ	মানবসৃষ্ট কারণ
উজানে প্রচুর বৃষ্টি	নদী অববাহিকায় ব্যাপক বৃক্ষ কর্তন
ভৌগোলিক অবস্থান	গঙ্গা নদীর উপর নির্মিত ফারাক্কা বাঁধ
মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব	অন্যান্য নদীতে নির্মিত বাঁধের প্রভাব
নদীর গভীরতা কম	অপরিকল্পিত নগরায়ণ
হিমালয়ের বরফগলা পানিপ্রবাহ	
বঙ্গোপসাগরের তীব্র জোয়ার-ভাটা	
ভূমিকম্প	

বন্যার শ্রেণিবিভাগ (Classification of Flood)

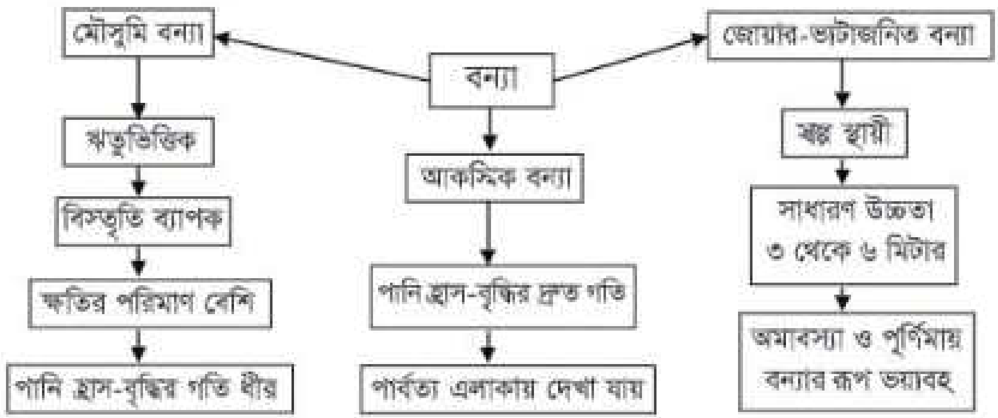

বন্যার প্রভাব (Impact of Flood)

বাংলাদেশের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক। বন্যায় এলাকা প্লাবিত হয়ে বিপুল পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হয়। মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। পশুপাখির জীবন বিনষ্ট ও বিপন্ন হয়। ধ্বংস হয় সম্পদ। ২০০০ সালের বন্যায় দেশের ১৬টি জেলার ১.৮৪ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়। উৎপাদন আকারে এ ক্ষতির পরিমাণ ৫.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন।

কাজ : বন্যায় **ক্ষতিগ্রস্তের** পরিসংখ্যান থেকে শেষ পাঁচ বছরের **ক্ষতিগ্রস্ত** এলাকার শতকরা মান **স্তম্ভ** লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ বাংলাদেশ তথা এ ঢালু সমভূমির দেশে বিভিন্ন শতাব্দীতে বন্যা হয়েছে। ১৯৫৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের বন্যা ছিল ভয়াবহ। এর মধ্যে ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় সবচেয়ে বেশি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাতের যে রেকর্ড রয়েছে তা তুলনাহীন বলা যায়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণেই বন্যা এ দেশের একটি চির পরিচিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই বলা যায় দুর্যোগ এবং বিপর্যয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অতীতকাল থেকেই মানুষ বন্যা প্রতিকারের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আসছে।

এসো বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক :

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Flood Control Measures)

ক. সাধারণ ব্যবস্থাপনা (General management)

(১) সহজে স্থানান্তরযোগ্য বসতি তৈরি করা।
(২) নদীর দু'তীরে ঘন জঙ্গল সৃষ্টি করা।
(৩) নদী-শাসন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।
(৪) বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন।
(৫) পুকুর, নালা, বিল প্রভৃতি খনন করা এবং সেচের পানি সংরক্ষণ করা।
(৬) প্রতি বছর বন্যা মোকাবেলার জন্য সরকারিভাবে স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা।

খ. শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল প্রকৌশল ব্যবস্থাপনা (Labour intensive and expensive engineering management)

(১) ড্রেজারের মাধ্যমে নদীর তলদেশ খনন করে পানির পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
(২) সন্নিহিত স্থানে জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে পানিপ্রবাহকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা।
(৩) ভারত থেকে আসা পানিকে বাঁধের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন করা।
(৪) সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।
(৫) নদী তীরকে স্থায়ী সুদৃঢ় কাঠামোর সাহায্যে সংরক্ষণ করা।

গ. সহজ প্রকৌশলগত ব্যবস্থাপনা (Easy engineering management)

(১) নদীর দু'তীরে বেড়িবাঁধ দিয়ে নদীর পানি উপচে পড়া বন্ধ করা
(২) দেশের সর্বত্র বনায়ন সৃষ্টি করা
(৩) রাস্তাঘাট নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা
(৪) বন্যা প্রবল অঞ্চলে সর্বোচ্চ বন্যা লেভেলের উপরে 'আশ্রয়কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা
(৫) শহর বেষ্টনীমূলক বাঁধ দেওয়া

কাজ : কোনো বন্যা উপদ্রুত এলাকায় তোমরা সাহায্যের জন্য যাওয়ার সময় কোন কোন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেবে ছক আকারে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি কর।

বন্যা এ দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করে। তাই বলা যায় বন্যা বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা। এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিছু প্রচেষ্টা পরিকল্পনাধীন আছে। বাংলাদেশের প্রধান ৩টি নদীর উৎস চীন, নেপাল, ভারত ও ভুটান। এ ৩টি নদীর মোট অববাহিকা এলাকার পরিমাণ ১৫,৫৪,০০০ কিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ এলাকা এ দেশে অবস্থিত। কিন্তু এসব নদী প্রবাহের ৮০ শতাংশেরও বেশি পানি বাইরে থেকে আসে এবং বন্যার জন্য দায়ী ৯০ শতাংশ পানিই এ ৩টি নদী নিয়ে আসে। তাই বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও এর মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা।

খরা (Drought)

দীর্ঘ সময় বৃষ্টি না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যে অবস্থা তাকে খরা বলে। অনেকদিন বৃষ্টিহীন অবস্থা থাকলে অথবা অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হলে মাটির আর্দ্রতা কমে যায়। সেই সঙ্গে মাটি তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা কোমলতা হারিয়ে রুক্ষরূপ গ্রহণ করে খরায় পরিণত হয়।

অনাবৃষ্টি বা খরার প্রভাব (Rainless or Impact of Drought)

- আমাদের দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খরার প্রভাবে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন কমে যায়
- খাদ্যদ্রব্যের অভাব হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়
- উপদ্রুত অঞ্চলে পানির অভাব দেখা দেয়
- প্রবল উত্তাপে বিভিন্ন ধরনের অসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটে
- পরিবেশ রুক্ষ হয়ে ওঠে
- অগ্নিকান্ডের উপদ্রব বেড়ে যায়

বৃষ্টিহীন ও খরাযুক্ত পরিবেশ মানুষ ও জীবজগতের স্বাভাবিক কাজকর্মের বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বনজ সম্পদ বৃদ্ধি তথা অধিক বৃক্ষরোপণ করে এবং ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)

বাংলাদেশে সংঘটিত প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং মারাত্মক ধ্বংসকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় উল্লেখযোগ্য। স্থান অনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ন নামকরণ হয় তা তোমরা পূর্বেই জেনেছ। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রমুখী ও উর্ধ্বমুখী বায়ুরূপে পরিচিত। এর কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপ এবং চারপাশে উচ্চচাপ বিরাজ করে। বাংলাদেশে আশ্বিন-কার্তিক এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে এ ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয় (চিত্র ১৪.১)। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কারণে ঘূর্ণিঝড় হয় এবং একই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণে ফানেল আকৃতির কারণে এ দেশে অধিক সংখ্যক ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়।

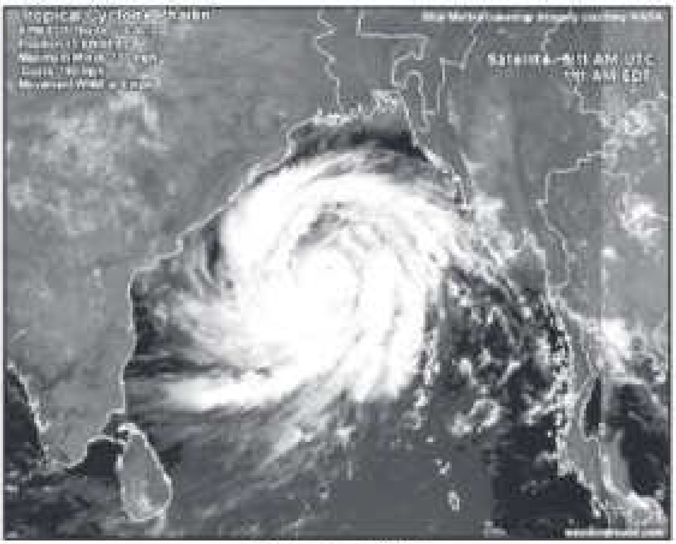

চিত্র ১৪.১ : ঘূর্ণিঝড়

২০১৮

কাজ : বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়ের ফলে মানুষের মৃত্যু ব্যতীত আর কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার একটি তালিকা তৈরি কর।

ঘূর্ণিঝড় একটি সাময়িক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। গত তিন দশকে বাংলাদেশের পূর্বাংশে বেশি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, কুতুবদিয়া, উরিরচর, চর জব্বার, চর আলেকজান্ডার প্রভৃতি স্থানে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের সময়কাল, নাম ও মৃত মানুষের সংখ্যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ১: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়

সংঘটিত হওয়ার সাল	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের নাম	মৃত মানুষের সংখ্যা **(জন)**
১২ই নভেম্বর ১৯৭০	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	প্রায় ৫,০০,০০০
২৯শে নভেম্বর ১৯৮৮	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	প্রায় ১,০৮,০০০
২৯শে এপ্রিল ১৯৯১	ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	প্রায় ৫,৭০৮
১৫ই নভেম্বর ২০০৭	সিডর	প্রায় ৩,৪৪৭
২৫শে মে ২০০৯	আইলা	প্রায় ৩৩০

নদীভাঙন (River Bank Erosion)

নদীখাতে পানিপ্রবাহের কারণে পার্শ্ব ক্ষয়কে নদীভাঙন বলে। পলিমাটি গঠিত সমভূমি অধ্যুষিত বাংলাদেশে নদীভাঙনে প্রতি বছর প্রচুর ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়। অনেক মানুষের জীবনহানি ঘটে।

কাজ : নদীর গতিপথ অবস্থার নাম উল্লেখ কর।		
১	২	৩

নদীভাঙনের কারণ (Causes of river bank erosion)

- জলবায়ু পরিবর্তন
- নদীর প্রবাহপথ ও তীব্র গতিবেগ
- নদীর গতিপথ পরিবর্তন
- নদীগর্ভে শিলার উপাদান
- রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি

- বাহিত শিলার কঠিনতা
- নদীগর্ভে ফাটলের উপস্থিতি
- বৃক্ষ নিধন

কাজ : নদীভাঙনের কারণগুলো কীভাবে নদীভাঙনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে? দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি কারণ ব্যাখ্যা কর।	
কারণ	কার্যকরী ভূমিকা
১।	
২।	

চিত্র ১৪.২ : নদীভাঙন

স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট বাংলাদেশে নদীভাঙনকে একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে। বর্ষাকালেই নদীভাঙন বেশি হয়। বিশেষত প্রায় প্রতি বছর বন্যা মৌসুম ও সন্নিহিত সময়ে প্রায় ৪০টি ছোট-বড় নদীতে নদীভাঙন দেখা যায়। অনেক সময় নদী-তীরে খরাজনিত ব্যাপক ফাটলের সৃষ্টি হলে তার প্রভাবেও নদীতে ভাঙন ধরে এবং ভূমির অংশবিশেষ নদীগর্ভে বিলীন হয় (চিত্র ১৪.২)। নদীভাঙনে ভূমির যে ক্ষয় হয় তা অপূরণীয়। এছাড়া আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়াও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

নদীভাঙনজনিত ক্ষয়ক্ষতি (Loss from river bank erosion)

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নদীভাঙন এ দেশের জন্য নিয়মিত সমস্যা বলা যায়। নদীভাঙনের ক্ষতি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ দেশে প্রতি বছর পদ্মা, যমুনা, মেঘনা ও তিস্তাসহ প্রায় ৪১০টি নদী-উপনদীতে বন্যা এবং সন্নিহিত নদীতে ভাঙনের ঘটনা ঘটে। এ দেশের মানুষ নদীভাঙন নামক দুর্যোগের সঙ্গে কমবেশি জড়িত। এর মধ্যে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোক প্রত্যক্ষভাবে নদীভাঙনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদের মধ্যে প্রায় তিন লক্ষ লোক আশ্রয় নেয় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাস্তা এবং বাঁধের উপর। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ২০০ কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া প্রতি বছর প্রায় ৮,৭০০ হেক্টর জমি নদীভাঙনে নিঃশেষ হয়ে যায়।

নদীভাঙনে ক্ষয়ক্ষতির উপাদান

খামার	ফসল
চাষযোগ্য জমি	গবাদি পশু
দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র	গাছপালা
বৈদ্যুতিক টাওয়ার	সেচ প্রকল্প
পারিবারিক অন্যান্য সম্পদ	সামাজিক প্রতিষ্ঠান
বসতবাড়ি	

কাজ : বাংলাদেশের মানচিত্রে পদ্মা ও যমুনা নদীর ভাঙন প্রবণ স্থানসমূহ নির্দেশ কর।

নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি চলমান প্রক্রিয়া বিশেষ। এ দেশের প্রধান নদী ও শাখানদী দ্বারা কমবেশি নদীভাঙন প্রক্রিয়া চলে। দেশের প্রায় ১০০টি উপজেলায় নদীভাঙন সংঘটিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতে নদীভাঙনে জমির মালিকগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তারা কখনই আর সে জমি পুনরুদ্ধার করতে পারে না। এ কারণে ভূমিহীন মানুষের স্থানান্তর ঘটে। এদের নির্দিষ্ট কোনো কাজের সুযোগ থাকে না। সেই সঙ্গে তারা সামাজিক মর্যাদাও হারায়। ফলশ্রুতিতে তারা দুর্ভিক্ষের সাথী হয়ে শহর-নগরের ভাসমান মানুষে পরিণত হয় এবং সর্বোপরি সরকারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ভূমিকম্প (Earthquake)

বাংলাদেশ যেহেতু মহাসাগরগুলো থেকে অনেক দূরে অবস্থিত, সেহেতু এ দেশকে সরাসরি সামুদ্রিক ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে তেমন চিহ্নিত করা যায় না। তবে বাংলাদেশের উত্তরে আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, হিমালয়ের পাদদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ভূমিকম্প প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষ করা যায়। এছাড়াও রয়েছে ভূ-গাঠনিক গতিময়তা। সামগ্রিক দিক হতে দেখা যায় বাংলাদেশ ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে (চিত্র ১৪.৩)।

চিত্র ১৪.৩ : ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভবন

বাংলাদেশের পূর্বাংশে রয়েছে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত স্বল্প ভাঁজবিশিষ্ট ভঙ্গিল প্রকৃতির পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধরা হয়। এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, সেলপাথর এবং কর্দম দ্বারা গঠিত। গঠনগত কারণে এ চত্বর ভূমিকম্পপ্রবণ।

আবার রয়েছে পুরাতন পলল গঠিত প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ– বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়। বাকি অংশে নবগঠিত প্লাবন সমভূমি। সুতরাং ভূতাত্ত্বিক গঠনগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশেষত উত্তর ও পূর্ব দিক যথেষ্ট ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল।

উত্তরে হিমালয় চত্বর এবং মালভূমি, পূর্বে মিয়ানমার আরাকান ইয়োমার অস্তিত্ব এবং উত্তর-পূর্বে নাগা-দিসাং-জাফলং অঞ্চলের সংশ্লিষ্টতা অনেক বেশি ভূমিকম্পপ্রবণ করে তুলেছে।

১৫৪৮ সাল থেকেই বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প সংক্রান্ত রেকর্ড সংগৃহীত শুরু হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র উপকেন্দ্রের সঙ্গে তিন ধরনের পরিমাপ সম্পর্কযুক্ত। অগভীর কেন্দ্র (০-৭০ কিলোমিটার), মধ্য পর্যায়ের কেন্দ্র (৭০- ৩০০ কিলোমিটার) এবং গভীর কেন্দ্র (১,৩০০ কিলোমিটার)। সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপকেন্দ্র না থাকলেও সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প হলে তার প্রভাব হিসেবে বাংলাদেশেও ভূকম্পন অনুভূত হয়।

১৯৯৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে তিনটি ভূকম্পনীয় সংঘটিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা– অঞ্চল ১ (মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, রিখটার স্কেল মাত্রা ৭); অঞ্চল ২ (মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ, রিখটার স্কেল মাত্রা ৬); অঞ্চল ৩ (কম ঝুঁকিপূর্ণ, রিখটার স্কেল মাত্রা ৫)। এ তিনটি অঞ্চলের অধীনে রয়েছে যথাক্রমে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (চিত্র ১৪.৪)। বাংলাদেশে সংঘটিত কয়েকটি ভূমিকম্পের সময়কাল, রিখটার স্কেল মাত্রা ও ক্ষয়ক্ষতি নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ২ : বাংলাদেশে সংঘটিত কয়েকটি ভূমিকম্প

সাল	রিখটার স্কেলে	ক্ষয়ক্ষতি
১২ই জুন, ১৮৯৭	৮.৭ মাত্রায়	ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পরিবর্তন
২২শে নভেম্বর, ১৯৯৭	৬.০ মাত্রায়	চট্টগ্রাম শহরে সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হয়
২৭শে জুলাই, ২০০৮	৫.১ মাত্রায়	ক্ষয়ক্ষতি না হলেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়

উৎস : বাংলাপিডিয়া

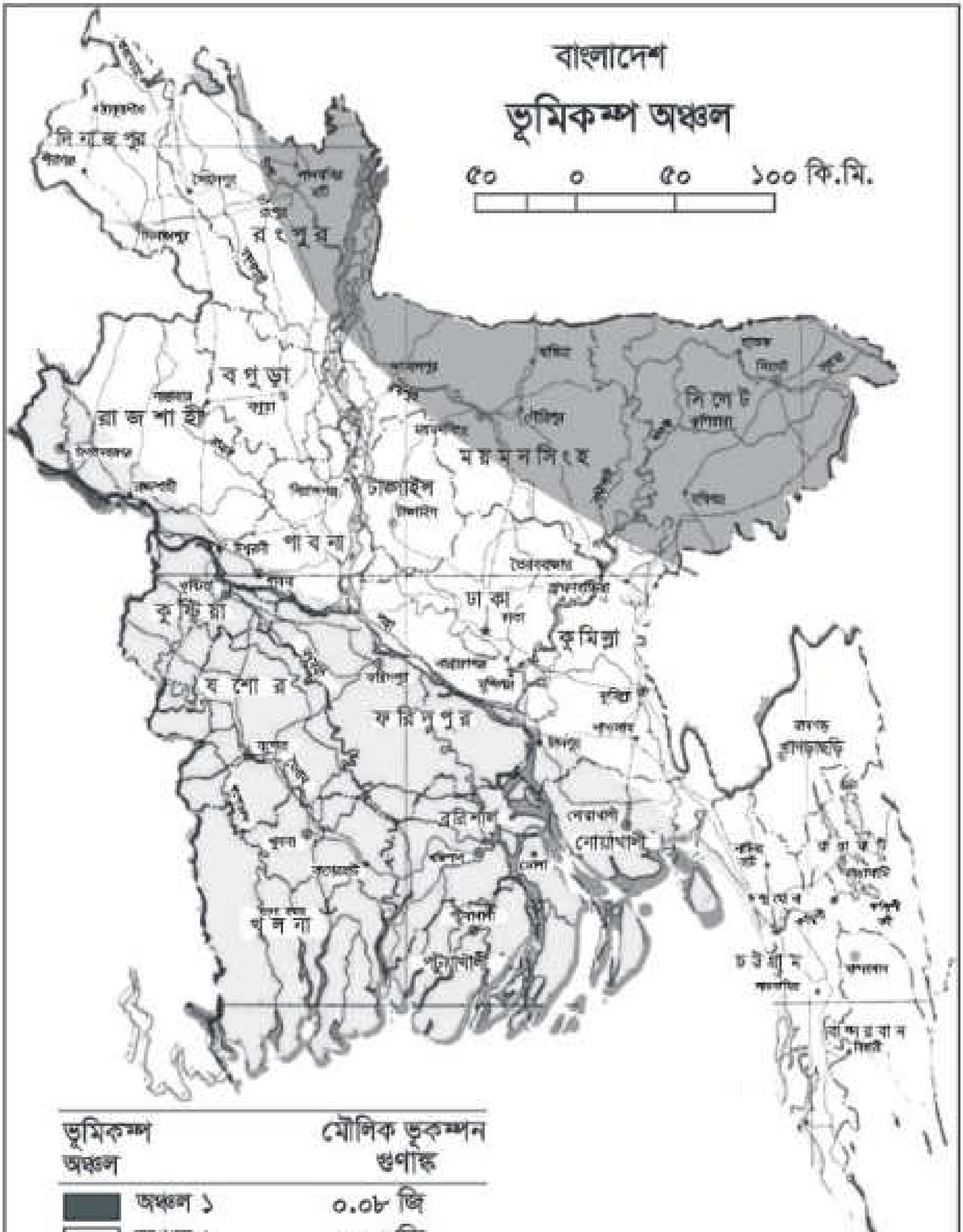

চিত্র ১৪.৪ : বাংলাদেশের ভূকম্পনীয় সংঘটিত অঞ্চল

কাজ : ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্য প্রস্তুতিমূলক ৪টি কাজের তালিকা তৈরি কর।

ভূমিকম্পে করণীয় (What is to be done in earthquake)

বাড়িতে থাকাকালীন বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। গ্যাসের চুলা বন্ধ করতে হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হবে।

ট্রেনে বা গাড়ির ভিতর থাকাকালীন যদি ভূমিকম্প হয় তবে কোনো জিনিস ধরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।

লিফটের ভিতরে থাকাকালীন দ্রুত নিচে নামার চেষ্টা করতে হবে।
লিফটের ভিতরে আটকে পড়লে লিফট রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে হবে।

মার্কেট, সিনেমা হল, আন্ডারগ্রাউন্ড ও শপিংমলে থাকলে এতদাঞ্চলে ভূমিকম্পে আকস্মিক ভীতিকর এক পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। আগুন লাগাও স্বাভাবিক। তাই এক্ষেত্রে প্রথমে নিচু হয়ে বসে বা শুয়ে থাকা শ্রেয় এবং পরবর্তীতে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হবে।

বাড়ির বাইরে থাকাকালীন বড় দালান-কোঠার নিচে না দাঁড়িয়ে খোলা মাঠে বা স্থানে দাঁড়াতে হবে।

হাতের কাছে সবসময় লোহা কাটা করাত, পানির বোতল, আগুন রোধক রাখতে হবে।

অতীতকাল থেকে বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে আসছে। আমাদের দেশে প্রধানত ভূমিকম্প হয় গঠনগত কারণে। এছাড়া পানির স্তর দ্রুত নিচে নেমে যাওয়ার কারণেও কিছু স্থান প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারাতে বসেছে। এ দিক দিয়ে ঢাকা শহর উল্লেখযোগ্য। আবার অন্যদিকে ঢাকার উপর নগর গড়ার চাপ থাকায় ক্রমেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (Essential Measures)

- ভূমিকম্প সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন
- সারাদেশে ভবন নির্মাণে জাতীয় 'বিল্ডিং কোড' এবং কোডের কাঠামোগত অনুসরণ বাধ্যতামূলক হবে
- ঢাকা শহরে রাজউকের ভবন নির্মাণ প্ল্যান অনুমোদনের নীতিমালা যুগোপযোগী করা প্রয়োজন
- সারাদেশে রাস্তা প্রশস্ত করতে হবে
- ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কর্তৃক তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতি প্রত্যেক জেলা প্রশাসকের দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে স্বেচ্ছাসেবক দলগঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে
- দুর্যোগকবলিত এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য নৌবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে 'ডগ স্কোয়াড' রাখা
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন ও মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা

৯। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক সিলেটে নির্মীয়মান কেন্দ্রের সঙ্গে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর এবং সিলেট কেন্দ্রের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা

কাজ : ভূমিকম্পের পরে দুর্যোগকবলিত এলাকায় বহুবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত? আলোচনা অনুষ্ঠান।

সুনামি (Tsunami)

ভূমিকম্পের সঙ্গে সুনামি সংঘটনের সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশে সুনামি সংঘটনের তেমন উল্লেখযোগ্য প্রচলন নেই। তবে অতীতে ১৭৬২ সালের ২রা এপ্রিল কক্সবাজার এবং সন্নিহিত অঞ্চলে সুনামির প্রভাব ঘটে। মিয়ানমারে আরাকান উপকূলে ৭.৫ রিখটার স্কেল মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটনের ফলে সুনামির আগমন হয়। ১৯৪১ সালে আন্দামান সাগরে ভূমিকম্পের ফলে বঙ্গোপসাগরে সুনামি সংঘটন হয়। তবে এর ফলে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয় ভারতের পূর্ব উপকূল। এর পরিণতিতে ৫,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়। ২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সিনুয়েলুয়ে দ্বীপে সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণে যে সুনামির আগমন ঘটে, তার প্রভাব বাংলাদেশে ঘটতে দেখা যায় এবং লোকের মৃত্যু ঘটে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এরূপ একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান যার আওতায় পড়ে– যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং দুর্যোগে সাড়াদান ও পুনরুদ্ধার ইত্যাদি কার্যক্রম।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তিনটি :

(ক) দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা;

(খ) প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ পৌঁছানো ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং

(গ) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ের কার্যক্রমকে বোঝায়।

নিম্নে প্রদত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপাদানসমূহ ও দুর্যোগের কোন স্তরে কী ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন, সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র (Disaster Management Circle)

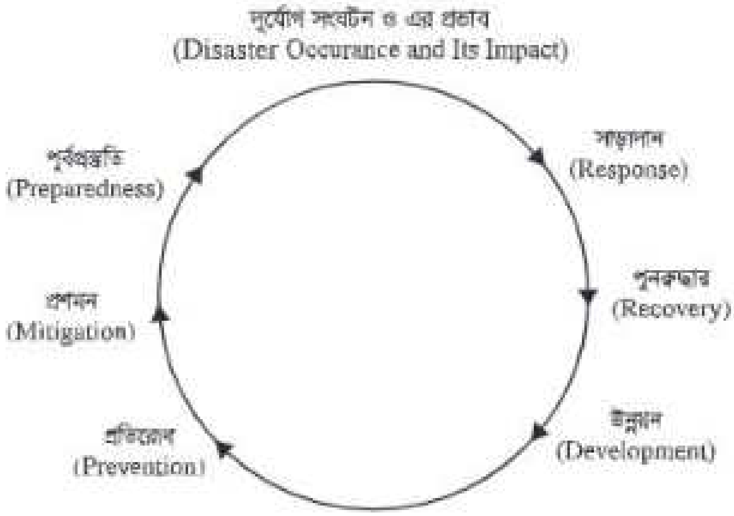

দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান। সুতরাং দুর্যোগকে কার্যত মোকাবিলার লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব সময়েই এর ব্যবস্থাপনার বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয়। দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই এর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন। অতীতে দুর্যোগে সাড়াদানকেই সম্পূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হতো।

প্রতিরোধ (Prevention)

প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে প্রতিরোধ কার্যক্রম সফলতা বয়ে আনতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধের কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত প্রশমনের ব্যবস্থা রয়েছে। কাঠামোগত প্রশমনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম যথা– বেড়িবাঁধ তৈরি, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা ও মজবুত ঘরবাড়ি তৈরি, নদী খনন ইত্যাদি বাস্তবায়নকেই বোঝায়। কাঠামোগত দুর্যোগ প্রশমন খুবই ব্যয়বহুল, যা অনেক দরিদ্র দেশের পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। অকাঠামোগত দুর্যোগ প্রতিরোধ যেমন– প্রশিক্ষণ, গণসচেতনতা বৃদ্ধি, পূর্বপ্রস্তুতি ইত্যাদি কার্যক্রম স্বল্প ব্যয়ে করা সম্ভব।

প্রশমন (Mitigation)

দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতিকেই দুর্যোগ প্রশমন বলে। মজবুত পাকা ভবন নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহারে বিপর্যয় হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শক্ত অবকাঠামো নির্মাণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর; প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের

আওতাভুক্ত। দীর্ঘস্থায়ী দুর্যোগ প্রশমন ব্যয়বহুল হলেও সরকার সীমিত সম্পদের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদী খনন, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রস্তুতকরণ (Preparedness)

দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলতে দুর্যোগপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাসমূহকে বোঝায়। আগে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ড্রিল বা ভূমিকা অভিনয় এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতার যন্ত্র ইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত ।

সাড়াদান (Response)

সাড়াদান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ মাত্র। দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়। সাড়াদান বলতে নিরাপদ স্থানে অপসারণ, তল্লাশি ও উদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বোঝায়।

পুনরুদ্ধার (Recovery)

দুর্যোগে সম্পদ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে, তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই পুনরুদ্ধার বোঝায়। এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হয়।

উন্নয়ন (Development)

ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরপরই ঐ এলাকার উন্নয়ন কাজে হাত দিতে হয়। উন্নয়ন কর্মকান্ড হাতে নেওয়ার পূর্বে ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ রাখতে হবে।

উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা (Coastal Disaster Management)

উপরিউক্ত যে সকল দুর্যোগ সম্পর্কে বলা হলো, তার মধ্যে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলসমূহে ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, অন্যদেশের ভূমিকম্পের প্রভাব প্রভৃতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তা বেশিরভাগই উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল সাধারণত খরা, নদীভাঙন, বন্যা ও ভূমিকম্প দ্বারা প্রভাবিত হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিকে তাৎক্ষণিক মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক সময়মতো

পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ। এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য সরকারি পেশাভিত্তিক দপ্তর হিসেবে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর কাজ করে থাকে। পাশাপাশি মহাকাশ গবেষণার জন্য সরকারি আরও একটি সংস্থা হচ্ছে স্পারসো। স্পারসো ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘচিত্র সরবরাহ করে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে সহায়তা করে। আবহাওয়া অধিদপ্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবহাওয়ার উপাত্ত সংগ্রহ করে, রাডার চিত্র নিয়ে অঙ্কন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস দান ও প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। যদিও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার কোনো কলাকৌশল অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি, তথাপি রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। জরুরি পরিস্থিতিতে আর্তদের চিকিৎসা, উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজে আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বেসামরিক প্রশাসনকে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে থাকেন। বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন– অক্সফাম, ডিজাস্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কারিতাস, প্রশিকা, সিসিডিবি, বিডিপিসি (বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়েই আমাদের থাকতে হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যক্রম যেমন– উন্নয়ন, প্রতিরোধ, প্রশমন ও প্রস্তুতি ইত্যাদি স্বাভাবিক সময়ে অর্থাৎ দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় সফলভাবে পরিচালিত করলে দুর্যোগকালীন সময়ে আমরা দুর্যোগের হাত থেকে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশকে বহুলাংশে রক্ষা করতে সক্ষম হবো। তাই যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার স্বার্থে আমাদেরকে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত আপদকালীন পরিকল্পনা, ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তৈরি করে অনুশীলনের মাধ্যমে এসবের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত মিলিমিটার?

(ক) ২১০০ (খ) ২২০০

(গ) ২৩০০ (ঘ) ২৪০০

২। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো–

i. ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা

ii. ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা

iii. পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সম্প্রতি শ্যামনগর উপজেলায় ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ে জান ও মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। রফিক ও তার বন্ধুরা দুর্গতদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করে ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

৩। রফিক ও তার বন্ধুরা যে কাজ করেছে তাকে কী বলা যায়?

(ক) প্রতিরোধ (খ) প্রতিকার

(গ) সাড়াদান (ঘ) পুনরুদ্ধার

৪. উল্লিখিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতি হ্রাস করার উপায়–

i. আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ

ii. দুর্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণদান

iii. গণসচেতনতা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শিশিরদের পরিবার যমুনা নদীর পারে বসবাস করত। এ বছর বর্ষায় নদীভাঙনের ফলে তারা ঘরবাড়ি ও ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। শিশিরদের পরিবারের মতো আরও অনেক পরিবার রয়েছে, যারা এ ধরনের দুর্যোগের শিকার হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারে না।

ক. নদীভাঙন কী ধরনের দুর্যোগ?

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলতে কী বোঝায়?

গ. শিশিরদের পরিবার যে ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিশিরদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরিয়ে আনতে কী ধরনের ব্যবস্থা দরকার? তোমার মতামত দাও।

২। রূপম তার গ্রামের বাড়ি নরোত্তমপুরে পড়ার টেবিলে পড়াশোনায় ব্যস্ত। হঠাৎ সে টেবিলে একটি ঝাঁকুনি অনুভব করল। সে দেখতে পেল তার ঘরের ঝুলন্ত বস্তুগুলো এদিক ওদিক দুলছে। সে আরও লক্ষ করল বাইরে ভীত সন্ত্রস্ত লোকজন ছোটাছুটি করছে এবং পার্শ্ববর্তী একটি উঁচুভবন হেলে পড়ছে।

ক. বিপর্যয় কী?

খ. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশমন বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. রূপম যে পরিস্থিতি দেখতে পেল তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উল্লিখিত ঘটনাটি ঢাকা শহরে ঘটলে কী ধরনের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে এর উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সংস্থাটি অনেক সাফল্য লাভ করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে সকলের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের সমন্বয়ে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' (এসডিজি) অর্জনে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা এসডিজি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি। জাতিসংঘ নির্ধারিত এসডিজি অর্জনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সাথে বাংলাদেশও সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু এ কাজ খুব সহজ নয়। এ কাজে সরকার ও জনগণকে একযোগে কাজ করতে হবে। এ অধ্যায়ে এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব, এসডিজি অর্জনের ফলাফল, এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের করণীয় সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব;

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার ডিজাইন করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হব।

পাঠ-১: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব

এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার অংশীদারিত্ব কী? উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায়, তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়নকর্মী বা সরকারের একার পক্ষে উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক, ভালো ফসল ফলানোর জন্য সরকার বা কোনো উন্নয়ন সংগঠন সার ও প্রয়োজনীয় কীটনাশক সরবরাহ করবে। কিন্তু যারা এটি ব্যবহার করবে তারা যদি অসচেতনভাবে মাত্রার অতিরিক্ত ব্যবহার করে, তা কখনো পরিবেশবান্ধব হবে না। এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সচেতনতার সাথে পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব। যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হোক না কেন, তা যেন সকলের কথা ভেবে হয়। যার যতটুকু দায়িত্ব তা স্ব-স্ব অবস্থানে থেকেই পালন করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু বেসরকারি খাত বা সংগঠন নয়, তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টায় একযোগে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত তৎপরতাকে আরও সুসমন্বিত করতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব রয়েছে। অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়ায় সমাজের উঁচুতলার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফলে সাধারণ মানুষ এসডিজি অর্জনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব খুবই গুরুত্ব বহন করে। এসডিজি অর্জন কেবল নিজ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

এসডিজি অর্জনে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা যেমন চিন্তা করা হচ্ছে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করে উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে হবে।

তবে সব অভীষ্ট সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যে দেশের জন্য যেসব অভীষ্ট অর্জন জরুরি তারা সেগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক

হচ্ছে সার্বিক সক্ষমতা অর্জন। টেকসই উন্নয়নের প্রধান একটি অভীষ্ট হচ্ছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সূচনা করে। যে দেশের যে ধরনের সক্ষমতা রয়েছে, সে দেশ সেভাবে নিজেদের ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামষ্টিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এগিয়ে আসবে। কাউকে পিছিয়ে রেখে অন্যরা এগিয়ে গেলে সেই উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে টেকসই হবে না।

কাজ: টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন আলোচনা করে লেখ।

পাঠ-২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের সম্ভাব্য ফলাফল

বর্তমান পৃথিবী নামক গ্রহটির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই এসডিজি বাস্তবায়ন করা জরুরি। বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সারা পৃথিবীর সচেতন মানুষকে শঙ্কিত করে তুলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানুষ, সমাজ, কৃষি উৎপাদন, স্থলজ ও জলজ প্রাণিকুলকে ক্রমাগত মারাত্মক হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এর হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক বিবেচনায় এবং সামাজিক সূচকের নিরিখে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য কমেছে, আয় বেড়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সক্ষমতাও এসেছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। আমরা এমডিজি অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছি। আমরা ভবিষ্যৎ উন্নয়নে আশাবাদী। আগামী দশকগুলোতে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার মতো আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা অর্জন করে চলেছি। এমডিজি অর্জনের হাত ধরেই বর্তমানে এসডিজি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় এটিও আমরা সফলভাবে অর্জন করতে পারব। এর ফলে দারিদ্র্যের অবসান ঘটবে। বৈষম্য কমে আসবে, আয় ও ভোগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টির ফলে বৈশ্বিক অঙ্গনে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিরাজ করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে সুবিধাগুলো সৃষ্টি হবে তা হলো, বৈদেশিক ঋণের বোঝা থাকবে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর হবে। সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার দ্বার উন্মোচিত হবে। অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং তথ্য অধিকার সংরক্ষিত হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ফলে আমরা নিজেদেরকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভাবতে শিখব। খেলাধুলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরা এগিয়ে যাব। এক উন্মুক্ত বিশ্বে বসবাস করার সকল সুযোগ আমাদের দোর গোড়ায় পৌঁছে যাবে। আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য যেসব ফলাফল লাভ করবে তা নিম্নরূপ-

- দারিদ্র্যসীমা শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা যাবে।
- মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার চাহিদা পূরণ হবে।
- জেন্ডার সমতাবিধান ও নারী এবং মেয়েদের ক্ষমতায়নের ফলে সমাজের সকল স্তরে নারী নির্যাতন হ্রাস পাবে।

- গ্রাম ও শহরে বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা গেলে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশ তৈরি হবে।
- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রশমন হবে।
- টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
- সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে নৈরাজ্য কমে আসবে এবং স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী হলে রাজনৈতিক অস্থিরতা হ্রাস পাবে।
- বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ফলে অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিরসন হবে।

কাজ-১: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের ফলে বাংলাদেশের কী কী সুবিধা হবে দলগত কাজের মাধ্যমে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

কাজ-২: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জিত হলে আমরা যে সুবিধাগুলো ভোগ করব সে বিষয়ে ধারণা মানচিত্র অঙ্কন কর।

পাঠ-৩: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ জাতিসংঘ নির্দেশিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য' (এমডিজি) অর্জনে ইতোমধ্যে অনুসরণীয় সাফল্য দেখিয়েছে। বাংলাদেশকে বলা হচ্ছে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের রোল মডেল। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনে অংশীদারিত্বের পারস্পরিক দায়িত্ব পড়েছে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশের উপর। এর উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জন করতে হবে। পৃথিবীর সকল দেশ এ লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ পাঠে আমরা বাংলাদেশ এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারে, সে বিষয়ে জানব।

একটি দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে হলে সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবতে হয়। আর টেকসই উন্নয়ন হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা। টেকসই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের অসম বণ্টন, বৈষম্য ও দারিদ্র্য। আমরা একদিকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি, অন্যদিকে বিশ্বে তখন সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দারিদ্র্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে। বিশ্বে সম্পদের বৈষম্য যত বাড়বে ধনী ও গরিবের বিভক্তি তত প্রকট হবে। আর বিভক্তি যত বাড়বে, বিদ্বেষ-বিভেদও তত বাড়তে থাকবে।

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটেছে তা ভারসাম্যহীন। এই উন্নয়ন হচ্ছে দেশে দেশে এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিভেদ বর্ধনকারী উন্নয়ন। এই প্রকট ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভক্তি টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশও এই চ্যালেঞ্জের বাইরে নয়। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো আয় ও

ভোগ বৈষম্য। গত কয়েক বছরে এই বৈষম্য বাড়েনি বরং কিছুটা কমেছে, তথাপি বিদ্যমান বৈষম্য প্রকট। আমাদের সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ ভূমি দখল, নদী দখল, বন দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করে অপরিমিত সম্পদশালী হয়েছে। এর ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠছে ও পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অব্যাহত যাত্রা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যক্তি পর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়-সর্বত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং অংশীদারিত্ব না থাকলে টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হবে। শুধু সম্পদ বৈষম্যই নয়, আয়, ভোগ, জেন্ডার এবং অঞ্চল বৈষম্যও কখনো কখনো টেকসই উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে। সামাজিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকা-উন্নয়নের গতিকে পথরোধ করবে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা, গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও কৃষিপণ্য সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এসডিজি অর্জন বেশ কঠিন হবে বলে ধারণা করা যায়।

কাজ -১: এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত কর।

কাজ -২: 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জই হলো সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য'- পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

কাজ-৩: 'টেকসই উন্নয়নের পথে প্রধান চ্যালেঞ্জ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশদূষণ'- এ বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে বিতর্কের আয়োজন কর।

পাঠ-৪: চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়

আমরা জেনেছি যে, টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র হলো আমাদের সমাজ, অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। এগুলোকে মৌলিক বিবেচ্য বিষয়ও বলা হয়ে থাকে। মূলত এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন আশা করা যায়। টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে প্রত্যেককেই এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সচেতনতা রাষ্ট্রকে উন্নয়নের আরও এক ধাপ সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশদূষণ।

আমরা দেখতে পাই, একটানা বৃষ্টি হলেই বাংলাদেশের বড় বড় শহরগুলোতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তখন যান চলাচল ব্যাহত হয়, রাস্তা-ঘাটের ক্ষতি হয়, স্বল্প আয়ের লোকদের কাজ বন্ধ থাকে, আমরা ঠিকমতো স্কুল, কলেজ বা কর্মস্থলে পৌঁছাতে পারি না, দোকানপাট বন্ধ থাকে, রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। আসলে আমরাই আমাদের শহরগুলোকে নষ্ট করে ফেলছি। নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা না ফেলে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ব্যাগ, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি ফেলছি। ফলে রাস্তার পাশের ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে পানি

ঠিকমতো নির্গমন হচ্ছে না। দীর্ঘ সময়ব্যাপী পানি জমে নানা সমস্যা ও সংকট তৈরি করছে। এ অবস্থা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। সবার আগে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আমরা জেনেছি যে, বাংলাদেশকে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হাজারও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। এবার আমরা এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কী কী করতে পারি তা চিহ্নিত করি।

সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা এসডিজি বাস্তবায়নে অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে আয়, ভোগ, জেন্ডার, অঞ্চল ও সম্পদ বৈষম্য যথাসম্ভব কমিয়ে এনে সকল ক্ষেত্রের দরিদ্রতার অবসান ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সরকার ও অন্যান্য সকল অংশীজনকে সাথে নিয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল থেকে সম্পদ আহরণে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করে বিশ্লেষণপূর্বক টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচিতে দ্রুত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল মোকাবিলা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সম্পদের ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সেবা জোরদারসহ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনানুসারে বাড়াতে হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের দক্ষতা বাড়ানো এবং তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে তারা নিজেদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে সম্পদ সংগ্রহ করে সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

নীতিকাঠামোগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে হবে। একইসাথে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে মনিটরিং ও মেনটরিং এর ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। সব মহলের সম্মিলিত অঙ্গীকার ও প্রচেষ্টায় সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার জরুরি। পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতা রোধ করতে হবে। বিদেশে সম্পদ পাচার বন্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে গ্রামীণ অ-কৃষিখাতকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিতে হবে। সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে পড়া দুর্গম অঞ্চল বিশেষ বিবেচনায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। অতিদারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের হার কমাতে প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। অর্থনৈতিক নীতিকাঠামো বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ন্যায্যভাবে সুবণ্টিত হতে পারে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এসব খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা ও তদারকি বাড়াতে হবে।

টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হলো উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা টেকসই রাখা এবং এর গতি দ্রুততর করা। ২০২১ সাল নাগাদ ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং মধ্যম-আয়ের দেশ, ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে আমরা উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে সাথে নিয়েই আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় শামিল হতে হবে। তা না হলে আমাদের হয়তো প্রবৃদ্ধি বাড়বে কিন্তু তা কখনোই টেকসই রাখা সম্ভব হবে না। সবাই যাতে নাগরিক হিসেবে সমান অধিকার ভোগ

করে, সকলে যাতে মানব মর্যাদা পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানোন্নয়ন ও জাগরণ ঘটাতে হবে। জ্বালানি খাতকে বর্তমান বাজেটে অগ্রাধিকার দিলেও তা বাস্তবায়নে কঠোর তদারকি জোরদার করতে হবে। গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থলভাগ ও সমুদ্র অনুসন্ধানে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জোরদার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

যে কোনো উন্নয়নই ঘটুক না কেন, উন্নয়নের সাথে কিছু নেতিবাচক ফলাফল আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে। যেমন দেশ তথ্যপ্রযুক্তিতে অনেক এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু পূর্ব সতর্কতা না থাকায় বর্তমানে আমাদেরকে অনেক দায় বহন করতে হচ্ছে। যেমন, কোমলমতি কিশোর-কিশোরীরা তথ্যপ্রযুক্তি অপব্যবহারের শিকার হচ্ছে। তাই যা কিছু ভালো তা বিবেচনা করার পূর্বে যদি তার সাথে বিপন্নতা ও ঝুঁকি কতোটুকু সে দিকটা বিবেচনায় রেখে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, তাহলে অনেকাংশেই ঝুঁকি মোকাবিলা করা সহজ হয়।

আমরা যদি এ সকল বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে হাত দিই, তাহলে ফলাফল কাঙ্ক্ষিত মানের হবে তা ধরে নেওয়া যায়। পৃথিবীর সব সমাজেই কিছু চলমান সমস্যা থাকে, আবার নতুন নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় যা আর্থ-সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা তৈরি করে। বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা সুষম ও সুসংহত করা এবং একে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া। যেগুলোর মধ্যে রয়েছে মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদের উন্নয়ন। বাস্তবতার আলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, গৃহীত কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, অপচয়রোধ, দুর্নীতিদমন এবং দেশের নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় আরও কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ। পাশাপাশি রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

কাজ-১: এসডিজি অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় চিহ্নিত কর।

কাজ-২: স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে আমরা কীভাবে টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখতে পারি, দলগত আলোচনার মাধ্যমে ২০০ শব্দের একটি রচনা লিখ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সূচনা করে কোনটি?

ক. নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সহযোগিতা
খ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা
গ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
ঘ. রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা

২. কোন পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্বের সচেতন মানুষকে শঙ্কিত করে তুলেছে?

ক. জন্মহার
খ. জলবায়ু
গ. তাপমাত্রা
ঘ. সামাজিক সূচক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

"জাতিসংঘ প্রবর্তিত একটি কর্মসূচির ২০১৫ সালের অর্জিত সাফল্য ২০৩০ সাল মেয়াদি অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশকে আশাবাদী করেছে"- মন্তব্য করে জনাব শাহেদ মনসুর তাঁর "উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাংলাদেশ" শীর্ষক বক্তৃতা শুরু করেন। তাঁর বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, "২০৩০ সালের মধ্যে অভীষ্ট অর্জনের মাধ্যমে আমরা নারী-পুরুষ সমতা বিধান করে সুখী ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হব।"

৩. জনাব শাহেদ তাঁর বক্তৃতায় ২০১৫ সালের কোন সাফল্যের কথা বলেছেন?

ক. এসডিজি খ. এমডিজি

গ. পরিবেশ উন্নয়ন ঘ. সামাজিক উন্নয়ন

৪. শাহেদ সাহেবের শেষ বক্তব্যে ফুটে উঠেছে-

i. অভীষ্ট অর্জনের সম্ভাব্য ফলাফল

ii. সাফল্য অর্জনের সুবিধাসমূহ

iii. সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

দৃশ্যকল্প-১	একটি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান বালু নদীর কিছু অংশ ভরাট করে পাশের কিছু জমিসহ সাইনবোর্ড টানিয়ে প্লট বিক্রি করছে।
দৃশ্যকল্প-২	সাভারে ট্যানারী শিল্প স্থাপনের পর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করে পার্শ্ববর্তী খালে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে।
দৃশ্যকল্প-৩	'ক' সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকগণ সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে সকলে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে সেটিকে সুন্দর বাসযোগ্য কর্পোরেশনে রূপান্তর করেছে।

ক. জলবায়ু কার্যক্রম কী?

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন?

গ. দৃশ্যকল্প ১ ও ২ কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প-৩ বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিতের উদাহরণ- মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

নবম ও দশম : ভূগোল ও পরিবেশ

জ্ঞান যে কোনো বন্ধুর চেয়েও উত্তম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।